ইশাআতুস সুন্নাহ

মুফতী মনসূরুল হক

www.islamijindegi.com

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা
মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের মনোভাব	৭
কোয়ান্টাম মেথড ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ	১০
খ্রিস্টানদের চক্রান্ত ও অপব্যাখ্যা থেকে সাবধান	১৫
ইসলাম ও মওদূদীবাদ	২৫
ডা. যাকির নায়েক এর ভ্রান্ত মতবাদ	৩০
শী'আ মতবাদ	৩৬
কাদিয়ানি মতবাদ	৪০
তাওরাত-ইঞ্জিল মুহাম্মাদ ﷺ	৪৬
হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ	৫৭
ইলম উঠে যাচ্ছে, দায়ী কারা?	৬১
দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য	৬৮
মেয়েদেরকে স্কুল-কলেজে পড়ানোর বিধান	৭৬
মাদরাসা পরিচালনার নিয়ম কানুন	৭৯
উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য	৮৫
কওমী মাদরাসার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান	১০১
নামাযের ওয়াক্ত	১১৬
প্রচলিত আযানের শরয়ী বিধান	১২১
জামা'আতে নফল নামায পড়ার বিধান	১২৭
ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতের শরয়ী বিধান	১৩১
সারা বিশ্বে একইদিনে রোযা ও ঈদ	১৩৬
হজ্বের মধ্যে ঘটে যাওয়া ভুলসমূহ	১৪৮
এক নজরে হজ্বের এক সপ্তাহ	১৫৩
শেয়ার ও বর্তমান শেয়ার বাজার	১৫৭
ব্যাংক ডিপোজিটের প্রকারভেদ ও তার শরয়ী বিধান	১৬৩
শরী'আতের দৃষ্টিতে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসা	১৬৬
পুরুষদের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস	১৭১
মহিলাদের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস	১৭৮
ইসলামে ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণের বিধান	১৮৪
নববী চিকিৎসার অন্যতম চিকিৎসা হিজামাহ (শিঙ্গা লাগানো)	১৯১
দুরূদ, সালাম ও প্রচলিত মীলাদের শর'ঈ বিধান	১৯৫
নবীজী ﷺ জন্ম ও মৃত্যুর বিশুদ্ধ তারিখ	২০৫
শরী'আতের দৃষ্টিতে ওলীমা, আকীকা ও খতনা	২১৫
কবর খনন ও দাফনের শরয়ী পদ্ধতি	২২০
শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা	২২৩

www.islamijindegi.com

মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের মনোভাব

কুরআনে কারীমের আলোকে মুসলমানদের ব্যাপারে কাফেরদের মনোভাব

১। আহলে কিতাবদের অনেকেই তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরেও প্রতিহিংসাবশতঃ তারা চায় যে, তোমরা মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোনভাবে আবারো কাফের বানিয়ে দেয়া। (সূরা বাকারা,১০৯)

২। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনো আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি এদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন তাই হলো সরল পথ। যদি আপনি আপনার কাছে আগত জ্ঞান লাভের পরেও, তাদের আকাঙ্ক্ষা সমূহের অনুসরণ করেন, তাহলে আল্লাহর শাস্তি থেকে আপনাকে উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী কেউ থাকবে না। (সূরা বাকারা, ১২০)

৩। যদি আপনি ইয়াহুদ-খ্রিষ্টানদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কিবলা মেনে নিবে না; এবং আপনিও তাদের কিবলা মানেন না, তারাও একে অন্যের কিবলা মানে না। যদি আপনি সে জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। (সূরা বাকারা, ১৪৫)

৪। মুমিন যেন মুমিনকে ছেড়ে কোন কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে, আল্লাহর সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না। তবে যদি তোমরা তাদের পথ থেকে কোন অনিষ্টের আশংকা করো, তবে তাদের সাথে সাবধানতার সাথে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের সম্পর্কে সতর্ক করেছেন এবং সবাইকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। (আল ইমরান, ২৮)

৫। হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করোনা! তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করেনা। তোমরা কষ্টে থাক, তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতা বশতঃ বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে বেরোয়। আর যা কিছু তাদের মনে লুকিয়ে রয়েছে,তা আরো অনেকগুণ বেশী মারাত্মক। তোমাদের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করে দেয়া হলো, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সমর্থ হও। (সূরা আল ইমরান, ১১৮)

৬। দেখো! তোমরাই তাদের ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবকেই বিশ্বাস করো। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, বলে- 'আমরা ঈমান এনেছি।' পক্ষান্তরে তারা যখন পৃথক হয়ে যায়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে। আপনি তাদেরকে বলুন, তোমরা আক্রোশে মরতে থাকো। আল্লাহ মনের কথা ভালই জানেন। (সূরা আল ইমরান, ১১৯)

৭। তোমাদের যদি কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তাদের খারাপ লাগে। আর তোমাদের যদি অমঙ্গল হয়, তাহলে তারা আনন্দিত হয়। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তাদের প্রতারণায় তোমাদের কোনই ক্ষতি হবে না। (সূরা আল ইমরান, ১২০)

৮। হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ যালেমদেরকে পথপ্রদর্শন করেন না। (সূরা মায়িদা, ৫১)

৯। আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকে পাবেন, এবং আপনি সবার চেয়ে মুসলমানদের সাথে বন্ধুত্বে অধিক নিকটবর্তী খ্রিষ্টানদের মধ্য থেকে কিছু লোককে পাবেন, যারা নিজেদেরকে সত্যিকার খ্রিষ্টান বলে দাবী করে। এর কারণ এই যে, তাদের মধ্যে আলেম ও দরবেশ রয়েছে এবং তারা অহংকার করেনা। (সূরা মায়েদা, ৮২)

উল্লেখ্য, এ আয়াতে খ্রিষ্টানদের যে তিনটি সিফাতের কথা বলা হয়েছে (ক) তারা সত্যিকার অর্থে আসমানী ইঞ্জিল কিতাব মান্যকারী, (খ) তাদের মধ্যে দুনিয়াত্যাগী ও আলেম আছে, (গ) তারা অহংকারী নয় । এ তিন সিফাতওয়ালা খ্রিষ্টান বর্তমান বিশ্বে পাওয়া যায় না। সুতরাং বর্তমান খ্রিষ্টানদের সাথেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা হারাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় হাবশার বাদশাহ নাজাশী ও তার প্রজাদের মধ্যে কুরআনে উল্লেখিত সিফাতগুলী ছিল এবং তারা মুসলমানদের অনেক সহায়তাও করেছিল। (তাউযীহুল কুরআন, ১/৩৬১)

১০। মুসলমানদের ছদ্মাবরণে যদি কাফেররা তোমাদের সাথে জিহাদে বের হয়, তাহলে তোমাদের অনিষ্ট ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না। আর তাদের অশ্ব পরিচালনা তো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার লক্ষেই। সাবধান! তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা যালিমদের ভালভাবেই জানেন। (সূরা তওবা, ৪৭)

১১। হে মুমিনগণ! তোমরা আমার (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার) শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদেরকে অর্থাৎ ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান ও মুশরিক তথা মূর্তি এবং অগ্নিপূজকদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের ধর্ম দীন ইসলাম অস্বীকার করছে। তারা রাসূলকে ও তোমাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে এই অপরাধে যে, তোমরা তোমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রাখো। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং আমার পথে জিহাদের জন্য বের হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা তাদের প্রতি গোপনে বন্ধুত্বের পয়গাম প্রেরণ করছো? তোমরা যা গোপন করো বা প্রকাশ করো, তা সবই আমি খুব জানি। তোমাদের মধ্যে যে এটা করে, সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (সূরা মুমতাহিনা, ১)

উপরোক্ত সমস্যার সমাধানে মুসলমানদের করণীয়ঃ কাফেরদের এই ষড়যন্ত্রমূলক মনোভাবের মুকাবেলায় মুসলমানদের দায়িত্ব হলোঃ
(ক) নিজেদের ঈমান ও আকীদা দূরস্থ করা (খ) নিজেদের আমল সহীহ করা, গুনাহ বর্জন করা (গ) অন্যদেরকে এগুলোর দাওয়াত দেয়া।

এই দুই শর্ত সাপেক্ষে আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেয়ার যিম্মাদারী নিয়েছেন। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

১। নিশ্চয় তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল; অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের চক্রান্তের ইমারতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারতের ছাদ তাদের মাথায় ধ্বসে পড়লো এবং এমন দিক হতে তাদের উপর আযাব আসলো যেখান থেকে তাদের ধারনাও ছিল না। (সূরা নহল)

২। তারা ভীষণ চক্রান্ত করেছিল। যদিও তাদের চক্রান্ত পাহাড় টলিয়ে দেয়ার মত ছিল, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছেন। (সুরা ইবরাহীম, ৪৬)

কোয়ান্টাম মেথড ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ

আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার জন্য মুরাকাবা বা ধ্যান ইসলামে একটি স্বীকৃত বিষয়। অন্য ধর্মের ধর্মগুরুরাও নিজ আত্মার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য ধ্যান করে থাকে। হিন্দুদের যোগধ্যান ও বৌদ্ধদের বিপাসনধ্যান এর অন্যতম। তবে ইসলামের মুরাকাবা বা ধ্যান এবং অন্য ধর্মের পন্ডিতদের ধ্যানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। কারণ ইসলামের মুরাকাবার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করা, আর হিন্দু যোগী বা বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের ধ্যানের উদ্দেশ্য হলো, আত্মার উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দুনিয়াবী কিছু ফায়দা হাসিল করা।

পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা মুরাকাবার মৌলিক বিষয়গুলোর উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখতে পেলেন যে, ধ্যানের মাধ্যমে অন্তরে যে বিষয় গেঁথে দেওয়া হয়, সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অন্তরের বিশ্বাস অনুযায়ী সে বিষয়ে সাড়া দেয়। তারা ৬০/৭০ দশকে ধ্যানের উপর ব্যাপকভাবে গবেষণা করতে শুরু করে। এক পর্যায়ে তারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, মানসিক ও শারীরিক উভয় রোগের নিরাময়ে ধ্যান কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম। এই প্রকারের ধ্যানকে তারা 'মেডিটেশন' বলে আখ্যায়িত করেন। বর্তমানে বিশ্বের অনেক দেশেই রোগ নিরাময়ের জন্য মেডিটেশন করার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে।

কিন্তু বাংলাদেশের কোয়ান্টাম মেথড ব্যতিক্রমধর্মী মেডিটেশনের কথা বলছে। মেডিটেশনের উৎপত্তি হয়েছিল মানসিক ও শারীরিক রোগ মুক্তির লক্ষে অথচ কোয়ান্টাম মেথড রোগ নিরাময়ের গন্ডি থেকে বেরিয়ে জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক নতুন

দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে। রোগ নিরাময়ের বিশ্বাসের স্থানে তারা মুক্ত বিশ্বাস নামে বিভিন্ন ধরণের কুফরী আকীদার প্রচার শুরু করেছে।

কোয়ান্টাম মেথডের প্রধান গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক প্রথমে জ্যোতিষী ছিলেন। তিনিই কোয়ান্টাম মেথডের ব্যতিক্রমধর্মী মেডিটেশনের উদ্ভাবক। তিনি মূলত এ জাতীয় মেডিটেশনের মূল আবিষ্কারক ডা. বেনসন বা ডা. ডীন অরশীন এর বাতলানো ফর্মুলা থেকে সূত্র গ্রহণ করে নিজের গবেষণালব্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিভিন্ন দর্শন যোগ করে কোয়ান্টাম এর এই বিশেষ মেডিটেশন আবিষ্কার করেন।

তার আবিষ্কৃত এই নতুন ধরণের মেডিটেশনের প্রতি সব ধর্মের মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষত হিন্দু ও বৌদ্ধদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন রীতি-নীতি, ও আকীদা বিশ্বাসের মিশ্রণ ঘটানো হয়েছে। তাই কোয়ান্টাম মেথড পশ্চিমা দেশে প্রচলিত মেডিটেশন নয়। বরং এটি একটি জীবন ব্যবস্থা ও মতবাদ, যেখানে বিজ্ঞান ও সব ধর্মের মিশ্রণে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নতুন দিকনির্দেশনা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, ঠিক যেমনটি করেছিল বাদশা আকবার ভ্রান্ত দ্বীনে ইলাহী আবিষ্কার করে।

শহীদ বোখারীর এই প্রচেষ্টা শুরু হয় প্রায় তিন যুগ আগে ১৯৭৩ সালে তদানীন্তন 'মাসিক ঢাকা ডাইজেস্ট' পত্রিকায় অতন্দ্রীয় বিষয়ে লেখালেখির মাধ্যমে। ১৯৭৫ সালে 'সাপ্তাহিক বিচিত্রায়' এ বিষয়ে অনেকগুলো লেখা প্রকাশ করা হয়। ১৯৮০ সালে তারা ঢাকার শান্তি নগরে অফিস খোলে। ১৯৮৩ সালে এই মেডিটেশনকে ব্যাপকভাবে মানুষের মধ্যে ছড়ানোর জন্য 'যোগ্য মেডিটেশন কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়। ১৯৮৬ সালে এই কেন্দ্র 'যোগ্য ফাউন্ডেশন' নামে পরিচালিত হয়।

এদিকে মহাজাতক মানুষের মধ্যে পরিচিতির জন্য এই মেডিটেশন সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে লিখতে থাকেন। এভাবে লেখালেখির এক পর্যায়ে যখন তিনি গণমানুষের মধ্যে এ ব্যাপারে আগ্রহ লক্ষ করলেন তখন মেডিটেশন কোর্স চালু করা হয়। ১৯৯৩ এর ৭ জানুয়ারী মেডিটেশন এর সর্বপ্রথম কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে কোয়ান্টাম মেথড নামে এরা মেডিটেশন কোর্স চালিয়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত তারা ৩০০ এর অধিক কোর্স সমাপ্ত করেছে। মানুষ তার কাছে যায় রোগ নিরাময়ের আশায়, কিন্তু তিনি নিরাময়ের নামে তাদের বাদশাহ আকবরের দ্বীনে ইলাহীর মতো সর্বধর্মের সমন্বয়ে গঠিত নতুন এক মতবাদ শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন, আর অবুঝ মুসলমানদের ঈমান হরণ করছেন। (তথ্যসূত্র, মাসিক আল-আবরার ফেব্রুয়ারী ২০১২)

আমাদের দেশের মুসলমানরা ধর্ম সম্পর্কে যতটা আবেগী ততটা জ্ঞানী নয়। ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানও রাখে না এই ধরণের মুসলমানের সংখ্যাও কম নয়। মুসলমানদের ধর্মীয় জ্ঞানের দৈন্যতাকে পুঁজি করে যুগে যুগে অনেকেই মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। বর্তমান কোয়ান্টাম মেথড সেই একই পথ

অবলম্বন করে খুব কৌশলে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করে যাচ্ছে। নিম্নে আমরা কোয়ান্টাম এর এমন কিছু মতবাদ তুলে ধরছি, যা বিশ্বাস করলে মুসলমানদের ঈমানই নষ্ট হয়ে যাবে।

১. ইসলাম কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো কিছু আকীদা-বিশ্বাস ও আমলের। তবে কেউ যদি ঈমান-আকীদা ঠিক রাখে আর আমল নাও করে, তবু সে একদিন না একদিন জান্নাতে যাবে। কিন্তু ঈমান-আকীদার মধ্যে যদি গলদ থাকে, তাহলে সারা জীবন নেক আমল করলেও জান্নাতে যাওয়া যাবে না। কোয়ান্টাম মেথড মুসলমানদের অমূল্যধন ঈমান ধ্বংস করার পায়তারা চালাচ্ছে। কোয়ান্টাম মেথডের কোর্সে ভর্তির পর সর্ব প্রথম একটি প্রত্যয়ন পাঠ করা হয়, এই প্রত্যয়নই তাদের মূল চালিকা শক্তি। প্রত্যয়নটি এই, ‘ অসীম শক্তির অধিকারী আমার মন, যা চাই তাই পাবো যা খুশি তাই নেব’ তাদের এই প্রত্যয়নটি সম্পূর্ণরূপে কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। কেননা কুরআনের অনেক আয়াত আর অনেক হাদীস দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই অসীম শক্তির অধিকারী। তিনি ছাড়া আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুর শক্তিই সসীম। অতএব মানুষের মনকে অসীম শক্তির অধিকারী বলা স্পষ্ট কুফরী কথা। তাছাড়া ‘যা চাই তাই পাবো’ এই বিশ্বাসে আল্লাহর উপর ভরসার হুকুম স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে। কুরআন শরীফে আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদেরকে যেকোনো কাজে আল্লাহর উপর ভরসা করতে বলেছেন। যেমনঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন, ‘অতঃপর আপনি যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করুন। আল্লাহ ভরসাকারীদের ভালোবাসেন। (সূরা আল ইমরানঃ১৫৯, আরো দ্রষ্টব্য, সূরা তাওবাঃ৫১, সূরা তাগাবুনঃ১৩, সূরা ইউসুফঃ৬৭, সূরা আল ফুরকানঃ৫৮ ইত্যাদি) অথচ কোয়ান্টামের এই কথা ‘যা চাই তাই পাবো’ এর মধ্যে আল্লাহ তা‘আলার উপর ভরসাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। হ্যাঁ তারা যদি কথাটা এভাবে বলতো, ‘যা চাই তাই পাবো যদি আল্লাহ চান’ তাহলে কোনো সমস্যা ছিল না।

২. ‘যা চাই তাই পাবো’ এখন প্রশ্ন হলো দিবে কে? এই প্রশ্নের জবাব কোয়ান্টাম কণিকা ২৩৯ পৃ. দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে, ‘কোয়ান্টামের মতে আল্লাহ/গড/ ভগবান/ প্রকৃতি যে কেউ দাতা হতে পারে।’ অথচ কুরআন সুন্নাহর আলোকে প্রকৃত দাতা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। গড/প্রকৃতি/ভগবান এসবকে দাতা মানার অর্থই হলো আল্লাহ তা‘আলার সাথে অন্যকে শরীক করা। আর শিরক দ্বারা ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। অতএব কোয়ান্টামের এই মতবাদ সম্পূর্ণ ঈমান বিধ্বংসী মতবাদ।

তাছাড়া ‘যা চাই তাই পাবো’ একথা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত। কারণ চাওয়ার সাথে পাওয়ার শতভাগ সংযোগ হবে জান্নাতে। এই পৃথিবীতে শতভাগ চাওয়া পাওয়ায় পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। তাইতো আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে বলেছেন ‘মানুষ যা চায়

তাই কি পায়?' (সূরা আন নাজাম ২৪) যদি পৃথিবীতেই মানুষের শতভাগ চাওয়া পাওয়ায় রূপান্তরিত হতো, তাহলে তো পৃথিবীই জান্নাত হয়ে যেতো। মানুষের শতভাগ চাওয়া তথা আশা-আকাঙ্ক্ষা শুধুমাত্র জান্নাতেই পুরা করা হবে, এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আর তোমরা সেখানে যা চাবে তাই পাবে' (সূরা হামীম সেজদাঃ ৩১)

৩. কোয়ান্টামের মতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, ইসলাম মোটকথা সব ধর্মের মৌলিক শিক্ষাই এক। কাজেই যেকোনো ধর্ম পালনই যথেষ্ট। কোয়ান্টামের মতে সকল ধর্মই গ্রহণযোগ্য। (কোয়ান্টাম উচ্ছ্বাস পৃ.৯)

ইসলামে পূর্বের সকল নবী-রাসূল ও আসমানী গ্রন্থসমূহকে স্বীকৃতী প্রদান করা হয়েছে। এই স্বীকৃতীর অর্থ এই নয় যে, কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরও যদি কেউ নিজ ধর্ম অনুযায়ী আমল করে, তাহলে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। বরং এই স্বীকৃতী অর্থ এই যে, পূর্বের নবী-রাসূলগণ বাস্তবেই সত্য নবী-রাসূল ছিলেন এবং তাদের যমানায় তাদের কিতাবও সত্য ছিল। কিন্তু কুরআন অবতীর্ণ হওয়ায় পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাব রহিত হয়ে গেছে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট ভাষায় কুরআনে বলে দিয়েছেন 'যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পালন করবে কস্মিনকালেও তা তার থেকে গ্রহণ করা হবে না, আর আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (সূরা আল ইমরানঃ ৮৫)

যেখানে কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হলো, ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়, সেখানে কোয়ান্টাম মেথড কীভাবে অন্য ধর্মকেও গ্রহণযোগ্যতার সনদ দিতে পারে? কোয়ান্টামের কী অধিকার আছে যে সে অন্য ধর্মকে গ্রহণযোগ্যতার সনদ দিবে? একই সময়ে একাধিক ধর্মকে গ্রহণযোগ্য বলা যুক্তি বিরুদ্ধ কথাও বটে। কেননা ধর্ম হলো মানুষের জীবনযাপনের আসমানী সংবিধান। একই দেশে একই সময়ে একাধিক সংবিধান যেমন কার্যকর নয়, তেমনিভাবে আল্লাহর এই পৃথিবীতে একই সময়ে একাধিক ধর্ম বা সংবিধান কার্যকর হওয়া বা গ্রহণযোগ্য হওয়া সম্ভব নয়। ইসলাম যেহেতু সর্বশেষ আসমানী সংবিধান তথা আল কুরআন নিয়ে এসেছে, তাই কুরআন নাযিল হওয়ার পর অন্যসব সংবিধান তথা ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ রহিত ও অগ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে। এটাই হলো যুক্তির দাবি।

কোয়ান্টাম মেথড অন্য ধর্মকে গ্রহণযোগ্য বলে নিজের ঈমান যেমন ধ্বংস করেছে, তেমনিভাবে অন্য মুসলমানদেরকে এই মতবাদে দীক্ষিত করে অন্যদের ঈমানও নষ্ট করে যাচ্ছে।

৪. কোয়ান্টামের উদ্ভাবিত জীবনদৃষ্টির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'কোয়ান্টাম হচ্ছে সেই সায়েন্স অব লিভিং যা বলে দেয় জীবনটাকে কীভাবে সুন্দর করা যায়। ভুল থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়। পাপ কত কম করা যায়। ভাল বা কল্যাণ কত বেশি করা যায়। কোয়ান্টামের শিক্ষা এ ক্ষেত্রে নবী-রাসূলদের যে শিক্ষা, ওলী-বুযুর্গদের যে

শিক্ষা, মুনি-ঋষিদের যে শিক্ষা, তা থেকে আলাদা কিছু নয়। হাজার বছর ধরে তারা যে শিক্ষা দিয়ে এসেছেন, কোয়ান্টাম সে কথাগুলোই বলছে। শুধু ভাষাটা আধুনিক। (হাজারো প্রশ্নের জবাব, মহাজাতক ১/৩০১)

এখানে স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করা হলো যে, কোয়ান্টামের শিক্ষা হলো, নবী-রাসূলদের তাওহীদী বাণী ও মুনি-ঋষিদের কুফরী মতবাদের সমন্বিত একটি রূপ। অতএব সাবধান হে মুসলিম ভাই! কোয়ান্টামে দীক্ষা লাভ করে নিজের ঈমান খোয়াবেন না।

নবীজী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আনিত জীবন ব্যবস্থার উপর সন্তুষ্ট হতে না পারা কোয়ান্টামের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা। নিজের বুদ্ধিমতে সকল ধর্মের নির্যাস আর বিজ্ঞানের থিউরি মিশ্রণে সফলতার সূত্র আবিষ্কার সবচেয়ে বড় ভুল। মুমিন-মুসলমান হতে হলে সর্বাবস্থায় কুরআন সুন্নাহর মাঝে নিজের সকল সমস্যার সমাধান, সকল প্রশ্নের উত্তর আর সকল চাহিদা পূরণের দিকনির্দেশনা খুঁজে পাওয়ার বিশ্বাস রাখতে হবে। কুরআন-সুন্নাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থায় তুষ্ট থাকতে হবে এবং মনে-প্রাণে তার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। বিধাতা হিসেবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উপর আস্থাশীল হতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শকে একমাত্র পালনীয় বিশ্বাস করতে হবে। কোয়ান্টামের আবিষ্কৃত জীবন-যাপনের বিজ্ঞানের অনুসরণ করা যাবে না। যার ভিত্তি রাখা হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত জীবনের সংজ্ঞা আর রুশ দার্শনিক লিওটলস্টয় এর কিছু মন্তব্যের উপর। মুসলমানদেরকে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান বা তাদের স্বাস্থ্য সংস্থার দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী জীবন যাপনের বিজ্ঞান পালন করতে হবে কেন? মুসলমানদের জন্য ইসলামের বিধি-বিধান ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শই কি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারূপে যথেষ্ট নয়। যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা মানবে না, তারা কুরআনের স্পষ্ট আয়াত 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম পরিপূর্ণ করে দিলাম। (সূরা মায়িদাঃ৩) অস্বীকার করায় কাফের হয়ে যাবে।

কোয়ান্টাম মেথড নতুন জীবনদৃষ্টির কথা বলে মূলতঃ ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা অস্বীকার করছে। তাই যারা না বুঝে ইতিমধ্যে কোয়ান্টামে ঢুকে পড়েছেন অথবা যারা এখন ঢুকতে চাচ্ছেন তারা এখনই সর্তক হোন, তাওবা করে সঠিক ইসলামের পথে ফিরে আসুন এবং পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলাম ধর্ম মেনে চলুন। চৌদ্দশত বছর আগেই আল্লাহ তা'আলা আপনার সব সমস্যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহর মাঝে দিয়ে রেখেছেন। অতএব অন্য কোনো দিকে না যেয়ে আপনার ধর্ম ইসলামকে আঁকড়ে ধরুন। যারা পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলাম ধর্ম মেনে চলবে তাদের জন্য আখিরাতে চির শান্তির জীবন তো অপেক্ষা করছেই, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য প্রশান্তিময় জীবনের ওয়াদা করেছেন। তাই আসুন আমরা কোয়ান্টামসহ অন্যান্য সব বাতিলকে পরিত্যাগ করি এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামকে চর্চা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

বি. দ্র. কোয়ান্টাম মেথডের আরো অনেক মতবাদ কুরআন-হাদীস সাংঘর্ষিক। পারচার সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর চেয়ে বেশি আলোচনা সমীচীন নয়। তাই যারা এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আগ্রহী তারা ব্রাউজ করুনঃ

1. http//:monthlyalabrar.com
2. http//:monthlyalabrar.wordpress.com

খ্রিস্টানদের চক্রান্ত ও অপব্যাখ্যা থেকে সাবধান

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় একদল কুচক্রি খ্রিস্টানদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে চিরমুক্তির আশায় অনেকে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করছে। অনেক মুসলমানও ঈসায়ী মুসলিম নামধারণ করে খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস ঐ সরলমনা মুসলমানরা খ্রিস্টচক্রের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়েই ইসলাম ত্যাগ করে ঈসায়ী মুসলিম হয়েছে। কারণ, খাঁটি মুসলমান জীবন বিলিয়ে হলেও ঈমান হেফাজত করে থাকে। খ্রিস্টানদের অপপ্রচারে আর কোনো মুসলমান যেন বিভ্রান্ত না হয় এবং যারা ইতিমধ্যে খ্রিস্টানদের ফাঁদে পা দিয়েছে তারা যেন পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসতে পারে, সেজন্যই আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার পরে ইসলাম ছাড়া অন্য সব ধর্ম রহিত হয়ে গেছে। তাই এখন তাঁর আনীত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেই পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে। ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্মে বিশ্বাস করলে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না; বরং ইসলাম ধর্ম না মানার অপরাধে চিরকাল তাকে জাহান্নামের কঠিন আগুনে জ্বলতে হবে। আল্লাহ তা‘আলা আল-কুরআনের সূরা আল ইমরানের ৮৫ নং আয়াতে স্পষ্টভাষায় বলে দিয়েছেনঃ

ومن يبتغِ غير الاسْلاَم دينا فلن يقبل منه و هو فى الاخرة من الخسرين

যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পালন করবে তা কখনো তার থেকে গ্রহণ করা হবে না, আর পরকালে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ এই সূরারই ১৯ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, ان الدين عند الله الاسلام ‘নিশ্চয় ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম’ ।

এই দুই আয়াত দ্বারা একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব, যারা পরকালে চিরমুক্তির আশায় ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম পালন করছেন তাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, আপনারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে চিরমুক্তি ও শান্তির পথে প্রবেশ করুন। কুরআন শরীফের অনেক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা খ্রিস্টান ও ইয়াহুদীদেরকে মুসলমান হতে বলেছেন। মুসলমান না হলে তাদের জন্য পরকালে কঠিন শাস্তির হুমকি দিয়েছেন।

নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হলোঃ

১. ولو امن اهل الكتب لكان خيرا لهم ‘ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা যদি প্রকৃত মুসলমান হতো, তাহলে তা তাদের জন্য ভালো হতো’ (সূরা আল ইমরান ১১০)

২. ياهل الكتب لم تكفرون بايت الله وانتم تشهدون ‘হে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ! তোমরা কেন আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করো, যখন তোমরাই সাক্ষ্য বহন করো’ (আল ইমরানঃ ৭০) অর্থাৎ ইয়াহুদী-খ্রিস্টানগণ এই সাক্ষ্য দেয় যে তাওরাত ও ইঞ্জিল আল্লাহর কিতাব । আর ঐ উভয় কিতাবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবুওয়াতের এবং তার উপর অবতীর্ণ কুরআনের সত্যতা ও তাঁর আগমন বার্তা বর্ণিত ছিল। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং কুরআনকে মানতে অস্বীকার করে তারা বস্তুত তাওরাত ও ইন্জীলকে অস্বীকার করছে। তারা তাওরাত ও ইন্জীলের পাঠ বিভিন্ন স্থানে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে। (আল-কুরআনুল কারীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, পৃ.৮৮)

৩. قل ياهل الكتب لم تكفرون بايت الله والله شهيد على ما تعملون ‘হে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে কেন অস্বীকার করো? অথচ তোমরা যা করো আল্লাহ তার উপর সাক্ষী’ । (আল ইমরানঃ ৯৮)

৪. ...ولو ان اهل الكتب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سياتهم ‘ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা যদি প্রকৃত মুসলমান হতো এবং ভয় করতো, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ মোচন করতাম এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে সুখময় জান্নাতে প্রবেশ করাতাম’ (মায়িদাঃ ৬৫)

উল্লেখ্য, এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, খ্রিস্টানদের জন্য পাপ মোচনের একমাত্র মাধ্যম হলো মুমিন-মুসলমান হওয়া। প্রকৃত মুসলমান না হলে পরকালে তারা মুক্তি পাবে না।

৫. ...ان الذين كفروا من اهل الكتب والمشركين فى نار جهنم ‘ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে যারা কুফুরী করে (তথা মুসলমান হয় না) তারা এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তারাই সৃষ্টির অধম।’ (বাইয়িনাতঃ ৬)

৬. ...وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ‘ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যাতে তারা আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয়, এটাই সঠিক দ্বীন।’ (বাইয়িনাতঃ ৫) উল্লেখ্য, এই সঠিক দ্বীনের নামই ইসলাম।

৭. ...يايها الذ ين اوتوا الكتب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم ‘হে ইয়াহুদী-খ্রিস্টানগণ! তোমাদের নিকট যা আছে তার সমর্থকরূপে আমি যা অবতীর্ণ করেছি (অর্থাৎ আল-কুরআন) তার প্রতি তোমরা ঈমান আনো।’ (নিসাঃ ৪৭)

৮. ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, يا يها الذ ين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذ ين اوتوا الكتب يردوكم بعد ايمانكم كفرين

'হে মুমিনগণ! তোমরা যদি ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দলবিশেষের আনুগত্য করো তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান আনার পর আবার কাফের বানিয়ে ছাড়বে।' (আল ইমরান ১০০)

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা তিনটি বিষয় প্রমাণিত হলঃ

১. হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নবী হওয়ার পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়।

২. অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত খ্রিস্টানদেরকেও মুসলমান হতে হবে। মুসলমান না হলে তারা পরকালে জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে না; বরং চিরকাল জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে।

৩. খ্রিস্টানদের একটা দল কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকবে। মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা তাদেরকে মানবে, তারা ঐ মুসলমানদেরকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে কাফের বানিয়ে ছাড়বে।

অতএব, হে সরলমনা মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা কুচক্রি খ্রিস্টানদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না কিংবা সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে নিজের অমূল্য ঈমান খ্রিস্টানদের হাতে বিলিয়ে দিবেন না। 'ঈসায়ী মুসলিম' হয়ে কিংবা 'আহলে কুরআন' হয়ে নিজের ঈমানকে ধ্বংস করবেন না। ঈমান অমূল্য সম্পদ। যারা মুসলমান অবস্থায় সামান্য ঈমান নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, তাদেরকেও আল্লাহ তা'আলা এই পৃথিবীর ১১ টি পৃথিবীর সমান সুবিশাল জান্নাত দান করবেন। সেই জান্নাতে আপনি যা চাবেন তাই পাবেন। কিন্তু কেউ যদি ঈমান হারা হয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, তাহলে তাকে জাহান্নামের ভয়ংকর আগুনে চিরকাল জ্বলতে হবে। সেই আগুনের জ্বলন সহ্য করার মতো ক্ষমতা কারো থাকবে না। কুরআনের শতশত আয়াত এ ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

অনুরোধ করছি, কুরআন বা ইসলাম সম্পর্কে কেউ কোনো নতুন কথা বললে তার কথা যাচাই না করেই বিশ্বাস করবেন না; বরং এ ধরণের কোনো কথা শুনলে কওমী মাদরাসার ভালো কোনো আলেমের কাছে জিজ্ঞেস করে নিবেন যে, কথাটি ঠিক না বেঠিক। যে কারো কথা বিশ্বাস করে নিজের ঈমানকে ধ্বংস করবেন না। মুসলমান না হলে যখন খ্রিস্টানরাই মুক্তি পাবে না তখন আপনি খ্রিস্টান হয়ে বা ঈসায়ী মুসলিম হয়ে কীভাবে মুক্তির আশা করতে পারেন? মনে রাখবেন, ঈসায়ী মুসলিম এবং আহলে কুরআন মূলত পাক্কা খ্রিস্টান।

নিম্নে এমন কয়েকটি আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে, যার অপব্যাখ্যা করে খ্রিস্টানরা সরলমনা মুসলমানদেরকে ঈসায়ী মুসলিম বা আহলে কুরআন নামে খ্রিস্টান বানানোর অপচেষ্টা করে যাচ্ছে।

১. সূরা মায়েদার ৬৮ নং আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে খ্রিস্টান প্রতারক চক্র বলে থাকে, 'এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাওরাত ও ইনজীল প্রতিষ্ঠা ও অনুসরণ করতে বলেছেন। অতএব, তোমরা তাওরাত ও ইনজীল প্রতিষ্ঠা করো এবং ঈসায়ী মুসলিম হয়ে যাও। অন্যথায় তোমরা মুক্তি পাবে না।'

আমি সূরা মায়েদার ৬৮ নং আয়াতের মূলপাঠ নিম্নে উল্লেখ করে সরল অনুবাদ তুলে ধরছিঃ

قل ياهل الكتب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكفرين

'হে নবী! আপনি বলুন, হে ইয়াহুদী- খ্রিস্টানগণ তাওরাত-ইনজীল ও যা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে (তথা কুরআন) তোমরা তা প্রতিষ্ঠা না করা পর্যন্ত তোমাদের কোনো ভিত্তি নেই। আপনার প্রতিপালকের নিকট থেকে আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা (কুরআন) তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বাড়াবে। সুতরাং আপনি কাফের সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করবেন না।'

সূরা মায়েদার ৬৮ নং আয়াতের মূলপাঠ ও অনুবাদ উল্লেখ করা হলো। প্রিয় পাঠক! আপনিই বলুন, এই আয়াতের কোন স্থানে আল্লাহ তা'আলা মুসলমানদেরকে তাওরাত-ইনজীল অনুসরণ ও প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন? এই আয়াতে তো আল্লাহ তা'আলা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদেরকে তাওরাত-ইনজীলের সাথে সাথে কুরআন মানতে বলেছেন (আর একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কুরআন মানলে ও প্রতিষ্ঠা করলে তাদেরকে অবশ্যই মুসলমান হয়ে যেতে হবে।) এবং কুরআন না মানলে তাদের ধর্মদ্রোহিতা বৃদ্ধি পাবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাহলে কোন যুক্তিতে তারা এই আয়াত বলে মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিতে পারে? আর আমরাই বা কেমন মুসলমান যে, যে যা বলে তাই মেনে দুনিয়ার লোভে পড়ে ঈমান হারা হয়ে যাচ্ছি। আসল মুসলমান কারো সাথে প্রতারণা করে না এবং প্রতারণার শিকারও হয় না। আমরা মুসলমানরাই দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ রয়ে যাচ্ছি। আর এই অজ্ঞতার সুযোগে খ্রিস্টানরা আমাদের মুসলমান ভাই-বোনদের ঈমান ধ্বংস করছে। অথচ যথেষ্ট পরিমাণ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের উপর ফরয । এই ফরযের প্রতি অবহেলার কারণেই খ্রিস্টানরা আমাদেরকে সহজেই বোকা বানাতে পারছে। বর্তমানে প্রতিদিন ইউরোপ-আমেরিকাতে শত শত খ্রিস্টান কুরআনের সত্যতা অনুধাবন করে মুসলমান হচ্ছে। আর বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশে মুসলমানরা খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে, এর চেয়ে বড় আফসোসের কথা আর কী হতে পারে?

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার তাওফিক দান করুন এবং খ্রিস্টান প্রতারক চক্রের প্রতারণার শিকার হওয়া থেকে হেফাজত করুন।

২. দ্বিতীয় যে বিষয়টি বলে তারা বিভ্রান্তি ছড়ানোর চেষ্টা করে তা এই যে, তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলে, কুরআনে বলা হয়েছে 'আল্লাহর বাণী কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।' (সূরা ইউনুসঃ ৬৪, সূরা আনআমঃ১১৫,৩৪, সূরা কাহাফঃ ২৭) আর তাওরাত-ইনজীল যেহেতু আল্লাহর বাণী তাই এতেও কোনো পরিবর্তন হতে পারে না। অতএব সবাইকে তাওরাত ইনজীল মানতে হবে। তথা ইয়াহুদী বা খ্রিস্টান হতে হবে।

প্রিয় পাঠক! 'আল্লাহর বাণী পরিবর্তন হওয়ার নয়' এই আয়াতে আল্লাহর বাণী দ্বারা তাওরাত-ইনজীল উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর বাণী দ্বারা একেক আয়াতে একেক অর্থ উদ্দেশ্য। তাফসীরের কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ তাফসীরের কিতাব ইবনে কাসীর রহ. কর্তৃক প্রণীত 'তাফসীরুল কুরআনিল আজীম' এর উদ্ধৃতিতে আমরা 'আল্লাহর বাণী পরিবর্তন হওয়ার নয়' এই আয়াতের মর্ম নিম্নে উল্লেখ করছি।

সূরা আনআমের ৩৪ নং আয়াতে বিভিন্ন বালা-মুসিবাতে আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে সাহায্য করেছেন একথা উল্লেখ করে বলেন 'কেউ আমার বাণী পরিবর্তন করতে পারবে না।' ইবনে কাসীর রহ. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

ولا مبدل لكلمات الله اى التى كتبها بالنصر فى الدنيا و الاخرة لعباده المؤمنين

'মুমিন বান্দাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাহায্য করা হবে বলে যে ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা করেছেন তা কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা সূরা সাফফাত এর ১৭১-১৭৩ নং আয়াতে বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল ও মুমিন বান্দাদেরকে অবশ্যই সাহায্য করবেন' এই ওয়াদা (বাণী) কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না।' এখানে বাণী দ্বারা কুরআনে মুমিন বান্দাদের জন্য কৃত আল্লাহর ওয়াদা উদ্দেশ্য।

আর সূরা আনআমের ১১৫ নং আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার প্রতিপালকের বাণী পরিপূর্ণ হয়েছে' এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'তাঁর বাণী কেউ পরিবর্তন করার নেই' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর রহ. বলেন, اى ليس احد يعقب حكمه تعالى لافى الدنيا ولا فى الاخرة

'এমন কেউ নেই যে আল্লাহর হুকুম পাল্টাতে পারে- না দুনিয়াতে না আখিরাতে ।' বুঝা গেল যে, এই আয়াতে আল্লাহর বাণী দ্বারা আল্লাহর হুকুম তথা কুরআন উদ্দেশ্য।

আর সূরা ইউনুসের ৬৪ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে মুমিন মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদের ঘোষণা দিয়ে বলেছেন 'لاتبديل لكلمات الله' 'আল্লাহর

বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই।’ এই আয়াতের মর্ম সম্পর্কে তাফসীরে ইবনে কাসীরে বলা হয়েছেঃ

لاتبديل لكلمات الله اى هذا الوعد لايبدل ولايخلف ولايغير بل هو مقرر مثبت كائن لا محالة ‘আল্লাহর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তন নেই অর্থাৎ (মুমিনদের জন্য) আল্লাহ তা‘আলা যে ওয়াদা করেছেন তা পরিবর্তন করা হবে না, ভঙ্গ করা হবে না এবং তার বিপরীত কিছু করা হবে না; বরং এই ওয়াদা সুনির্ধারিত ও সুসাব্যস্থ এবং তা অনিবার্যভাবে সংগঠিত হবে।’ এই আয়াতেও আল্লাহর বাণী দ্বারা মুমিনদের সাথে কুরআন শরীফে কৃত আল্লাহ তা‘আলার ওয়াদা উদ্দেশ্য।

আর সূরা কাহাফের ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কুরআন তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেন, لا مبدل لكلماته ‘তাঁর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই’ তাফসীরে ইবনে কাসীরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে

يقول تعالى امرا رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة كتابه العزيز وابلاغه الى الناس لامبدل لكلماته اى لامغير لها ولا محرف ولامزيل

‘আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূলকে নিজের প্রিয় কিতাব তিলাওয়াতের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ‘তাঁর বাণীসমূহের কোনো পরিবর্তনকারী নেই’ অর্থাৎ এই কুরআনের মধ্যে কেউ কোনো ধরণের পরিবর্তন, বিকৃতি ও বিলুপ্তি ঘটাতে পারবে না।’ এই আয়াতে আল্লাহর বাণী দ্বারা কুরআন মাজীদ উদ্দেশ্য।

প্রিয় পাঠক! কুরআন শরীফ ও কুরআনের বিশুদ্ধ তাফসীর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, ‘আল্লাহর বাণী পরিবর্তন হওয়ার নয়’ এই আয়াতে আল্লাহর বাণী দ্বারা তাওরাত-ইনজীল উদ্দেশ্য নয়। তাছাড়া এই আয়াতে তাওরাত-ইনজীল উদ্দেশ্য হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, কুরআনের মধ্যে আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা তাদের কিতাব তাওরাত-ইনজীল নিজেদের ইচ্ছা মতো পরিবর্তন করেছে। যেমন সূরা বাকারার ৯ নং রুকুতে আল্লাহ তা‘আলা ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের বদকর্মের আলোচনা করতে গিয়ে ৭৯ নং আয়াতে বলেন, فويل للذين يكتبون الكتب بايديهم..... ‘সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে অতঃপর তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির আশায় বলে, এটা আল্লাহর নিকট হতে এসেছে।’ অতএব, কুরআন দ্বারাই এ কথা প্রমাণিত হলো যে, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা দুনিয়াবী স্বার্থে তাদের কিতাব পরিবর্তন করেছে। এখন আপনিই বলুন ‘আল্লাহর বাণী পরিবর্তন হওয়ার নয়’ এই আয়াতে আল্লাহর বাণী দ্বারা কীভাবে তাওরাত-ইনজীল উদ্দেশ্য হতে পারে?

খ্রিস্টানরা যদিও আরো কয়েকটি আয়াতের অপব্যাখ্যা করে মুসলমানদেরকে ঈমান হারা করার চেষ্টা করে যাচ্ছে, কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দীর্ঘ আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমরা মনে করি খ্রিস্টচক্রকে প্রতিহত করার জন্য সূরা আল ইমরানের ৮৫ নং

আয়াত মনে রাখাই মুসলমানদের জন্য যথেষ্ট। কারণ, এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من الخسرين. 'কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

অতএব, হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! কোনো প্রতারক যদি আপনাকে কুরআনের কথা বলে বা অন্য কোনো কিছুর কথা বলে নতুন কোনো মতবাদ গ্রহণ করার দাওয়াত দেয় তাহলে আপনি তা গ্রহণ করবেন না। আপনি সূরা আল ইমরানের ৮৫ নং আয়াত মনে রাখুন এবং যেকোনো মূল্যে মৃত্যু পর্যন্ত খাঁটি মুসলমান হিসেবে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। ঈমান বাঁচানোর জন্য জান-মাল কুরবানী করার প্রয়োজন হলে জান-মাল কুরবানী করে দিবেন কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ঈমান বিলিয়ে দিবেন না। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে খাঁটি ঈমান ও ইসলাম নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের দেশকে খ্রিস্টচক্রের আগ্রাসী থাবা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

ইসলাম ও মওদূদীবাদ

যুগে যুগে আমাদের আকাবিরগণ নব্য বাতিলের মুকাবিলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে দ্বীনী দায়িত্ব পালনের এক উজ্জ্বল নমুনা জাতির সামনে রেখে গিয়েছেন । কিয়ামত যতই সন্নিকটে আসবে, বাতিলের সয়লাব ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তাই আকাবিরদের অনুসরণে দ্বীন ও ঈমানের হেফাযতের জন্য ও বাতিলের মুকাবিলার লক্ষে দ্বীনের খাদেমদের সর্বদা প্রস্তুত থাকা ঈমানী দায়িত্ব।

দীর্ঘদিন যাবৎ আবুল আলা মওদূদী সাহেবের প্রবর্তিত ফিতনা মহান আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন-ইসলামের উপর আঘাত হেনে চলেছে। নিরীহ ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমানগণ দ্বীন অনুশীলনের ধোকায় পড়ে উক্ত ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেদের দ্বীন ও ঈমান হারাতে বসেছে। আমাদের আকাবিররা উক্ত ফিতনা সম্পর্কে মুসলিম জাতিকে অবহিত করে গিয়েছেন। বর্তমানে ইসলামের খাদিমদেরও দায়িত্ব হচ্ছে, এই ফিতনার মূলোৎপাটনের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা চালানো। বলাবাহুল্য, এই ব্যাপারে হক্কানী উলামায়ে কিরামের ভূমিকা প্রশংসনীয়।

মওদূদী সাহেবের ভ্রান্তি সমগ্রের দিকে ইঙ্গিত করতে গেলেও তা মাঝারী আকারের একটি স্বতন্ত্র বইয়ের আকার ধারণ করবে। এখানে মওদূদী সাহেবের ঐ সমস্ত ভ্রান্তির কিঞ্চিৎ পরিমাণ আলোচনা করা হবে, যাদের দ্বীনের সাথে সামান্যতম সম্পর্ক আছে, তারাও এমন কথা বলতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, মওদূদী সাহেবের সাথে আমাদের বিরোধ রাজনৈতিক নয়, যেমনটি আজকাল প্রচার হচ্ছে। বরং, এটা আমাদের আদর্শিক দ্বন্দ্ব। এখানে প্রশ্ন ঈমান ও কুফরের, সত্য ও মিথ্যার।

নিম্নে মওদূদী সাহেবের ভ্রান্ত মতবাদের কিছু নমুনা পেশ করা হল:

(১) আল্লাহ সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ মহান আল্লাহ কোনো ক্ষেত্রে জুলুমের আশঙ্কাজনিত কোনো বিধান দেননি। (সূরা ইউনূস- আয়াতঃ৪৪)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ যেক্ষেত্রে নর- নারীর অবাধ মেলা-মেশার সুযোগ রয়েছে, সেক্ষেত্রে যিনার কারণে আল্লাহর আদেশকৃত রজমের শাস্তি প্রয়োগ করা নিঃসন্দেহে জুলুম। (তাফহীমাত ২-২৮১)

(২) ফেরেশতা সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ ফেরেশতাগণ নূরের তৈরী আল্লাহর মাখলূক। তাদেরকে মহিলা বা পুরুষ কোনোটাই বলা যাবে না। তাদের খানা-পিনার প্রয়োজন হয় না। তারা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন। (শরহুল আকাইদ-১৩৩)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ ফেরেশতা প্রায় ঐ জিনিষ, যাকে গ্রীক,ভারত প্রভৃতি দেশের মুশরিকরা দেব-দেবী স্থির করেছে।(তাজদীদ ও এহইয়ায়ে দ্বীন-১০)

(৩) পবিত্র কুরআন সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ পবিত্র কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করা নাজায়িয ও হারাম। (তিরমিযী শরীফ,২/১১৯)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ কুরআন শরীফের মনগড়া ব্যাখ্যা করা জায়িয। তিনি তাফহীমুল কুরআনের ভূমিকাতে লিখেনঃ কুরআনের এক একটি বাক্য পড়ার পর, তার যে অর্থ আমার মনে বাসা বেঁধেছে এবং মনের ওপর তার যে প্রভাব পড়েছে, তাকে যথাসম্ভব নির্ভুলভাবে নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। (তাফহীমুল কুরআন,বাংলা ১/১০)

(৪) আম্বিয়ায়ে কেরাম (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াস্সালাম) সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ নবীগণ মাসূম তথা নিষ্পাপ, তারা যাবতীয় গুনাহ্ থেকে পবিত্র। (শরহুল আক্বাইদঃ১৫২)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ নবীগণ মাসূম নন। প্রত্যেক নবীর দ্বারাই কোনো না কোনো গুনাহ্ সংঘটিত হয়েছে। (তাফহীমাত ২/৪৩)

(৫) ঈসা আ.কে আসমানে উত্তোলন সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ মহান আল্লাহ্ তা'আলা হযরত ঈসা আ.কে জীবিতাবস্থায় স্বশরীরে আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন। (সূরা-আল ইমরান আয়াত ৫৫)

কিন্তু অমুসলিম ভ্রষ্ট কাদিয়ানী সম্প্রদায় এ সত্যকে স্বীকার করে না। মওদূদী সাহেবও তাদের অনুকরণ করে বলেনঃ ‘হযরত ঈসা আ.কে আল্লাহ তা‘আলা আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন এ কথা বলা যাবে না, আবার তিনি মারা গেছেন একথাও বলা যাবে না। বরং, বুঝতে হবে, এ ব্যাপারটি অস্পষ্ট। (তাফহীমূল কুরআন, উর্দূ, ১/৪২১)

(৬) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন। (তরজুমানুস্সুন্নাহ্-৩/৩৫০, শরহুল আকাইদ-১৩০)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানবিক দুর্বলতা থেকে মুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ তিনি মানবিক দুর্বলতার বশবর্তী হয়ে গুনাহ করেছিলেন। যে কারণে ‘সূরা নাসর’ এর মধ্যে তাকে তাওবা ও ইস্তেগফার করতে বলা হয়েছে। (তাফহীমুল কুরআন বাংলা, ১৯/২৯০)

(৭) সুন্নাত সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদত-আখলাক ও স্বভাব-চরিত্র আমাদের অনুকরণের জন্য উত্তম নমুনা বা আদর্শ। (সূরা আহযাব ২১, বুখারী শরীফ ২/১০৮৪)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদত-আখলাককে সুন্নাত বলা ও তা অনুকরণে জোর দেওয়া আমার মতে সাংঘাতিক ধরণের বিদ‘আত ও ধর্ম বিকৃতির নামান্তর। (রাসায়েলে মাসায়েল-১/২৪৮)

(৮) ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে মন্তব্যঃ

মহান আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেনঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। (সূরা আল ইমরান- ১৯)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ ইসলাম কোনো ধর্মের নাম নয় বরং এটি হলো একটি বিপ্লবী মতবাদ। (তাফহীমাত-১/৬২)

(৯) সাহাবায়ে কেরাম (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাইন) সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ সাহাবায়ে কেরাম (রিযওয়ানুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) সত্যের মাপকাঠি। (সূরা বাক্বারা-আয়াত ১৩৭, বুখারী শরীফঃহা.৩৬৫১)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি জানবে না। (দস্তুরে জামায়াতে ইসলামী-পৃঃ৭)

(১০) মাযহাব এর তাক্বলীদ (অনুসরণ) করা সম্পর্কে মন্তব্যঃ

উলামায়ে ইসলাম বলেনঃ চার ইমামের পরবর্তী যুগের মুসলমানদের, চাই তারা আলেম হোক বা মূর্খ হোক; হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী, হাম্বলী, এই চার মাযহাবের

কোনো এক নির্দিষ্ট মাযহাবকে অনুসরণ করা ওয়াজিব। এ চার মাযহাবের অনুসারী সকল মুসলমান 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত' নামে অভিহিত।

মওদূদী সাহেব বলেনঃ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য তাক্বলীদ করা, তথা চার মাযহাবের কোনো এক মাযহাবের অনুসরণ করা নাজায়িয ও গুনাহের চেয়েও জঘন্যতম। (রাসায়েলে মাসায়েল, ১/২৩৫)

(১১) নামায রোযা ইত্যাদি সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ দ্বীনের আসল মাকসাদ হচ্ছে; নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি কায়েম করা। আর ইসলামী হুকুমত উক্ত মাকসাদ অর্জনে সহায়ক। (বুখারী শরীফ-কিতাবুল ঈমান.হাদীস নং-৮)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ দ্বীনের আসল মাকসাদ হচ্ছে, ইসলামী হুকুমত। আর নামায,রোযা,হজ্জ,যাকাত, প্রভৃতি ইবাদত হচ্ছে উক্ত মাকসাদ অর্জনের মাধ্যম মাত্র। (আকাবিরে উম্মত কি নযর মে মাওলানা মওদূদী পৃঃ ৬৪, জিহাদের হাক্বীকত-১৬)

মওদূদী সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের ফল এই দাড়ায় যে, ইসলামী হুকুমত অর্জিত হলে নামাজ, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদতের কোনো প্রয়োজন থাকবে না। কেননা, মাকসাদ অর্জিত হয়ে গেলে মাধ্যমের আর প্রয়োজন থাকে না। অথচ ইসলামী হুকুমত কায়েম হোক বা না হোক, সকল মুসলমানের মৃত্যু পর্যন্ত নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ইবাদত পালন করতে হবে।

(১২) ইফতার সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ রোযার শেষ সীমা সূর্যাস্ত পর্যন্ত, সূর্য অস্থ যাওয়ার পরে ইফতার করতে হবে, এর আগে ইফতার করলে রোযা হবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী-২/৩৭১এইচ এম সাঈদ)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ ইফতারের জন্য কোনো সময়সীমা নির্ধারিত নেই। তাই কয়েক সেকেন্ড বা কয়েক মিনিট এদিক সেদিক হলে রোযা নষ্ট হবে না। যার অর্থ দাড়ায় যে, সূর্য ডোবার আগেও ইফতার করতে পারবে। (তাফহীমূল কুরআন উর্দূ ১/১৪৬)

(১৩) দাড়ি সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ দাড়ি রাখা ওয়াজিব এবং দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা রাখাও ওয়াজিব। (মুসলিম শরীফ-১২৯)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ দাড়ি কাটা/ছাঁটা জায়িয। কেটে/ছেঁটে এক মুষ্টির কম হলেও ক্ষতি নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পরিমাণ দাড়ি রেখেছিলেন, সে পরিমাণ দাড়ি রাখাকে সুন্নাত বলা এবং তার অনুসরণে জোর দেওয়া আমার মতে মারাত্মক অন্যায়। (রাসায়েলে মাসায়েল ১-২৪৭)

(১৪) সিনেমা দেখা সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ সিনেমা দেখা নাজায়িয ও হারাম। (তাকমিলা ফাতহুল মূলহিমঃ৪/৯৮, আহাম মাসায়েলঃ২২৬)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ প্রকৃত পথে সিনেমা দেখা জায়িয। (রাসায়েলে মাসায়েল ১-২৬২)

(১৫) তাসাউফ (আত্মশুদ্ধি) সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ইসলাম ধর্ম বলেঃ তাসাউফ কুরআন হাদীস দ্বারা সু-প্রমাণিত, তাযকিয়ায়ে নফস তথা আত্মশুদ্ধি ইসলামের অন্যতম উদ্দেশ্য, বরং একে ইসলামের প্রধানতম উদ্দেশ্য বলা হয়, কারণ, কুরআনে আল্লাহ তা'আলা তাযকিয়ায়ে নফসকে নবী প্রেরণের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আত্মশুদ্ধি অর্জনকে শরী'আতের কোথাও ইসলামী হুকুমতের উপর নির্ভরশীল বলেনি। (সূরা বাক্বারা, আয়াত-১২৯; আল ইমরান, আয়াত-১১৪)

মওদূদী সাহেব বলেনঃ আত্মশুদ্ধির জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা পূর্বশর্ত, অর্থাৎ রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্জন করা ছাড়া ব্যক্তির আত্মশুদ্ধি অসম্ভব । (আত্মশুদ্ধির ইসলামি পদ্ধতি-৭)

তিনি আরও বলেনঃ তরিকত বা পিরালীর মাধ্যমে মুসলমানদেরকে আফীম দেওয়া হয়েছে, এর ফলে তাদেরকে অচেতন, অকর্মা ও অকেজো করে দেওয়া হয়েছে । (তাজদীদে ইহইয়ায়ে দ্বীন-২২)

এভাবে তিনি ইসলামের অনেক বিষয়ে এমন মন্তব্য করেছেন, যা পূর্ববর্তী সকল উলামায়ে কেরামের বিপরীত।

মওদূদী সাহেব বর্তমানে জীবিত নেই। কিন্তু তার রেখে যাওয়া ভ্রান্ত মতবাদ এখনও পুরোদমে চালু আছে। তার কিছু ভক্ত ও অন্ধ অনুসারী না বুঝে উক্ত ভ্রান্ত চিন্তাধারা সমাজে প্রচার করে যাচ্ছেন এবং মানুষকে ধোঁকায় ফেলার জন্য বাহ্যিকভাবে ইসলামের বুলি আওড়িয়ে বস্তুত ইসলামকে বিকৃত করে নতুন ধর্ম গড়ার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এহেন পরিস্থিতিতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে মওদূদী মতবাদ প্রচারে গোপন সমর্থন প্রদান করা কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য জায়িয হবে না। তাই আপন জান-মালের মাধ্যমে এ ফিতনা মূলোৎপাটনের জন্য সঠিক চেষ্টা চালানো আজ সকল মুসলমানের উপর ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যারা না বুঝে এ ভ্রান্ত মতবাদ গ্রহণ করেছেন বা এর শিকার হয়েছেন; তাদের প্রতি আমাদের আকুল আবেদন এই যে, আপনারা হক্কানী উলামায়ে কেরামের সুহবতে আসুন। উল্লেখিত কথাগুলো নিয়ে ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন। কবরে ঈমানের পরীক্ষা একবারই হবে, ফেল করলে দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। মওদূদী সাহেব এর সাথে উলামায়ে কেরাম এর কোনো ঝগড়া বা হিংসা নেই। শুধুমাত্র সাধারণ মুসলমানদের ঈমানের হেফাযতের জন্যই এই প্রচেষ্টা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে এই ঈমান বিধ্বংসী ফিতনা থেকে হিফাযত করে সঠিক ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তৌফিক দান করুন। আমীন।

ডা. যাকির নায়েক এর ভ্রান্ত মতবাদ

ডা. যাকির নায়েকের পরিচয়ঃ

ডা. যাকির নায়েক ভারতের বিখ্যাত শহর (মুম্বাই) এ ১৯৬৫ সালের ১৮ অক্টোবর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এ শহরে খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করেন। অতঃপর মুম্বাই এ হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত কৃষ্ণ চন্দ্র চলের 'রাম কলেজ' থেকে এস, এস,সি, পাশ করেন। তারপর মুম্বাই এর 'ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ' থেকে এম,বি,বি,এস, ডিগ্রী অর্জন করে ডাক্তার হন।

জীবনের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তিনি কোনো দ্বীনী মকতব/মাদরাসা বা খানকায় লেখা-পড়া করেননি। যার ফলে দ্বীনী বিষয়ে সরাসরি কুরআন হাদীস বুঝার বা তা থেকে উপকৃত হওয়ার যোগ্যতা তিনি লাভ করতে পারেননি।

ঘটনাচক্রে ১৯৯৪ সালে মুম্বাই শহরে দ্বীনের এক দাঈ ডা. আহমাদ দীদাতের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। সে তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ডাক্তারী পেশা ছেড়ে দিয়ে দ্বীনী বই-পত্র চর্চার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তবে তিনি তার দ্বীন চর্চা কোনো যোগ্য আলেমের বাতলানো পদ্ধতিতে করেননি। বরং নিজে যেভাবে ভালো মনে করতেন, সে ভাবে করেছেন। (সূত্রঃ হাকীকতে যাকির নায়েক, পৃ. ৩০-৩২সায়্যিদ খালিক সাজিদ বুখারী কৃত)

হক্কানী আলেম-উলামাদের সুহবতে গিয়ে দ্বীনের সহীহ জ্ঞান লাভ না করার ফলে দ্বীনের প্রচারের ক্ষেত্রে তার দ্বারা লাভের চেয়ে ক্ষতিই ছড়াচ্ছে বেশি।
নিম্নে দ্বীন সম্পর্কে তার কিছু ভ্রান্তি তুলে ধরা হলোঃ

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে ভ্রান্তিঃ

ডা. সাহেব বলেনঃ আল্লাহ তা'আলাকে ব্রহ্ম ও বিষ্ণু প্রভৃতি নামে ডাকা যাবে। (লেকচার সমগ্র, ১/২৬৫ পিস পাবলিকেশন্স, ঢাকা থেকে প্রকাশিত)

ইসলাম বলেঃ আল্লাহ তা'আলাকে তার সত্তাগত নাম হিসেবে 'আল্লাহ' নামে ডাকতে হবে। আর যদি তাকে তার গুণগত নামে ডাকা হয়, তাহলে তিনি নিজের জন্য যে সকল নাম নির্ধারণ করেছেন, সে নামেই তাকে ডাকতে হবে। (যেমন রাহমান,রাহিম,গাফফার,সাত্তার, রায্যাক ইত্যাদি।) (সূরা বনী ইসরাঈল-১১০, সূরা ত্বহা-৮, সূরা আ'রাফ-১৮০,সূরা হাশর-২৪,বুখারী-২৭৩৬)

নবী সম্পর্কে ভ্রান্তিঃ

ডা. সাহেব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হায়াতুন্নবী হওয়ার আক্বীদাকে অস্বীকার করেন। (লেকচার সমগ্রক চার সমগ্র-৫/৯৫)

অথচ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হলো, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য নবীগণ আ. ইন্তিকালের পর কবরের মধ্যে জীবিত অবস্থায় আছেন। যদিও সেটা হুবহু দুনিয়ার মতো নয়। (মুসলিম-২/১৭৮, মুসনাদে আহমাদ-৩/১৫৬)

সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে ভ্রান্ত বক্তব্যঃ

ডা, সাহেব বলেনঃ ‘পরবর্তীতে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন, আর লোকজন তখন তার কথাগুলোর উদ্বৃতি দিতে শুরু করলো এবং কেউ কেউ এমন কথাও বলতে শুরু করলো, যা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো বলেননি। (লেকচার ৫/৭৬)

অথচ ইসলাম বলে, সাহাবারা হলেন সত্যের মাপকাঠি। (সূরা বাকারা-৮) এবং হাদীসে তাদের সকলকে ন্যায় পরায়ণ বলা হয়েছে।

কুরআন সম্পর্কে নাপাক কথাঃ

ডা. সাহেব বলেনঃ কুরআন স্পর্শ করতে উযূর প্রয়োজন নেই। বিনা উযূতে কুরআন স্পর্শ করতে পারবে এবং সূরা ওয়াকিয়ার ৮৯ নং আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দেন। (লেকচার -২/৬২৬)

অথচ বিনা উযূতে কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। এ ব্যাপারে উল্লেখিত আয়াত ছাড়াও হাদীসে স্পষ্ট বর্ণনা আছে যে, একমাত্র পবিত্র ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ করতে পারবে। (মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক ১/১৪৩) ছোট বা বড় নাপাক ওয়ালা ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না।

হুর সম্পর্কে মন্তব্যঃ

ডা. সাহেব বলেনঃ হুর পুরুষ এবং মহিলা উভয় প্রকারের হবে। পুরুষ হুর জান্নাতী নারীদেরকে পাবে, আর মহিলা হুর জান্নাতী পুরুষদেরকে পাবে। (লেকচার সমগ্র - ১/৩৫৯)

অথচ কুরআন হাদীসের আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, হুর দ্বারা নারীসঙ্গিনী উদ্দেশ্য, পুরুষ হুর বলতে কিছু নেই। (সূরা রাহমান-৭২, তাফসীরে জালালাইন-পৃ.৪৪৬, তাফসীরে কুরতুবী-১১/৬১৪, তিরমিযী-২/৮০)

ডা. যাকির নায়েক কর্তৃক প্রদত্ত কতিপয় ভুল মাসায়েল

(১) ডা. সাহেব বলেনঃ একসঙ্গে তিন তালাক দিলে, তাতে এক তালাক পতিত হবে। অথচ কুরআন শরীফ ও বুখারী শরীফসহ অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, কেউ তার স্ত্রীকে একসঙ্গে তিন তালাক দিলে (যদিও তা গুনাহের কাজ) তিন তালাক পতিত হবে। এবং হালালার পর পুনরায় বিবাহ ব্যতীত তাদের দেখা-সাক্ষাত, মেলা-মেশা সব কিছু যিনা হিসেবে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে সমস্ত ফুকাহায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে কেরাম একমত। (সূরা বাকারা-আয়াত নং, আবু দাউদ শরীফ-১/২৯৮)

(২) ডা. সাহেব বলেনঃ ফযরের আযান শুরু হলেও সাহরী করার ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় রয়েছে, হাতে যে খাবার রয়েছে, তা শেষ করার সুযোগ রয়েছে। হতে পারে তা এক গ্লাস পানি বা পাত্রের বাকী অল্প খাবার। (লেকচার সমগ্র ৩/৩২৪)

ডা. সাহেবের উপরোক্ত মাসায়েল কুরআন-হাদীসের সাথে একেবারেই সাংঘর্ষিক। কারণ, কুরআন ও হাদীস দ্বারা বুঝা যায় সাহরী খাওয়া সুবহে সাদিকের পূর্বেই শেষ হতে হবে।
সুবহে সাদিকের পর সামান্য কিছু খেলেও রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। (সুরা বাকারা-৮৭)

(৩) ডা. সাহেব বলেনঃ মহিলাদের চেহারা ঢেকে রাখা আবশ্যিক নয়। তাদের মুখে নেকাব দেওয়া ফরয নয়। (লেকচার সমগ্রঃ ১/১৪.১৭৫.৩৬৬.৪৪৮, ৫/১৬৯)

অথচ ইসলামের হুকুম হলো, নিকাব বা হিজাব দ্বারা তাদের চেহারা ঢেকে রাখতে হবে। (সূরা আহযাব-৫৩/৫৯)

(৪) ডা. সাহেব বলেনঃ 'পোশাক যদি হারাম না হয়, সব শর্ত পূরণ করে, তাহলে আপনি কোর্তা, প্যান্ট, শার্ট যেটা পরে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন, সেটা পরতে পারেন।' (লেক. -২/৫৫০)

ডা. সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ মনগড়া। কেননা, ইসলামে বাহ্যিক লেবাস-পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পোশাকের ক্ষেত্রে কাফিরদের বেশ-ভূষা গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। হাদীস শরীফে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তাদের (বিধর্মীদের) সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে, সে তাদের দলভুক্ত। (মুসনাদে আহমাদ- হা.নং১১৯৯)

আর একথা সকলের নিকট স্পষ্ট যে, পোশাকের ক্ষেত্রে প্যান্ট-শার্ট বিধর্মীদের পোশাকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

(৫) ডা. সাহেব বলেনঃ জুম'আর দিনে আগে ঈদের নামায আদায় করলে পরে জুম'আর নামায আদায় করা আর না করা ঐচ্ছিক ব্যাপার। (লেকচার সমগ্র ৫/৪৭৬)

অথচ ইসলামের বিধান হল, পাঁচ ওয়াক্ত নামায ও জুম'আর নামায অপরিহার্য ফরয হুকুম। অন্য কোনো আমলের দ্বারা এগুলোর হুকুম শিথিল হবে না। তাই জুম'আর দিন ঈদ হলে ঈদের নামায পড়লে ও জুম'আর নামায অবশ্যই পড়তে হবে। (সুনানে দারা কুতনী পৃ. ৩৩৫, নাইলুল আওতার ৩/২২৪)

(৬) ডা. সাহেব বলেনঃ যখন তোমরা সফর করবে, তখন তোমরা দুই ওয়াক্তের নামায একসাথে পড়তে পারো। সফরের সময় কেউ এভাবে সালাত আদায় করলে, আমার কোনো আপত্তি থাকবে না। (লেক. ২/৪৩)

এক্ষেত্রে তিনি পবিত্র কোরআনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। অথচ হানাফী মাযহাবে এ হাদীসের অর্থ, এক ওয়াক্তকে আরেক ওয়াক্তে নিয়ে পড়া নয়। কারণ, তা হারাম ও কবীরা গুনাহ। হাদীসের আসল ব্যাখ্যা হলো, যান বাহন থেকে বারবার উঠা-নামার ঝামেলা এড়াতে ওয়াক্তের শেষের দিকে একবার অবতরণ করে, সেই ওয়াক্তের নামায পড়ে নিবে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে দ্বিতীয় ওয়াক্ত এসে গেলে সেটাও

পড়ে নিবে। তাহলে একই অবতরণে দুই ওয়াক্ত নামায পড়া হলেও প্রতিটি তার ওয়াক্তমত পড়া হয়।

(৭) ডা. সাহেব বলেনঃ আমাদেরকে ইসলামী শরীআহ মেনে এরকম সিনেমা বানাতে হবে, যেটা কুরআন হাদীসের বিরুদ্ধে যাবে না। শরীআহ মেনেই বানাবো। শুধু সিনেমাই নয়, আমাদের নাটক বানাতে হবে, ডকুমেন্টারিও বানাতে হবে। (লেকচার সমগ্র, ২/২৩১)

অথচ ইসলামী শরী'আতে সিনেমা-নাটক সম্পূর্ণরূপে হারাম। কেননা, ছবি ছাড়া এগুলো তৈরী অসম্ভব। আর প্রাণীর ছবির ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, কেয়ামতের দিন ছবি অঙ্কনকারীকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। (বুখারী শরীফ-)

(৮) ডা. সাহেব বলেনঃ মাসিক চলাকালীন নারীগণ নামায, রোযা, কাবাঘর তাওয়াফ এবং ইতিকাফ ছাড়া আর সব ইবাদত করতে পারবে। ঋতুবর্তী নারী রমযানের শেষ দিন যা করতে পারবে তা হলো, ঐ সময়টি সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে পারে। এ ছাড়া আর যে কাজ তারা করতে পারে তা হলো, তারা সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহু আকবার ইত্যাদি পড়বে এবং তারা কুরআন তেলাওয়াত করতে পারে। (লেক, ৫/৩৮৯)

অথচ হাদীস শরীফে স্পষ্ট এসেছে, الحائض والجنب لا يقرأ القرأن অর্থাৎ হায়েযা মহিলা এবং নাপাক ব্যাক্তি যেন কুরআনের কোনো অংশ পাঠ না করে । (বুখারী, মুসলিম)

এ কারণে মাযহাব চতুষ্টয়ের মধ্যে এ ব্যাপারে ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, হায়েযা মহিলা বা যার উপর গোসল ফরয তাদের জন্য কুরআন তিলাওয়াত হারাম।

(৯) ডা. সাহেব মাযহাবের ইমামের তাকলীদের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে এ সম্পর্কে তার ভ্রান্ত মত জনগণের সামনে তুলে ধরেন। ইমামে আ'যম আবু হানীফা (রহ.) সহ অনেক ইমাম ও সালাফকে বিষাক্ত শব্দের নিশানা বানিয়েছেন। (লেকচার সমগ্র)

(১০) ডা. সাহেব প্রথমে পরস্পর বিরোধী কিছু হাদীস এবং আছার তুলে ধরে বলেনঃ সুতরাং তারাবীহ্ যত রাকা'আত খুশী তত রাকা'আত আদায় করা যাবে। (লেকচার সমগ্রকচার সমগ্র৫/২৪৭)

অথচ হাদীস শরীফে স্পষ্ট এসেছে, ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, 'নিশ্চয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানে ২০ রাকা'আত (তারাবীহ্) এবং বিতর পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা-২/২৮৬)

আর তারাবীহ্ ২০ রাকা'আত এ ব্যাপারে মাযহাব চতুষ্টয়ের সকল ইমাম ঐক্যমত পোষণ করেন যে, তারাবীহ্ এর নামায ২০ রাকা'আতের কম পড়া যাবে না। মালেকী

মাযহাবে ৩৬ রাকা'আত তারাবীহ্। তবে কোনো ইমামই ৮ রাকা'আত তারাবীহ্ পড়াকে বৈধ বলেননি। তাহলে ডা. সাহেব এর কথা কীভাবে সহীহ হতে পারে?

শী'আ মতবাদ

শী'আদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ইয়ামানের সানআ শহরের জনৈক ইয়াহুদী আলেম ছিল আবদুল্লাহ ইবনে সাবা। যে উসমান রা. এর খেলাফত কালে ইসলাম গ্রহণ করে। আসলে ইসলাম গ্রহণ দ্বারা তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করা। সে মদীনায় কিছু দিন উক্ত উদ্দেশ্যে কাজ করে। এরপর বসরা ও সিরিয়ায় যায়। কিন্তু পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে না পেরে অবশেষে মিসর গমন করে। এবং সেখানে তার কিছু সাহায্যকারী পেয়ে যায়। সে এবং তার সহযোগীরাই তৃতীয় খলীফা উসমানকে রা. হজ্জের মওসুমে মদীনা খালী অবস্থায় শহীদ করে এবং তাদের তলোয়ারের মুখেই উম্মতের ঐক্যের স্বার্থে আলী রা. কে বাধ্য হয়ে খেলাফতের মসনদে বসতে হয় এবং জঙ্গে সিফফীনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা এবং তার অনেক ভক্ত ষড়যন্ত্রমূলক আলী রা. এর দলভুক্ত ছিল। তাদেরকে "শী'আনে আলী" সংক্ষেপে শী'আ বলা হয়। এক সময় উক্ত আব্দুল্লাহ দলের মধ্যে বিভিন্ন ভ্রান্ত আক্বীদা প্রচার করতে থাকে, এরপর সে তার মিশনে আরো মজবুতভাবে কাজ করতে থাকে।

শী'আরা প্রথমতঃ তিনটি দলে বিভক্ত ১.তাফযীলিয়া শী'আ ২. সাবাইয়্যা শী'আ ৩. চরমপন্থি শী'আ।

তাফযীলিয়া শী'আঃ এরা আলীকে রা. আবুবকর রা. ও উমর রা. এর উপর ফযীলত দিয়ে থাকেন।

সবাইয়্যা শী'আঃ এরা হযরত সালমান ফারসি রা., আবূ জর গিফারী রা., মেকদাদ ও আম্মার ইবনে ইয়াছির প্রমুখ অল্প সংখ্যক সাহাবী ব্যতীত অন্য সকল সাহাবী থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, এমনকি তাঁদেরকে মুনাফিক এবং কাফের পর্যন্ত বলে। (কিতাবুর রওযা)

চরমপন্থি শী'আঃ এদের ২৪ টি উপদল ছিল, তাদের মধ্যে একটির নাম ইমামিয়া বা ইসনা আশারা গ্রুপ, এটাই ছিল সবচেয়ে বড় দল বা ভয়ংকর দল।

ইমামিয়াদের দলের মধ্যে প্রসিদ্ধ ৩টি গ্রুপ ১. ইছনা আশারিয়া, ২.ইসমাঈলিয়া, ৩. যায়দিয়া।

ইছনা আশারিয়া বা ইমামিয়াদের আক্বিদা হলো যেঃ- আল্লাহ তা'আলা যেমন তার বান্দাদের হেদায়েতের জন্য নবী-রাসূলদের মনোনীত করেছেন ঠিক তেমনি নবীর ওয়াফাতের পর থেকে বান্দার পথ প্রদর্শনের জন্য ইমাম মনোনীত করা শুরু করেছেন, আর তাদের আক্বীদা অনুযায়ী কিয়ামত পর্যন্ত বার জন ইমাম আসবে।

ইমাম সম্বন্ধে শী'আদের আক্বীদা-বিশ্বাসঃ

১. ইমামগণ নবীর ন্যায় আল্লাহর পথ থেকে মনোনীত হন। (উসুলে কাফী ২/২৫-২৬)

২. শী'আদের বক্তব্য হল কুরআন মাজীদে ইমামত ও ইমামগণের বর্ণনা ছিল যা পরবর্তিতে মুছে ফেলা হয়েছে। (উসুলে কাফীঃ-২/২৭৭)

৩. ইমামগণ পয়গম্বরগণের মতই আল্লাহর প্রমাণ। (উসুলে কাফীঃ-১/২৫০)

৪. ইমামগন পয়গাম্বরগণের মতই নিষ্পাপ। (উসুলে কাফীঃ-১/২৮৭)

৫. ইমামগণের মর্তবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সমান এবং অন্য সকল পয়গম্বরের উর্ধ্বে। (উসুলে কাফীঃ-৩/১০)

৬. ইমামগণ যা ইচ্ছা অথবা হারাম ঘোষণা করার ক্ষমতা রাখেন। (উসূলে কাফী ২/৩২৬)

৭. ইমাম ব্যতীত দুনিয়া কায়েম থাকতে পারে না। (প্রাগুক্ত পৃ ২৫৩)

৮. ইমামগণের অতীত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞান অর্জিত থাকে। (উসূলে কাফী ১/৩৬৬)

৯. ইমামগণের জন্য কুরআন হাদীস ছাড়াও জ্ঞানের অন্যান্য অত্যাশ্চর্য সূত্র রয়েছে। (উসূলে কাফী ১/৩৪৫-৪৬)

১০. ইমামগণের এমন জ্ঞানে আছে যা ফেরেশতা ও নবীগণেরও নেই। (উসূলে কাফী ১/৩৭০)

১১. প্রত্যেক জুম'আর রাত্রিতে ইমামগণের মেরাজ হয়। তারা আরশ পর্যন্ত পৌঁছেন। (উসূলে কাফী ১/৩৭২)

১২. ইমামগণের প্রতি, প্রতি বছরের শবে কদরে আল্লাহর পথ থেকে এক কিতাব নাযিল হয় যা ফেরেশতা ও রূহ নিয়ে আসেন। (উসূলে কাফী ১/৩৬৬)

১৩. ইমামগণ তদের মৃত্যুর সময়ও জানেন এবং তাদের মৃত্যু তাদের ইচ্ছাধীন থাকে। (উসূলে কাফী ১/৩৮৭)

১৪. ইমামগণের সামনেও মানুষের দিবা রাত্রির আমল পেশ করা হয়। (উসূলে কাফী ৩১৯)

১৫. ইমামগণ কিয়ামতের দিন সমসাময়িক লোকদের জন্য সাক্ষ্য দিবেন। (উসূলে কাফী ১/২৮০)

১৬. ইমামগণের আনুগত্য করা ফরয । (উসূলে কাফী ১/২৬৩)

১৭. ইমামগণের ইমামত নবুওয়াত ও রিসালাত স্বীকার করা এবং তাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা নাজাতের জন্য শর্ত। (উসূলে কাফী ১/২৫৫)

১৮.ইমামত, ইমামগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ও তা প্রচারের আদেশ সকল পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থের মাধ্যমে এসেছে। (উসূলে কাফী ২/৩১৯)

১৯. ইমামগণ দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক এবং তার যাকে ইচ্ছা দান করেন ও যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। (উসূলে কাফী ২/১৬৯)

২০. ইমামগণ মানুষকে জান্নাতে ও দোযখে প্রেরণকারী। (উসূলে কাফী ১/২৮০)

২১. যে ইমামগণকে না মানে সে কাফের।

২২. জান্নাতে যাওয়া না যাওয়া ইমামগণের মান্যকরা না করার উপর নির্ভরশীল।

সাহাবা বিদ্বেষ সংক্রান্ত আকীদাঃ

১.তারা তিন খলীফা তথা আবূ বকর, উমর ও উসমান রাযি. কে কাফের ও জাহান্নামী মনে করে। (উসূলে কাফী ২/২৮৯)

২. শিয়াদের কথিত ব্যাখ্যা অনুসারে যারা আলী রাযি. এর ইমামত মানে না তাদেরকে তারা জাহান্নামী মনে করে। এভাবে তারা সব সাহাবিকে এবং সমস্ত মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করেছে। (উসূলে কাফী ২/৩৯৪)

৩. তাদের ধারণা হলো প্রতিশ্রুত মাহদি আত্মপ্রকাশ করার পর হযরত আয়িশা রাযি. কে জীবিত করে যিনার শাস্তি দিবেন। (ইরানী ইনকিলাব)

৪. তাদের ধারণা হলো সাহাবায়ে কেরাম প্রায় সকলেই বিশেষত খলীফাত্রয় কাফের, ধর্মত্যাগী, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস ঘাতক, জাহান্নামী অভিশপ্ত । (উসূলে কাফী ২/৩৯৮)

৫. তাদের ধারণা হলো অন্তর্হিত ইমাম যখন আত্মপ্রকাশ করবেন তখন আবূ বকর ও উমর রাযি.কে কবর থেকে বের করে হাজারবার শুলিতে চড়াবেন। (হকুকুল ইয়াকিন)

৬. তাদের ধারণা হলো হযরত আয়িশা ও হাফসা রাযি. মুনাফিক ছিলেন। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বিষ দিয়ে খতম করেছেন। (হায়াতুল কূবূল পৃ. ৮৭০)

কুরআন বিকৃতির আকীদাঃ

১.তাদের ধারণা হলো পাক পঞ্চতন তথা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী,ফাতেমা,হাসান,হুসাইন রাযি. এবং তাদের সকল ইমামদের নাম কুরআনে ছিলো। এগুলো কুরআন থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। (উসূলে কাফী ২/২৮৩)

২.কুরআনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ যেখানে হযরত আলীর খেলাফতের বয়ান আছে গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। (ইরানী ইনকিলাব)

৩. তাদের মনগড়া দাবি হলো কুরআন বিকৃতি সম্বন্ধে নাকি হযরত আলী রাযি.ও বলে গেছেন। (অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা।)

৪. তাদের ধারণা হলো আসল কুরআন ১২তম ইমামের নিকট রয়েছে যিনি মেঘের মধ্যে আছেন। কিয়ামতের পূর্বে আসল কুরআন নিয়ে তিনি অবতরণ করবেন। (উসূলে কাফী ১/৩৩২)

উপর্যুক্ত ইমাম, কুরআন ও সাহাবাদের সম্পর্কে শীয়াদের ভ্রান্ত আকীদার মধ্য থেকে প্রত্যেকটি আকীদা এমন যে , কেউ যদি এর মধ্য থেকে একটি আকীদাও দিলে স্থান দেয় তাহলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া তাদের আরো এমন অনেক ফাসেদ আকীদা রয়েছে যা ঈমানের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই সকল মুসলিমদের

উচিত এ ধরণের বাতিল আকীদা থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন।

কাদিয়ানি মতবাদ

এই দলের প্রতিষ্ঠাতা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ১৮৩৯/৪০ খ্রিস্টাব্দ পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার কাদিয়ান অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা নিজ এলাকাতেই লাভ করেন। লেখা-পড়া সমাপ্ত করে পাঞ্জাবের এক অফিসে কেরানির চাকুরী গ্রহণ করেন। পূর্ব হতেই তার পরিবার ইংরেজদের তল্পীবাহক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। গোলাম আহমাদ প্রাথমিক পর্যায়ে নিজেকে একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে ইংরেজদের প্রকাশ্য দালালী ও নিজেকে মূলহাক, (যার অন্তরে দৈব বাণী অবতীর্ণ হয়) মুহাদ্দাস (আল্লাহ যার সাথে অন্তরে অন্তরে কথা বলেন), প্রতিশ্রুত ঈসা মসীহ, নিজেকে প্রথমে নবী এবং পরিশেষে 'আমিই সর্বশেষ নবী' ইত্যাদি অসংখ্য জঘন্য ভ্রান্ত আকীদার দাবী করে বসলে তার আসল চেহারা ফাঁস হয়ে যায় এবং সমস্ত হক্কানী আলেম উলামা তাকে মুরতাদ ফাতাওয়া দেন।

তার কিছু ভ্রান্ত আকীদা ও তার খন্ডন নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(১) আল্লাহ সম্পর্কে তার আকিদাঃ

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী লিখেছেন, 'আমি স্বপ্নে দেখেছি আমিই আল্লাহ'। (আয়েনায়ে কামালাতে মির্জা পৃ.৫৬৪,৫৬৫, কাদিয়ানী মাযহাব পৃ.৩২৮)

অথচ কুরআনে কারিমে ইরশাদ হয়েছে 'আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক, তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। (সূরা বাকারা.২৫৫)

সুতরাং ঘুমের মধ্যে আল্লাহ হওয়ার স্বপ্ন দেখাটা তার মিথ্যুক হওয়ারই প্রমাণ বহন করে। মির্জা কাদিয়ানীর বইতে আছে 'আল্লাহ তাকে বলেছেন শুন! হে আমার ছেলে'। (গোলাম আল বুশরা ১/৪৯, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ পৃ.৩০৮)

অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি। (সূরা ইখলাসঃ ৩) আরও দেখুন সূরা নিসাঃ১৭১, সূরা ইউনুসঃ৬৮)

হাদীসে কুদসীতে আছেঃ- আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 'বনী আদম আমাকে মিথ্যারোপ করেছে, অথচ তার এরূপ করার কোনো অধিকার নেই এবং সে আমাকে গালি দিয়েছে, অথচ তার এরূপ করার কোনো অধিকার নেই। আর আমাকে মিথ্যারোপ করাটা এভাবে যে, সে বলে তিনি আমাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন সেভাবে কিছুতেই পুনরুত্থান করতে পারবেন না। আর আমাকে গালি দেওয়াটা এভাবে যে, সে বলে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন অথচ আমি অমুখাপেক্ষী, আমার সন্তান নেই এবং আমি কারও সন্তান নই এবং আমার কোনো সমকক্ষ নেই। (বুখারী হাদীস নং ৪৯৭৪, নাসাঈ হাদীস নং ২০৭৮)

(২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তার আকীদাঃ

মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজ বইতে লিখেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী নন, বরং গোলাম আহমাদ সর্বশেষ নবী। (হাকীকাতুন নবুয়াত পৃ.৮২, তিরইয়াকুল কুলূব পৃ.৩৭৯, আদইয়ানে বাতেলা আওর সিরাতে মুতাকীম পৃ.১৩২)

অথচ কুরআনে এসেছে ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের কারো পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ’। সূরা আহযাবঃ ৪০

এক হাদীসে এসেছে, শীঘ্রই আমার উম্মতের মাঝে ৩০ জন মিথ্যুকের আবির্ভাব ঘটবে, তারা প্রত্যেকেই অমূলক দাবি করবে যে, সে আল্লাহর নবী, অথচ আমিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী নেই। (আবূ দাউদ ২/২২৮, তিরমিযী ২/৪৫, বুখারী হাদীস নং ৩৫৩৫, মুসলিম হাদীস নং ২২৮৬)

সে আরো লিখেছে, ‘গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অধিক মর্যাদাবান’ (হাকীকুতুন নাবুয়াত পৃ.২৭২, আরবাঈন পৃ.৩০৮, আদইয়ানে বাতেলা পৃ.১৩২, ইসলামী আকীদা পৃ. ৩০৮)

অথচ কুরআনে এসেছে, ‘সমস্ত নবীদের থেকে আল্লাহ তা‘আলা এ অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তোমরা যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানা পাও তাহলে তোমরা অবশ্যই তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে’ (আল ইমরানঃ ৮১)

এই আয়াত দ্বারা বুঝা গেল নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ আর গোলাম আহমাদ তো নবী নয় এমনকি একজন সাধারণ মুসলমানও নয় অতএব তার মর্যাদা একজন মুমিন থেকেও বহুগুন নিচে, তাহলে তার মর্যাদা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বেশি হয় কীভাবে?

আর কুরআনে বিশের অধিক জায়গায় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু মির্জা সাহেবের দাবি হলো এসব জায়গায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নয় বরং তাকে সম্বোধন করা হয়েছে। (দাফেউল বালা পৃ.১৩, ইজাযে আহমাদীঃ ১১/২৯১)

এমন মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে কুরআনে এসেছে, ‘তোমরা আল্লাহর সম্বন্ধে মিথ্যা বলতে ও তার নির্দেশ সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে, সে জন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে (সূরা আনআমঃ৯৩)

কুরআন শরীফে নবীজীকে সম্বোধন করাটা মির্জা গোলাম আহমাদ নিজের দিকে সম্পৃক্ত করে কতবড় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে!

(৩) ঈসা আ. ও অন্যান্য নবীদের ব্যাপারে তার আকিদাঃ

গোলাম আহমাদের বইতে আছে, ঈসা আ. এর তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। (ইজাযে আহমাদী পৃ.১৪, আদইয়ানে বাতেলা পৃ.১৩৩)

অথচ কুরআনে এসেছে 'আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে? (সূরা নিসাঃ ৮৭) আর নবীগণ যা কিছু বলেন আল্লাহর হুকুমেই বলেন। অতএব নবীদের ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মিথ্যা হতে পারে না। সুতরাং কাদিয়ানীর ঈসা আ. এর তিনটি ভবিষ্যৎবাণী মিথ্যা হওয়ার দাবি করা পরোক্ষভাবে একথারই দাবি করা যে, আল্লাহই মিথ্যা বলেছেন (না'উযুবিল্লাহ)

কাদিয়ানীর বইতে আছে, হয়রত ঈসা আ. মৃত্যু বরণ করেছেন, তিনি কিয়ামাতের পূর্বে আগমন করবেন না। (ইযালায়ে কুলাঁ ২/৩১১, আদইয়ানে বাতেলা পৃ.১৩৪)

অথচ কুরআনে এসেছে 'কাফিররা বলে থাকেঃ আমরা আল্লাহর রাসূল মারইয়াম তনয় ঈসা মাসীহকে হত্যা করেছি, অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, কিন্তু তাদের বিভ্রম হয়েছিল। তারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল এ সম্বন্ধে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাদের কোনো জ্ঞানই ছিল না। এটা নিশ্চিত যে, তারা তাকে হত্যা করে নাই বরং আল্লাহ তাকে আসমানে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন এবং আল্লাহ যবরদস্ত শক্তিমান ও হিকমাতওয়ালা'। (সূরা নিসাঃ১৫৭)

হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, অচিরেই তোমাদের মধ্যে মারইয়াম তনয় ঈসা আ. আসবে ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ রূপে.... (বুখারী হাদীস নং ৩৪৪৮)

কাদিয়ানীর বইতে আছে, 'মির্জা সাহেব বনী ইসরাইলের নবীদের চেয়ে উত্তম' (দাফেউল বালা পৃ.২০)

অথচ সর্ব সম্মত আকীদা হলঃ কোন মুমিন চাই সে যত বড় বুযূর্গ হোক না কেন কোনো নবীর চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হতে পারে না। (শরহে আকায়েদ পৃ.১৬১) তাহলে মির্জা সাহেব যিনি সাধারণ মুমিনের সমান নয়, তিনি কীভাবে বনী ইসরাঈলের নবীদের ঊর্ধ্বে মর্যাদা সম্পন্ন হতে পারেন?

(৪) ফেরেশতা সম্পর্কে আকীদাঃ

মির্জার বইতে আছে 'ফেরেশতা বলতে কিছু নেই' (তাওযীহে মারাম পৃ. ২৯, আদইয়ানে বাতেলা পৃ. ১৩৩) অথচ কুরআনে এসেছে 'আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, নিশ্চয় তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই ফেরেশতাগণ এবং জ্ঞানীগণও..... (আল ইমরানঃ১৮, সূরা বাকারা.৩০,১৬১, সূরা নিসাঃ৯৭) ঈমানে মুফাস্সালের মধ্যে দ্বিতীয় নাম্বারে ফেরেশতাদের উপর ঈমান আনার ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া চারজন বড় বড় ফেরেশতার নাম কার অজানা? সুতরাং একমাত্র বেঈমান ব্যতীত অন্য কেউই ফেরেশতাদেরকে অস্বীকার করতে পারে না।

কাদিয়ানীর বইতে আছে ‘জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গেছে।’ (হাশিয়ায়ে আরবাঈন পৃ.১৫৪, আদইয়ানে বাতেলা পৃ.১৩৩)

অথচ কুরআনে এসেছে ‘তোমরা তাদের (কাফিরদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো যতক্ষণ না ফিৎনা (কুফুরী কর্মকান্ড) দূরীভূত না হয়..’ (সূরা আনফালঃ৩৯, আরো দেখুন, সূরা আন কাবূতঃ ৬৯, হুজুরাতঃ১৫, ফুরকানঃ৫২)

(৫) হাশর সম্বন্ধে কাদিয়ানীর বিশ্বাসঃ

মির্জা বলেন, ‘মৃত্যুর পর হাশরের ময়দানে কেউ একত্র হবে না। বরং সরাসরি জান্নাত বা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।’ (ইযালায়ে আহকামে কুলাঁ পৃ.১৪৪, আদইয়ানে বাতেলা পৃ.১৩৩)

অথচ আল্লাহ বলেন, ‘স্মরণ করো যেদিন তাদের সকলকে একত্র করবো। মুশরিকদের বলবো, যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়? (সূরা আনআমঃ ২২, আরো দেখুন, কাহাফঃ৪৭, ফাতিহা আয়াতঃ ৩, এছাড়া বহু হাদীসে হাশরের ময়দানের আলোচনা আছে যেমন বুখারী শরীফ ১ম খন্ড বাবুস সুজূদ)

মির্জার আরো কিছু ভ্রান্ত আকিদা

১. মির্জার বইতে আছে, ‘যে ব্যক্তি মির্জার নবুওয়াত মানে না সে জাহান্নামী কাফের’ (রবয়ীন পৃ.৪. আদইয়ানে বাতেলা পৃ. ১৩২) অথচ সমগ্র দুনিয়ার উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া হলো যে, যে ব্যক্তি মির্জাকে নবী মানবে সে কাফের।

২. মির্জা নিজে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করেছেন। (আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম পৃ. ৪২৩) (ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদঃ ৩২৬) অথচ সে ব্যক্তি হেদায়াত ও ঈমান বঞ্চিত এক বদ নসীব ও হাজারো মানুষকে গোমরাহ করণেওয়ালা।

৩. তারা উপরন্তু ২০ পারার মত কুরআন নাযিল হওয়ার দাবী করেছে। (হাকীকাতুল ওহী পৃ.৩৯১/ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদঃ৩২৭) অথচ নবী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কারো উপর আসমানী ওহী নাযিল হতে পারে না, হ্যাঁ, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক হয়তো তার উপর কোন হুকুম হয়েছিল সেটাকে তিনি ওহী মনে করেছেন।

৪. তিনি নিজেকে হিন্দুদের শ্রী কৃষ্ণ অবতার হওয়ার দাবী করেছেন। (কাদিয়ানী মাযহাব পৃ.৪৩২/ ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদঃ৩২৮) নাঊজুবিল্লাহ, এর দ্বারা তার কাফির হওয়া স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

৫. তিনি নিজেকে যুলকারনাঈন হওয়ার হাস্যকর দাবি করেছেন। (বারাহীনে আহমদিয়া পৃ.৯৭/ ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ পৃ.৩২৯) অথচ কুরআনে বর্ণিত জুলকারনাইন বহু পূর্বে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করে ইন্তিকাল করেছেন। এছাড়াও তার আরও অসংখ্য ভ্রান্ত আক্বীদা রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, তিনি মিথ্যা নবী না হলে বেইজ্জতির মৃত্যু কামনা করতেন না এবং সেটি তার জীবনে বাস্তবায়িতও হতো না। এটাও তার মিথ্যুক হওয়ার জ্বলন্ত প্রমাণ। এ ছাড়া মুহাম্মাদী বেগম সহ বিভিন্ন ব্যাপারে তিনি অসংখ্য ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যার সবগুলি পরবর্তীতে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অথচ সত্য নবীদের কোন একটা ওয়াদা অঙ্গিকারও মিথ্যা প্রমাণিত হয় নাই।

তার এসকল ভ্রান্ত আকীদার পরিপ্রেক্ষিতে সর্ব প্রথম ১৮৮৯ খৃ. লুধিয়ানার আলেমগণ তাকে কাফের বলে ফাতওয়া দেন। এর পর একে একে দারুল উলুম দেওবন্দ হতে ১৯৭৪ সালে, রাবেতা আলমে ইসলামীর সম্মেলনে ১৪৪টি মুসলিম রাষ্ট্রের সংগঠনের পথ হতে তাকে এবং তার অনুসারীদেরকে সর্বসম্মতভাবে কাফের ঘোষণা করা হয়। এবং ১৯৮৮ সালে ও. আই. সি. এর উদ্যোগে সকল মুসলিম দেশের ধর্ম মন্ত্রীদের এক সম্মেলনে তাকে ও তার অনুসারীদেরকে কাফের ঘোষণা করার লিখিত প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়। সেমতে প্রায় সকল মুসলিম দেশেই তাদেরকে অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। (ইসলামী আকিদা ও ভ্রান্ত মতবাদ পৃ.৩৩২)

মুহাম্মাদ ﷺ সারা বিশ্বের জন্য প্রেরিত সর্বশেষ নবী; তাওরাত-ইঞ্জিল ও আল-কুরআনের আলোকে

ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান ভাইয়েরা মনে করে মূসা ও ঈসা আ. শেষ নবী। তাই তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত ধর্ম ইসলাম মানছে না। অথচ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই শেষ নবী, এ কথা যেমন কুরআনে বলা হয়েছে তেমনিভাবে তাওরাত-ইঞ্জিলেও বলা হয়েছে। আমরা আল কুরআন ও তাওরাত-ইঞ্জিল থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেষ নবী হওয়ার প্রমাণ উল্লেখ করার প্রয়াস পাবো ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা করি সত্যপ্রেমি ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ভাইয়েরা সত্য গ্রহণ করতে দ্বিধা করবে না।

আল কুরআন থেকে: হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশ্ব নবী ও সর্বশেষ নবী হওয়া সম্পর্কে আল কুরআনের কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছে :

১.‘হে নবী আপনি বলুন, হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের সকলের জন্য প্রেরিত রাসূল’। (সূরা আরাফ:১৫৮)

২. ‘আমি আপনাকে সমগ্র মানব জাতির জন্য (জান্নাতের) সুসংবাদদাতা ও (জাহান্নামের আযাবের ব্যাপারে) সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।’ (সূরা সাবা:২৮)

৩. ‘পরম কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দা (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর উপর ফয়সালার গ্রন্থ (আল কুরআন) নাযিল করেছেন, যাতে করে তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হন।’ (সূরা ফুরকান:১)

৪. ‘তিনিই তাঁর রাসূলকে হিদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে এ ধর্মকে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।’ (সূরা ফাতহ:২৮)

৫. ‘মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।’ (সূরা ফাতাহ:২৯)

৬. ‘মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।’ (সূরা আহযাব:৪০)

এসব আয়াত থেকে আল কুরআনের আলোকে একথা সুপ্রমানিত হলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই সারা বিশ্বের মানুষের জন্য নবী এবং তিনিই সর্বশেষ নবী। অতএব, পরকালে চিরমুক্তির জন্য ইয়াহুদি-খ্রিস্টানসহ অন্য সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের জন্য ইসলামের নবী, বিশ্ব মানবতার নবী, সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানতে হবে। তাঁর আনীত আদর্শকে নিজের জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করতে হবে।

তাওরাত-ইঞ্জিলের আলোকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামঃ

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে অনেক আলোচনা হয়েছে। স্বয়ং কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, ‘যারা অনুসরণ করবে উম্মী রাসূলের যাঁর কথা তারা লিপিবদ্ধ পেয়ে থাকে তাওরাত ও ইঞ্জিলে’। (সূরা আনআম : ১৫৭)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে : ‘স্মরণ কর যখন মরিয়াম তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত রাসূল, আর এমন রাসূলের আগমনের সুসংবাদবাহক যিনি আমার পরে আগমন করবেন, তাঁর নাম হবে আহমাদ’। (সূরা সাফ)

তাওরাত ইঞ্জিলে যেহেতু শেষ নবীর আগমনের সুসংবাদ ছিল, তাই ইয়াহুদী-খ্রিস্টানরা অধীর আগ্রহে শেষ নবীর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলো। কিন্তু তারা আশা করছিলো যে, বনী ইসরাঈল থেকেই শেষ নবীর আগমন ঘটবে। যখন তা হলো না; বরং বনী ইসমাঈল থেকে শেষ নবীর আগমন ঘটল তখন তারা জিদের বশে জেনে শুনে শেষ নবীকে অস্বীকার করলো। তাদের এই আচরণের কথাও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। বর্ণিত হচ্ছে : ‘যখন তাদের (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান) কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কিতাব (কুরআন) এসে পৌঁছলো, যা সে বিষয়ে সত্যায়ন করে যা তাদের কাছে রয়েছে এবং তারা পূর্বে ভবিষ্যত রাসূলের দোহাই দিয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের দুআ করতো, যখন তাদের কাছে সেই পূর্বপরিচিত কিতাব আসলো, তখন তারা সেটাকে অস্বীকার করলো। এসব কাফেরদের উপর আল্লাহ তাআলার অভিসম্পাত।’ (সূরা বাকারা : ৮৯)

অন্যত্র বর্ণিত হচ্ছে: ‘আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি (ইয়াহুদী-খ্রিস্টান) তারা তাঁকে (শেষ নবীকে) চিনে যেমনভাবে চিনে আপন সন্তানদেরকে’। (সূরা বাকারা : ১৪৬)

যাই হোক আমরা এখন তাওরাত-ইঞ্জিল থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কে কিছু ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করছি।

১. হযরত মূসা আ. বলেন: 'মাবূদ তূর পাহার হতে আসলেন, তিনি সেয়ীর থেকে তাদের উপর আলো দিলেন, তাঁর আলো পারণ পাহাড় থেকে ছড়িয়ে পড়লো।' (দ্বিতীয় বিবরণ: ৩৩/১:৩)

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিতে 'তাঁর আলো পারণ পর্বত হতে ছড়িয়ে পড়লো' বলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ওহী নাযিল হওয়া এবং বিশ্ব মানবের পথনির্দেশকারী আল কুরআনের কথা বুঝানো হয়েছে। এখানে 'পারণ পর্বত' বলে মক্কার পর্বত শ্রেণীকে বুঝানো হয়েছে। হেরা পাহাড় ঐসব পর্বত শ্রেণীরই অংশ। কেননা বাইবেলের ভাষ্যকার সকলেই একমত যে, এখানে 'পারণ' বলে ঐ স্থানকেই বুঝানো হয়েছে যে স্থানে হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈল বসবাস করতেন বলে আদি কিতাবে উল্লেখ পাওয়া যায়।

২. হযরত মূসা আ. বলেন: 'যত দিন না শীলো আসেন এবং সমস্ত জাতি তাঁর হুকুম মেনে চলে, ততদিন রাজদণ্ড এহুদারই বংশে থাকবে। আর তার দুহাটুর মাঝ খানে থাকবে বিচার দণ্ড'। (আদি পুস্তক : ৪৯/১০)

উক্ত পদে 'শীলো' বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা ১৬২৫, ১৮২২, ১৮৩১ ও ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত বাইবেলের আরবী অনুবাদে 'শীলো' শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে الذى له الكل 'যার জন্য সব কিছু'। এ গুণটিও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্যই খাটে। তিনি যেহেতু সকল নবী রাসূলের সর্দার ছিলেন, তাই সব কিছু তার জন্য হওয়াটাই স্বাভাবিক। তিনি নিজে বলেছেন : 'আমি আদম সন্তানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, এতে অহংকারের কিছু নেই'। (ইবনে মাজাহ হা. নং ৪৩০৮)

উক্ত পদে বলা হয়েছে 'সমস্ত জাতি তাঁর হুকুম মেনে চলবে'। এ কথাটি একমাত্র নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। কারণ, তিনিই সকল জাতির নবী। যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। উক্ত পদ দ্বারা আরেকটি বিষয় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শীলোর আগমন হলে ইহুদীদের রাজত্ব ও জাতীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পরে বাস্তবেই ইহুদীরা রাজত্ব হারিয়ে ছিলো। 'আর রিসালাতুল হাদিয়া' নামক গ্রন্থে ইহুদী পণ্ডিত আব্দুস সালাম ইসলাম গ্রহণের পর উপরে আলোচিত বিষয়টিই বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন।

৩. হযরত মূসা আ. বলেন: 'মাবূদ আমাদের বলেছিলেন, তারা ভালোই বলেছে। আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে তোমার মত একজন নবী দাঁড় করাবো। তার যবান দিয়েই আমি আমার বক্তব্য পেশ করব। আর আমি তাকে যা বলার নির্দেশ করব তিনি

তাই তাদেরকে বলবেন। তিনি আমার নাম করে যে কথা বলবেন কেউ যদি আমার সে কথা না শুনে আমি নিজেই সে লোককে দায়ী করবো। পক্ষান্তরে আমি বলিনি এমন কোনো কথা যদি কোনো নবী আমার নাম করে বলতে দুঃসাহস করে কিংবা সে যদি দেব-দেবীর নামে কথা বলে, তবে তাকে হত্যা করতে হবে। কোনো একটা কথা সম্পর্কে তোমরা মনে মনে বলতে পার, মাবূদ এ কথা বলেছেন কিনা তা আমরা কি করে জানবো? কোনো নবী যদি মাবূদের নাম করে কথা বলে, আর তা যদি অসত্য হয় কিংবা না ঘটে, তবে বুঝতে হবে সে কথা মাবূদ বলেন নি, সেই নবী দুঃসাহস করে ঐ কথা বলেছে। তাকে তোমরা ভয় করো না। (দ্বিতীয় বিবরণ:১৮/১৭:২২)

এখানে উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী আখেরী নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই খাটে। কেননা উক্ত বাণীতে 'তাদের ভাইদের মধ্য হতে একজন নবী দাঁড় করাবো।' এখানে 'তাদের বলে' বনী ইসরাঈলকে বুঝানো হয়েছে। আর বনী ইসরাঈলের ভাই হল বনী ইসমাঈল। আদি পুস্তকের ১৬ এর ১২ তে ও বনী ইসমাঈলকে বনী ইসরাঈলের ভাই হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ কথা সবাই জানে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী ইসমাঈলের অন্তর্ভুক্ত।

উক্ত বাণীতে আরো বলা হয়েছে, 'তার যবান দিয়েই আমি আমার কথা বলবো' প্রাচীন বাংলা অনুবাদে আছে 'তাহার মুখে আমার বাক্য দিবো' এটি প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ হযরত মূসা ও ঈসাকে যেভাবে লিখিত আকারে আল্লাহর কালাম দেওয়া হয়েছিল উক্ত নবীকে সেভাবে দেওয়া হবে না। বরং আল্লাহর কালাম তাঁর মুখে তুলে দেওয়া হবে। আর এ কথা তো সবার জানা যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লিখিত আকারে কোনো কিতাব দেওয়া হয়নি। বরং যে কুরআন শরীফ তাঁর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল তা তাঁর যবানেই ছিল।

ইঞ্জিল শরীফের প্রেরিত অংশে সর্ব প্রধান হাওয়ারী হযরত ঈসার শিষ্য পিতরের বক্তব্য দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা আ. এর শিষ্যদের বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, এ ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত ঈসা আ. ছাড়া অন্য কোনো নবী সম্পর্কে করা হয়েছে। অতএব, কোনো খ্রিষ্টান যদি মনে করেন যে, মূসা আ. ভবিষ্যদ্বাণীটি হযরত ঈসা আ. এর ব্যাপারে তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ ভুল। পিতরের বক্তব্যের বর্তমান বঙ্গানুবাদটি খানিকটা বিকৃত বিধায় আমরা ১৮৪১ সালের ফার্সী অনুবাদ থেকে তা তুলে ধরছি: পিতর বলেন, 'আপনারা তাওবা করুন এবং আল্লাহর দিকে রুজু করুন, যাতে করে আপনাদের পাপ মোচন করা হয় এবং তিনি ঈসা মসীহকে যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিলো পুনরায় পাঠাতে পারেন, কেননা আসমান ততদিন তাকে হেফাজত করবে যতদিন পর্যন্ত প্রাচীন কাল থেকে পাক নবীদের মাধ্যমে আল্লাহ যা বলেছিলেন তা না ঘটবে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, হযরত মূসা আমাদের পূর্ব পুরুষদের বলেছিলেন, তোমাদের খোদা তোমাদের জন্য তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে আমার মত একজন নবী পাঠাবেন। তিনি যা কিছু তোমাদেরকে বলবেন,

তোমরা তা মান্য করবে, যে কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করবে না তাকে তাঁর লোকদের মধ্য থেকে একেবারে ধ্বংস করে ফেলা হবে।' (প্রেরিত:১৮/১৯:২৩)

উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে দিবালোকের ন্যায় এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ভবিষ্যদ্বানীকৃত নবী হযরত ঈসা ব্যতীত অন্য কেউ হবেন। যার আগমনের পূর্ব পর্যন্ত হযরত ঈসা আ. আসমানে অবস্থান করবেন।

ইহুদী পণ্ডিতরা অকপটে স্বীকার করতো যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কেই করা হয়েছে। তাদের কেউ তো ইসলাম গ্রহণ করেছে যেমন, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.। আর কেউ কেউ সে সৎসাহস দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে।

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন, একবার নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীদের বাইতুল মিদারাস (যে ঘরে তারা তাওরাত ইত্যাদি পড়ে শোনাতো) এ গেলেন এবং বললেন, তোমাদের সর্বাপেক্ষা বড় আলেমকে নিয়ে আস। তারা আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়াকে নিয়ে আসল। তিনি তাকে নিরালায় নিয়ে স্রষ্টার কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি জানেন আমি আল্লাহর রাসূল? উত্তরে বললো, হ্যাঁ, অবশ্যই জানি, আর আমাদের সকলেই আমার মতোই জানে। আপনার গুণাবলি তাওরাতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের লোকেরা প্রতিহিংসাবশত তা মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আপনার ইসলাম গ্রহণ করতে বাঁধা কোথায়? সে বলল, আমি গোত্রীয় লোকদের বিরুদ্ধে চলা পছন্দ করি না। আমি আশাবাদী তারা আপনার কথা মেনে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করবে আর তখন আমিও ইসলাম গ্রহণ করব।' (আল ওয়াফা: ১/১০৩, আশশিফা: ১/৩৬৩, সীরাতে ইবনে হিশাম: ২/৫১৮)

৪. হযরত ঈসা আ. আপন শিষ্যদেরকে মোনাজাতের বিষয়ে শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা এইভাবে মুনাজাত করো; হে আমাদের বেহেশতী পিতা! তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক, তোমার রাজ্য আসুক, তোমার ইচ্ছা যেমন বেহেশতে তেমনি দুনিয়াতেও পূর্ণ হোক।' (মথি : ৬/৯ : ১০, লুক : ১১/২) অনত্র বলা হয়েছে, ঈসা আ. তাঁর বারজন শিষ্যকে ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানোর সময় বলেছিলেন, তোমরা যেতে যেতে এ কথার তাবলীগ করো যে, বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে। (মথি:১০/৭) তাছাড়া হযরত ইয়াহইয়া আ. এবং হযরত ঈসা আ. একই কথার তাবলীগ করতেন যে, তাওবা কর। কারণ, বেহেশতী রাজ্য কাছে এসে গেছে। (মথি: ৩/১:২, ৪/১২:১৭) অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত ঈসা আ. আরো সত্তরজন উম্মতকে তাবলীগে পাঠাবার জন্য বাছাই করলেন এবং যাবার সময় যা উপদেশ দিলেন তার মধ্যে 'আল্লাহর রাজ্য কাছে এসে গেছে' এর তাবলীগের উপদেশ ছিল। (লুক: ১০/১, ৮:১১)

উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা বুঝা যায় যে, ‘বেহেশতী রাজ্য’ তথা ঈসা কর্তৃক আনীত নাজাতের পথ ছাড়া অন্য কোনো একটা উত্তম নাজাতের পথ। আর তা হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত পথ। হযরত ঈসা আ. হযরত ইয়াহইয়া আ. এবং ঈসা আ. এর শিষ্যদের যমানাতেও উক্ত নাজাতের পথ আসেনি। নতুবা তারা তা প্রকাশের সময় কাছে এসে গেছে মর্মে দাওয়াত প্রদান করতেন না এবং শিষ্যদেরকেও এ ব্যাপারে উপদেশ দিয়ে যেতেন না।

৫. হযরত ইদরীস আ. বলেন: (প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদ হিসাবে বঙ্গানুবাদ) ‘প্রভু তার দশ হাজার পবিত্র লোকের সঙ্গে আসলেন।’ (এহুদা : ১৪:১৫) এ পদটিতে খ্রিষ্টানরা বিভিন্নভাবে পরিবর্তন সাধন করে তা অন্য খাতে প্রবাহিত করতে চেয়েছে। ‘দশ হাজার’ এর অর্থ করেছে, অযুত অযুত। আরেক বাইবেলে অর্থ করেছে, লক্ষ। আর পবিত্র লোকের সঙ্গে আগমনের অর্থ করেছে, পবিত্রের নিকট থেকে এলেন, অর্থাৎ একাই বের হয়ে এলেন। এসব আলামত দ্বারা যাতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিনা না যায় এ জন্য তারা এসব খিয়ানত আশ্রয় নিয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন : খ্রিষ্টান:মুসলিম সংলাপ পৃ.৩৪)

কিন্তু প্রাচীন ইংরেজী অনুবাদ দেখলে বুঝা যায়, উক্ত ভবিষ্যদ্বানীতে হযরত ইদরীস আ. ‘প্রভু’ বলে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আর ‘পবিত্রলোক’ বলে সাহাবায়ে কেরামকে বুঝিয়েছেন। কারণ তিনিই মক্কা বিজয় কালে দশহাজার সাহাবীসহ মক্কায় হাজীর হয়েছিলেন।

৬. হযরত ঈসা আ. বলেন: ‘তোমরা যদি আমাকে মুহাব্বাত কর, তাহলে আমার সমস্ত হুকুম মেনে চলবে, আমি পিতার নিকট প্রার্থনা করবো এবং তিনি তোমাদের কাছে আরেকজন সাহায্যকারী প্রেরণ করবেন। তিনি তোমাদের কাছে চিরকাল থাকবেন। সেই সাহায্যকারীই সত্যের আত্মা। দুনিয়া তাকে গ্রহণ করতে পারে না, কারণ দুনিয়া তাকে দেখতে পায় না এবং তাকে জানেও না। তোমরা কিন্তু তাকে জানো, কারণ তিনি তোমাদের সংগে সংগে থাকবেন। তিনি তোমাদের অন্তরে বাস করবেন। (যোহন ১৪:২৫:২৬)

ঈসা মসীহ আ. আরো বলেন, তোমাদের সংগে থাকতে থাকতেই এ সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি। সেই সাহায্যকারী অর্থাৎ পাক রূহ যাঁকে পিতা আমার নামে পাঠিয়ে দিবেন, তিনিই সমস্ত বিষয় তোমাদের শিক্ষা দিবেন। আর আমি তোমাদের যা কিছু বলছি সেই সমস্ত তোমাদের মনে করিয়ে দিবেন। (যোহন:১৫/২৬) এখানে সাহায্যকারীকে পাক রূহ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এটা খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের খিয়ানত। কারণ সাহায্যকারী পাক রুহ নন বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। কারণ, তিনিই দুনিয়াবাসীকে হযরত ঈসা আ. এর শিক্ষা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

ঈসা আ. আরো বলেছেন, ‘ সাহায্যকারীকে আমি পিতার নিকট থেকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দিব, তিনি যখন আসবেন তখন তিনিই আমার বিষয় সাক্ষ্য দিবেন।

তিনি সত্যের রূহ।' (যোহন:১৬:৭:৮) সত্যিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কিতাব আল কুরআনে ঈসা আ. সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে।

ঈসা আ. আরো বলেছেন, 'তবুও আমি তোমাদের সত্যি কথা বলছি যে, আমার যাওয়া তোমাদের জন্য ভালো, কারণ আমি না গেলে সে সাহায্যকারী তোমাদের নিকট আসবে না। আমি যদি চলে যাই তবে তাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়ে দিব, আর তিনি এসে পাপের সম্বন্ধে, ধার্মিকতার সম্বন্ধে এবং বিচারের সম্বন্ধে জগতকে দোষী সাব্যস্ত করবেন।' (যোহন: ১৬/১২)

ঈসা আ. আরো বলেন, 'পরন্ত সেই সত্যের আত্মা যখন আসবেন, তখন তিনি তোমাদের পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন, কারণ তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, কিন্তু যা কিছু শুনেন তাই বলবেন এবং আগামী ঘটনাও তিনি তোমাদের জানাবেন, তিনি আমাকে মহিমান্বিত করবেন। (যোহন: ১৬:১৩)

উপরে উল্লেখিত বানীগুলোতে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। খ্রিষ্টান পাদ্রীরা এসব বাণীর মধ্যে অনেক রদবদল করেছে। যাতে এসব বাণী দ্বারা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝা না যায়; বরং স্বয়ং ঈসাকে বুঝা যায়। কিন্তু শেষ অবধি তারা সফল হতে পারেনি। কারণ, এসব বাণীর মধ্যে এমন সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে যা ঈসা এর মধ্যে পাওয়া যায় না বরং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যেই পাওয়া যায়। কিভাবে এসব গুণাবলী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে পাওয়া যায় তা দেখানো হচ্ছে :

বলা হয়েছে, 'তিনি বিশ্বাসীদের কাছে চির কাল থাকবেন' অর্থাৎ তার আদর্শ ও আনীত মুক্তির পথ কিয়ামত পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। এই গুণ হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেই খাস।

বলা হয়েছে 'তিনি সমস্ত বিষয় মানুষকে শিক্ষা দিবেন' ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে মানুষকে তার জীবনের প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আর এই পূর্ণ শিক্ষার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে বিদায় হজ্জের সময় আরাফার দিন একটি আয়াত নাযিল করে।

বলা হয়েছে 'ঈসা মসীহ যা কিছু বলেছিলেন সেই সমস্ত কথা বিশ্বাসীদের মনে করিয়ে দিবেন' আল কুরআন এ ব্যাপারে সাক্ষী যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা আ. এর শিক্ষা বিশ্ববাসীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

বলা হয়েছে 'তিনিই ঈসা আ. এর বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন, তার সম্পর্কে বলবেন।' কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈসা আ. সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

বলা হয়েছে, ‘ঈসা আ. না গেলে সেই সাহায্যকারী বিশ্ববাসীর নিকট আসবেন না।’ ঠিকই ঈসা আ.কে উঠিয়ে নেওয়ার পাঁচশত বছর পর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে এসেছেন।

বলা হয়েছে, ‘তিনি এসে পাপ, ধার্মিকতা ও বিচার সম্বন্ধে জগত বাসীকে দোষী সাব্যস্ত করবেন।’ এটাও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন। যেমন খ্রিষ্টানরা তিন খোদা মানে, আল্লাহর সন্তান আছে বলে দাবী করে এবং আদম আ. এর অন্যায় তার সন্তানদের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। অথচ এটা কোনো ন্যায় বিচার হতে পারে না যে, একজনের অন্যায় অন্যের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হবে।

আর খ্রিষ্টানরা ধার্মিকতা বলতে মনে করে যে, শুধু এ কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, ‘ঈসা মসীহ বিশ্ববাসীর পাপ মোচনের জন্য ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন।’ তারা আরো বিশ্বাস করে যে, শরীয়াত মত চললে মুক্তি নেই, শরীয়ত মত চলনেওয়ালা ঈসা মসীহ থেকে আরো দূরে সরে যায়। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উভয় বিষয়ে খ্রিষ্টানদেরকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন। ক্রুশ এর বিশ্বাসকে শিরক ও কুরআন বিরোধী বলেছেন এবং শুধুমাত্র শরীয়াত মানার মধ্যে মুক্তির ঘোষণা করেছেন।

বলা হয়েছে, ‘সেই সত্যের আত্মা মানুষকে পথ দেখিয়ে পূর্ণ সত্যে নিয়ে যাবেন।’ আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর কুরআন নাযিল করে দ্বীনকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিয়েছেন। যা বিদায় হজ্জের সময় নাযিলকৃত আয়াতে বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে, ‘তিনি নিজ থেকে কথা বলবেন না, যা শুনেন তাই বলবেন।’ আল কুরআনের সূরা নাজমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ‘তিনি নিজের মন মত কথা বলেন না; বরং তিনি যা বলেন সবই ওহী।’

বলা হয়েছে, ‘তিনি আগামী ঘটনাও বিশ্বাবাসীকে জানাবেন।’ এর হাজারো প্রমাণ আছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন কুরআন শরীফের সূরা রুম দেখুন।

বলা হয়েছে, ‘তিনি ঈসা আ. কে মহিমান্বিত করবেন।’ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল কুরআনের মাধ্যমে ঈসা আ. সম্পর্কে অনেক বাস্তব আলোচনা করেছেন। যার দ্বারা ঈসা আ. এর কদর বা মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রিয় পাঠক! ভেবে দেখুন উপরে উল্লেখিত গুণাবলী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কার মধ্যে বিদ্যমান ছিলো? এসব ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই এসব কথার উদ্দেশ্য ছিলেন। সুতরাং খ্রিষ্টান জগত যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি পাক রূহের জন্য প্রমাণের চেষ্টা করে তা একেবারেই ভুল। এসব আলামত পাক রূহের মধ্যে

পাওয়া যাওয়া তো দূরের কথা, আজ অবধি পাক রূহের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এখানে খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কিছু কথা বলা সময়ের দাবী । তাই আল কুরআন ও তাওরাত-ইঞ্জিল থেকে ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কিছু কথা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হলো :

১. আল্লাহ তাআলা ত্রিত্ববাদীদেরকে সর্তক করে দিয়ে বলছেন; 'হে গ্রন্থধারীগণ তোমরা নিজেদের ধর্মে সীমালঙ্ঘন করিওনা এবং আল্লাহ সম্বন্ধে ভ্রান্ত উক্তি করিও না, আর তিন (খোদা) বলিও না। ক্ষান্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য উত্তম হইবে, প্রকৃত প্রভুতো এক আল্লাহই...।' (সূরা:৪ আয়াত:১৭১)

২. আল্লাহ তাআলা ত্রিত্বাবাদীদের ভয়ানক শাস্তির সংবাদ দিয়ে বলছেন: 'নিশ্চয়ই তারা কাফের যারা বলে, আল্লাহ তিনের এক, অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনো উপাস্য নাই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পতিত হবে। তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করে না কেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে না কেন? আল্লাহ যে ক্ষমাশীল, দয়ালু।' (সুরা:৫ আয়াত:৭৩:৭৪)

৩. আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: 'দুই (বা ততোধিক) উপাস্য গ্রহণ করিও না, উপাস্য তো শুধু একজনই। সুতরাং তোমরা কেবল আমাকেই ভয় করিতে থাক।' (সূরা:১৬ আয়াত:৫১)

তাওরাত-ইঞ্জিলে একত্ববাদ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ত্রিত্ববাদের প্রমাণ তাওরাত ইঞ্জিলে নেই। যীশু একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। আর এ কথা সর্বজন বিদিত যে, পুরাতন নিয়মে ত্রিত্ববাদের লেশ মাত্র নেই। মূসা আ.ও ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। আর ঈসা আ. তার শিষ্যদেরকে একত্ববাদই শিক্ষা দিয়ে গেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কে মূসা ও ঈসা আ. এর উক্তি তুলে ধরা হলো।

মোশি (মূসা আ.) বলেন: 'হে ই ইস্রায়িল শোন, আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভূ একই সদাপ্রভূ, আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভূকে প্রেম করিবে।' (দ্বিতীয় বিবরণ:৬:৪:৫)

ফরীশীদের একজন আলেম ঈসা আ. কে জিজ্ঞাসা করলেন, হুজুর মূসার শরীয়াতের মধ্যে সবচেয়ে বড় হুকুম কোনটা? যিশু কেবল মোশিরই পুনরুক্তি করে বললেন: প্রথমটি এই, হে ইস্রায়িল, শোন, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু, আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে।' (বাইবেল,মার্ক:১২:২৯:৩০)

ইঞ্জিল শরীফে বলা হয়েছে: 'খোদা এক এবং তিনি ছাড়া আর কোনা খোদা নাই।' (ইঞ্জিল শরীফ, মার্ক:১২:৩২)

ত্রিত্ববাদের উৎস: মূলত ঈসা আ. এর প্রস্থানের ৩২৫ বছর পর নেছীয়া সম্মেলনে এথ্যানেসিয়ান নামক একজন মিসরী যাজক ত্রিত্ববাদের জন্ম দেয়। সম্রাট কনষ্ট্যানটাইন উক্ত মতবাদ মেনে নেয়। ঐ সম্মেলনে আরো কতগুলো ধর্মমত গ্রন্থ বদ্ধ করা হয়। তখন হতেই এ ধর্মমতকে এথ্যানেসিয়ান ধর্মমত বলা হয়ে থাকে। (সত্যের সন্ধানে পৃ.২৭)

যাই হোক আল কুরআন ও তাওরাত-ইঞ্জিলের আলোকে এ কথা প্রমাণিত হলো যে, ত্রিত্ববাদ বলতে কোনো কিছু নাই। বরং মোশি (মূসা) যীশু (ঈসা) এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকলে একত্ববাদই শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। তাই মুসলমান হয়ে যাওয়া এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়াই ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের মুক্তির একমাত্র পথ। আমরা সমস্ত অমুসলিমদেরকে বিশেষ করে খ্রিষ্টান ভাইদেরকে বাস্তবতা মেনে নিয়ে মুসলমান হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা সবাইকে সত্যকে বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

এই লেখাটি সনাতন ধর্মের অনুসারী হিন্দু ভাই-বোনদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। হিন্দু ভাইয়েরা যেহেতু নিজের হাতের তৈরি মূর্তিকে নিজেই পূজা করে থাকেন, তাই মূল আলোচনার আগে জ্ঞানীদের জন্য মূর্তি পূজা সম্পর্কে অন্তরচক্ষু খুলে দেওয়ার মতো আল কুরআনের একটি উপমা তুলে ধরছিঃ

আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা মূর্তিপূজারীদেরকে মূর্তি পূজা থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য খুব সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ ‘হে মানবমন্ডলী! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, মনোযোগসহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো (মূর্তি) তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, এই উদ্দেশ্যে তারা সবাই একত্রিত হলেও পারবে না; এবং মাছি যদি (তাদের সামনে রাখা প্রসাদ থেকে) কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, এটাও তারা মাছির নিকট থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। পূজারী ও দেবতা কতই দুর্বল!’ (সূরা হজ্জ, আয়াত:৭৩)

আজ বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে ভাবতেই অবাক লাগে যে, সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কীভাবে নিজের হাতের তৈরি মূর্তিকে নিজেই পূজা করে! পূজা যদি করতেই হয়, তাহলে মূর্তির জন্য উচিত ছিলো তার তৈরিকারীর পূজা করা। কিন্তু সে পূজা করবে কি, সেতো তার খাদ্যের উপর থেকে একটা মাছিও তাড়াতে পারে না। সে এতই দুর্বল যে, কুকুর তার উপর পেশাব করে দিলেও সে কুকুরকে তাড়াতে পারে না। নিজে দাঁড়াতেও পারে না, বাঁশের খুঁটির জোরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। এই যখন মূর্তির অবস্থা তখন কোন যুক্তিতে মূর্তির চেয়ে কোটিগুণ শক্তিশালী মানুষ মূর্তিকে পূজা করতে পারে?

যাই হোক মূল আলোচনা আসা যাক। আজ থেকে প্রায় বিশ-বাইশ বছর আগে ভারতে হিন্দি ভাষায় হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে গবেষণালব্ধ একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বইটি সমগ্র ভারতে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বইটির নাম "কল্কী অবতার" (যার অর্থ শেষ নবী)। বইটির লেখক একজন স্বনামধন্য হিন্দু পণ্ডিত, পণ্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়। তাঁর জন্ম এক সম্ভ্রান্ত হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারে। তিনি নিজেও হিন্দু। কিন্তু সত্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করেননি। এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটির সংস্কৃত বিভাগের রিসার্চস্কলার, প্রখ্যাত গবেষক এবং স্বনামধন্য পণ্ডিত। 'কল্কী অবতার' শীর্ষক গ্রন্থে খ্যাতনামা আরও আটজন হিন্দু পণ্ডিতের সমর্থন রয়েছে। তাদের সত্যায়িত স্বাক্ষরও উক্ত গ্রন্থে রয়েছে।

পণ্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় বলেন, হিন্দু ধর্মের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থসমূহে যে পথপ্রদর্শক মহাপুরুষ (বিশ্বনবী) এর আগমনবার্তা "কল্কী অবতার" নামে লিপিবদ্ধ রয়েছে, তিনি মূলত আরবের মুহাম্মাদ সাহেবই। সেই প্রতিশ্রুত 'কল্কী অবতার' তিনি ব্যতীত আর অন্য কেউ নন। সুতরাং সারা বিশ্বের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উচিত, আর অপেক্ষা না করে, মহাপুরুষ মুহাম্মাদ সাহেবকে "কল্কী অবতার" (বিশ্বনবী) হিসেবে মেনে নেয়া। (যার দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে- তাঁর উপর ঈমান আনা এবং তাঁর আনীত ইসলাম ধর্মকে গ্রহণ করা।)

বইয়ের লেখক বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, হিন্দু ধর্মের অনুসারীগণ "কল্কী অবতার" এর অপেক্ষা করছেন, কিন্তু এটা এমন একটি অপেক্ষা, কিয়ামত পর্যন্ত যার যবনিকাপাত ঘটবার নয়। কারণ, তারা যে পবিত্র সত্ত্বার, যে মহাপুরুষের আগমনের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁর তো আত্মপ্রকাশ ঘটে গেছে আজ হতে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বেই। তিনি এসে তাঁর মিশন বাস্তবায়িত করে লোক চক্ষুর অন্তরালে চলে গেছেন।

পণ্ডিত বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় তাঁর দাবীর স্বপক্ষে হিন্দু ধর্মের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ 'বেদ' ও 'পুরাণ' হতে দলীল পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন-

(ক) "পুরাণ" (হিন্দু ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ) এ লেখা আছে ' "কল্কী অবতার" এ জগতে ভগবানের (আল্লাহর) সর্বশেষ বার্তাবাহক (পয়গাম্বর) হবেন। তিনি সমগ্র জগত এবং বিশ্ব মানবতার পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রেরিত হবেন।' এ বর্ণনার পর পন্ডিতজী লিখেছেন, এটা একমাত্র মুহাম্মাদ সাহেবের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হচ্ছে। তিনিই সমগ্র জগত ও বিশ্ব মানবতার পথ প্রদর্শক।

(খ) হিন্দু ধর্ম-মতের একটি ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী "কল্কী অবতার" (বিশ্বনবী) একটি দ্বীপ সাদৃশ্য স্থানে জন্মগ্রহণ করবেন। হিন্দু ধর্মের কথিকা অনুযায়ী এ দ্বীপটি আরব দেশই, যা আরব উপদ্বীপ নামে খ্যাত।

(গ) হিন্দু ধর্মের পবিত্র গ্রন্থে উল্লেখ আছে, "কল্কী অবতারের" পিতার নাম "বিষ্ণু ভগত" এবং মাতার নাম হবে "সুমানিব"। সংস্কৃতে "বিষ্ণু" এর আভিধানিক অর্থ

হচ্ছে- “আল্লাহ” এবং “ভগত” এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- “বান্দা”। সুতরাং “বিষ্ণু ভগতের” আরবী রূপ হবে “আবদুল্লাহ্” যার অর্থ হচ্ছে- “আল্লাহর বান্দা”। “সুমানিব” এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আমন বা শান্তি- যার আরবী রূপ হচ্ছে “আমিনা”। হযরত মুহাম্মাদ সাহেবের পিতার নাম আবদুল্লাহ্ এবং মাতার নাম আমিনাই ছিল।

(ঘ) হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহে উল্লেখ আছে- “কল্কী অবতার” এর প্রধান খাদ্য হবে খেজুর ও জয়তুনের তেল এবং তিনি সেখানকার লোকজনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আমানতদার ও সত্যবাদী হবেন। বলাবাহুল্য, এটাও মুহাম্মাদ সাহেবের উপর পরিপূর্ণরূপে প্রযোজ্য।

(ঙ) বেদগ্রন্থসমূহে লেখা আছে ‘কল্কী অবতার তাঁর এলাকার সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করবেন।’ এটাও পরিপূর্ণভাবে মুহাম্মাদ সাহেবের উপর প্রযোজ্য হয়।

(চ) ‘কল্কী অবতারকে ভগবান (আল্লাহ্) নিজস্ব বার্তাবাহক (ফেরেশতা) এর মাধ্যমে গুহার ভেতর শিক্ষা প্রদান করবেন।’ এটাও মুহাম্মাদ সাহেবের সাথেই খাটে। কারণ, হযরত মুহাম্মাদ সাহেবকে জিবরাইল ফেরেশতার মাধ্যমে হেরা গুহায় শিক্ষা দান করা হয়েছে।

(ছ) ভগবান (আল্লাহ্) এর পক্ষ হতে ‘কল্কী অবতারকে একটি দ্রুতগামী ঘোড়া প্রদান করা হবে- যার উপর সওয়ার হয়েই সমগ্র জগত এবং সপ্তম আকাশ পরিভ্রমণ করবেন।’ হযরত মুহাম্মাদ সাহেবের “বোরাকে” বসে মি‘রাজ গমনের দিকে উপরের বক্তব্যে সুস্পষ্ট ইংগিত রয়েছে।

(জ) ‘কল্কী অবতারকে ভগবান (আল্লাহ) আসমানী সাহায্য দানে ধন্য করবেন।’ বদর ও উহুদের যুদ্ধে মুহাম্মাদ সাহেবকে ফেরেশতার দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে, যা ছিল আসমানী সাহায্য।

(ঝ) সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী হচ্ছে- ‘কল্কী অবতার চান্দ্র মাসের ১২ তারিখ জন্মগ্রহণ করবেন বলে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে।’ হযরত মুহাম্মাদ সাহেব চান্দ্র মাসের ১২ তারিখেই জন্ম গ্রহণ করেছেন।

(ঞ) ‘কল্কী অবতার ঘোড় সওয়ার ও তলোয়ার চালনায় হবেন সুদক্ষ।’ এ দলিলটি উল্লেখ করার পর পন্ডিতজী যা লিখেছেন- তা প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেন- বাস্তব সত্য হচ্ছে- ঐশীগ্রন্থ কুরআনে বর্ণিত, মুহাম্মাদ সাহেবই সেই “কল্কী অবতার” (বিশ্বনবী) যার আলোচনা আমাদের (হিন্দু) ধর্মগ্রন্থসমূহে বিদ্যমান রয়েছে।

উপর্যুক্ত দলীল ছাড়া আরো বহু সংখ্যক দলীল দ্বারা তিনি প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন যে, হিন্দু ধর্মের ধর্মগ্রন্থসমূহে “কল্কী অবতার” (মহাপুরুষ) হিসেবে যার

আগমনের কথা উল্লেখ রয়েছে, তিনি আরবের “মুহাম্মাদ সাহেব” ব্যতীত অন্য আর কেউ নন। সুতরাং যারা আমাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী “কল্কী অবতার” এর অপেক্ষা করছেন, তাঁদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করা উচিত। (“সাপ্তাহিক আল-জমিয়ত” দিল্লী, ষষ্ঠ বর্ষ, ৩৫ তম সংখ্যা ২৭শে আগষ্ট, ১৯৯৩ ইং এর সৌজন্যে।)

সারকথা, পণ্ডিত বেদ প্রকাশ সাহেবের কথা দ্বারা একথা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, হিন্দু ভাইয়েরা যদি আসলেই হিন্দু হয়ে থাকে এবং তাদের ধর্মীয় গ্রন্থ মেনে থাকে, তাহলে তাদের জন্য জরুরী হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাওয়া। হিন্দু ভাইদের এ কথা জেনে রাখা উচিত যে, আল-কুরআনে সব মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, ‘যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্যকোনো ধর্ম পালন করে, তা কখনো তার থেকে গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে।’ (সূরা আল ইমরান, আয়াত : ৮৫)

তাই জ্ঞানী হিন্দু ভাই-বোনদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা যদি পরকালের অশেষ-অসীম জীবনে শান্তি চান, যদি নরক থেকে বাঁচতে চান এবং স্বর্গে যেতে চান, তাহলে আপনাদের ধর্ম গ্রন্থে যে ‘কল্কী অবতারের’ কথা বলা হয়েছে (যিনি মূলত ইসলামের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে মানুন এবং তাঁর আনীত ধর্ম ‘ইসলাম’ গ্রহণ করে ইহকাল ও পরকালের সর্বোচ্চ সফলতা অর্জন করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে হেদায়াতের পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

ইলম উঠে যাচ্ছে, দায়ী কারা?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, ‘আল্লাহ তা‘আলা বান্দাদের থেকে হঠাৎ করে ইলম উঠিয়ে নিবেন না; বরং ইলম উঠিয়ে নিবেন উলামাদেরকে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। একপর্যায়ে যখন একজন হক্কানী আলেমও থাকবে না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে তাদের নেতা (মুফতী) হিসাবে গ্রহণ করবে। অতঃপর এই মূর্খরা ধর্মীয় বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে অজ্ঞতা স্বত্বেও ফাতাওয়া দিবে। ফলে তারা নিজেরা গোমরাহ হবে এবং অন্যদেরকেও গোমরাহ করবে।’ (বুখারী শরীফ হা.নং ১০০)

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘কিয়ামাতের আলামত এর মধ্য থেকে কয়েকটি হলো, ইলম উঠিয়ে নেওয়া এবং মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া, মদ পান করা এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়া’। (বুখারী শরীফ হা.নং ৮০)

ইলম উঠে যাওয়ার পিছনে উলামায়েকেরাম জড়িত। কেননা ইলমের হিফাজত ও ইশাআত মূলত উলামায়েকেরামের দায়িত্ব। সুতরাং তাদের দূরদর্শিতার অভাবে বা গলত সিদ্ধান্তের কারণে কিংবা ইলমের উপর কোনো হামলা এলে তা প্রতিহত না করার কারণে ইলম দুনিয়া থেকে উঠে যেতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত ইলম বিদায় নিয়ে মদীনায় চলে যাবে এবং সেখান থেকে কোনো এক সময় সম্পূর্ণভাবে উঠিয়ে নেওয়া হবে।

উলামায়ে কেরামের অবহেলার কারণেই মূলত দুনিয়া থেকে ইলম উঠে যাবে। তাই দ্বীনের ধারক-বাহক উলামায়েকেরামদের চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে যে, তাঁদের দ্বারা ইলম উঠে যাওয়ার মতো কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে কি না? ভেবে দেখার জন্য উলামা-তুলাবাদের খেদমতে ইলম উঠে যাওয়ার কয়েকটি কারণ পেশ করা হলো। আপনারা এর সাথে একমত হলে নিজেদের থেকে এই কারণগুলি দূর করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং ইলম পৃথিবীর বুকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণান্ত মেহনত করবেন বলে আশা করি। তাই আসুন আমরা ইলমকে হিফাজতের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে দায়মুক্ত হই এবং আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীন ও ইলম টিকিয়ে রাখতে সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক নসীব করুন। আমীন।

এক. ইলম উঠে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ ছেলেদের শর্ট কোর্স-মুখী হওয়াঃ

শর্ট কোর্স শুরু করা হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের জন্য। তারা যেন ৫/৬ বছর মেহনত করে নিজে কুরআন-সুন্নাহ বুঝার মতো যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকলে এতে আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু এখন অল্প বয়সী অনেক ছেলেরাও অল্প সময়ে আলেম হওয়ার জন্য এই নেসাবে পড়া-শুনা করছে। অথচ এদের দেওবন্দী নেসাব অনুযায়ী পড়া-শুনা করতে কোনো অসুবিধা ছিল না। এইসব বাচ্চাদের শর্ট কোর্সে পড়া-শুনা করা দশ দিক দিয়ে ইলম উঠে যাওয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে।

১. কুরআনের ব্যাখ্যায় বা তাফসীরে পারদর্শী হওয়ার জন্য পনের বিষয়ের ইলমের প্রয়োজন হয়। (আল ইতকান ২/৪৬৪ দারুল হাদীস, কায়রো) দেওবন্দী নেসাবে এসব বিষয় দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়ানো হয়ে থাকে। যার কারণে ছাত্ররা উক্ত পনেরো বিষয়ে পারদর্শী হয়ে গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরে শর্ট কোর্সে সময় কম হওয়ায় উক্ত পনেরো বিষয়ের সবগুলি বিষয় পড়ানো সম্ভব হয় না এবং অনেক জরুরী বিষয় বাদ পড়ে যায়। যার ফলে তাফসীরের বড় বড় কিতাব থেকে ফায়দা হাসিল করার যোগ্যতা তাদের মধ্যে তৈরি হয় না আর তারা পরিপূর্ণভাবে কুরআন বুঝার যোগ্যতা থেকে মাহরূম থেকে যাচ্ছে, অথচ কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে পারাই ইলমের মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য।

২. ইলমে নাহবের প্রসিদ্ধ কিতাব শরহে জামী, ইলমে ফিকাহ এর প্রসিদ্ধ কিতাব কানযুদ্দাকায়েক এবং মানতেকের প্রয়োজনীয় কিতাব শর্ট কোর্সে না থাকায় সেখানের ছাত্রদের মধ্যে কঠিন মাসআলা-মাসায়েল বুঝার যোগ্যতা সৃষ্টি হচ্ছে না। যার কারণে তারা ইমাম বুখারী রহ. এর ইস্তিম্বাতী মাসায়েল অর্থাৎ তারজামাতুল বাব সঠিকভাবে বুঝতে পারছে না এবং কঠিন কঠিন ফাতাওয়ার কিতাব বুঝা থেকেও মাহরূম হচ্ছে।

৩. ফার্সী ভাষায় লিখিত আকাবিরদের উলূম ও মা'আরিফ, শে'র-আশ'আর ও বিভিন্ন ফুনূনাত শেখানো হচ্ছে না। ফলে তারা রূহানিয়্যাত থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

৪. নিকট অতীতের দেওবন্দী আকাবিরদের অধিকাংশ উলূম ও মা'আরিফ উর্দূ ভাষায় লিখিত যা ইলমের শুধু ভান্ডার নয় সমুদ্রও বটে। শর্ট কোর্সের ছাত্রদের উর্দু ভাষায় দক্ষতা অর্জন না হওয়ার কারণে ইলমের এই বিরাট ভান্ডার থেকে ব্যাপকভাবে তারা বঞ্চিত হচ্ছে।

৫. শর্ট কোর্সের ছাত্ররা উর্দূ ভাষায় কাঁচা থাকায় উর্দূ ভাষাভাষী যে-সব আকাবির আমাদের দেশে আসেন তাদের তাকরীর তথা বয়ান তারা বুঝতে পারে না। এমনকি অনেক মি'য়ারী মাদরাসা যেখানে উর্দূতে তাকরীর হয় সেসব মাদরাসা থেকে তারা ইস্তিফাদা করতে পারছে না।

৬. দেওবন্দী নেসাবের মাদরাসার মধ্যে ছাত্রদেরকে বহুমুখী যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়াহ এই তিন বিষয়ের যেকোনো বিষয়ে তারা খেদমত করার যোগ্যতা রাখে। পক্ষান্তরে শর্ট কোর্সের মাধ্যমে বহুমুখী যোগ্যতা অর্জন না হওয়ায় তারা দ্বীনের যথাযথ খিদমত করতে পারছে না এবং তারা সমাজের দ্বীনী চাহিদা পূরণে চরমভাবে ব্যর্থ হচ্ছে।

৭. শর্ট কোর্সের ছাত্ররা যদিও মেশকাত দাওরা দেওবন্দী নেসাবের কোনো মাদরাসায় পড়ে (অবশ্য আজকাল অনেক শর্ট কোর্স মাদরাসায় মেশকাত ও দাওরা খোলা হয়েছে) কিন্তু ফারেগ হওয়ার পর শিক্ষা হিসাবে পড়ানোর জন্য যখন তাদেরকে কোনো দেওবন্দী নেসাবের মাদরাসায় পাঠানো হয়, তখন তারা বিভিন্ন কিতাব পড়া না থাকার কারণে সার্বিক খেদমত আঞ্জাম দিতে পারে না; বরং অনেক মি'য়ারী কিতাব তাদেরকে পড়াতে দিলে বলে উঠে, আমি এই কিতাব পড়িনি ঐ কিতাব পড়িনি অতএব, এসব কিতাব আমাকে পড়াতে দিবেন না।

৮. তার অযোগ্যতার দরুন যে বড় মাদরাসা থেকে সে ফারেগ হয়েছে ঐ মাদরাসার ও মাদরাসার আসাতিজার এই বদনাম হয় যে, ঐ মাদরাসার ভালো ছাত্ররাও কিতাব পড়াতে অক্ষম। ত্রুটি করলো একজন, অথচ এর দায় গ্রহণ করতে হচ্ছে আরেক জনকে।

৯. শর্ট কোর্সের এই মাদরাসাগুলি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সমাজের নওজোয়ানরা এর পরিণাম না বুঝে অল্প সময়ে আলেম হওয়ার জন্য ঐসব মাদরাসার দিকে ঝুঁকে

পড়ছে। তাদের আছর দেওবন্দী নেসাবের মাদরাসাগুলিতে পড়ছে। যার পরিণতিতে দেওবন্দী নেসাবের মাদরাসাগুলি থেকে কঠিন কিতাবগুলি একের পর এক উঠে যাচ্ছে এবং কোথাও কাফিয়া ও শরহে জামী একবছরে পড়ানোর কারণে দু'টির কোনোটিই পড়া হচ্ছে না। শুধু নামকে ওয়াস্তে উভয় কিতাবকে নেসাবের মধ্যে দেখানো হচ্ছে। এর পরিণতি এই হবে যে, ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে দেওবন্দী নেসাবের অস্থিত্ব বিলুপ্ত হবে, সব মাদরাসাগুলি শর্ট কোর্সে পরিণত হবে। তারপর এই দেশ থেকে ইলম বিদায় নিবে।

১০. শর্ট কোর্সে পড়ুয়াদের মধ্যে পর্যাপ্ত ইলমের অভাবে আমল এবং আদবের কমতি ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পুরোপুরি সুন্নাত তরীকার ইবাদত-বন্দেগী থেকে তারা মাহরূম হচ্ছে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, এদের অধিকাংশ কিছু আরবী সাহিত্য শিখে দুনিয়া প্রেমী হয়ে উঠছে, আরবী বলতে পড়ার জোরে বিদেশ চলে যাচ্ছে। আর ইলমের গভীরতা না থাকায় বিদেশে গিয়ে বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী হয়ে যাচ্ছে।

দুই. বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়াকে লক্ষ্য বানানোঃ

ছাত্ররা সম্পূর্ণ কিতাব হল করার পর যদি মেধা তালিকায় স্থান পায় এবং এর কারণে তাদের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি না হয়, তাহলে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়াতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ার দ্বারা মাদরাসার সুনাম হওয়া, কালেকশন বৃদ্ধি পাওয়া, এজাতীয় পার্থিব ফায়দাকে সামনে রেখে কোনো মাদরাসা কর্তৃপক্ষ যদি মেধা তালিকায় স্থান পাওয়াকেই উদ্দেশ্য বানায়, তাহলে এতে একদিক থেকে তাদের রিয়া করার গুনাহ হবে, দ্বিতীয়ত ছাত্ররা সম্পূর্ণ কিতাব না পড়ে নোট বা গাইডের আশ্রয় নিয়ে শুধু পরীক্ষায় আসার মতো স্থানগুলি পড়বে, সম্পূর্ণ কিতাব পড়বে না। ফলে তারা কিতাব বোঝার যোগ্যতা থেকে মাহরূম হবে। যার পরিণামে শিক্ষকতার জীবনে সে অকৃতকার্য হয়। ছাত্ররা তার থেকে কিতাব বুঝতে পারে না, সেও বুঝাতে পারে না। একপর্যায়ে শিক্ষকতার দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে সে ইমামতি বা অন্য কোনো দুনিয়াবী পেশা গ্রহণ করে। এভাবে চিরতরে ইলমের খিদমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

তিন. সুন্নাত মুতাবেক আমলের ব্যাপারে দ্বীনী মাদরাসার ছাত্রদের নেগরানী না হওয়াঃ

এই সমস্যা বর্তমানে অনেক মাদরাসায় দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। এটাও ইলম উঠে যাওয়ার অন্যতম কারণ। কেননা সুন্নাত মুতাবেক আমল ছাড়া ইলম টিকে থাকতে পারে না। তাই আমলের নেগরানী না হলে ছাত্রদের অন্তরে ইলম টিকবে না। বে-আমল আলেম ও তালেবে ইলম দ্বারা কুরআন সুন্নাহ এর ইলম ধরে রাখা সম্ভব নয়। কারণ হাদীসেপাকে আলেমের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, তারা নিজের ইলম অনুযায়ী আমল করে। (মেশকাত হা.নং ২৬৬)

সুতরাং যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে না তাদের কিতাবী ইলম যত বেশি হোকনা কেন শরীয়ত তাদেরকে আলেম বলে স্বীকৃতি দেয় না। বিধর্মীদের কাছে আমাদের চেয়ে বেশি কিতাব ও মা'লূমাত আছে। কিন্তু তা স্বত্বেও তারা আলেম নয়। অতএব বুঝা গেল, শুধু মা'লূমাত আলেম হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং আলেম হওয়ার জন্য মা'লূমাত অনুযায়ী আমল করা জরুরী। (তথ্যসূত্রঃ মাসিক আল আবরার, অক্টোবর ২০১২)

চার. ছাত্র রাজনীতিঃ

ছাত্ররা যখন রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে, তখন ইলম অর্জনের জন্য ছাত্রদের মাঝে যে অধ্যবসায় ও একাগ্রতা থাকার প্রয়োজন তা আর থাকে না। ফলে তা'লীম ও তারবিয়াত এর মধ্যে ভাটা পড়ে। যার দরুন স্বাভাবিকভাবেই ছাত্রদের ইস্তি'দাদ দুর্বল হয়ে যায়। বর্তমানে ইলম উঠে যাওয়ার বড় একটি কারণ হলো, ছাত্রদের রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া। প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িত ছাত্রদের ইলমী ইনহিতাত হচ্ছে, এছাড়া তারা অহংকার, যশ-খ্যাতি ও এজাতীয় আত্মিক মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। যশ ও খ্যাতি অর্জনের পিছনে পড়ে অনেকে ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম হচ্ছে। তাই যারা ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে জড়াচ্ছেন তারা যেন ভেবে দেখেন যে, রাজনীতিতে ছাত্রদেরকে জড়ানোর কারণে ছাত্রদের ইলমী ও আমলী ইনহিতাত হচ্ছে কিনা? যদি হয় তাহলে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা তাদের দায়িত্ব। অন্যথায় ইলম উঠে যাওয়ার জন্য তারা দায়ী হবেন। বর্তমানে যারা ইলমী ময়দানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তারা যদি ছাত্র যামানায় রাজনীতি করতেন, তাহলে বর্তমানে তারা ইলমী ময়দানে নেতৃত্ব দিতে পারতেন না। আমরা যদি আমাদের ছাত্রদেরকে রাজনীতিতে জড়াই, তাহলে এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না যে, আমরা আমাদের ছাত্রদেরকে যোগ্য আলেম হতে দিতে চাচ্ছি না?

হ্যাঁ, ইসলামী রাজনীতির প্রয়োজন আমি অস্বীকার করি না। ইসলামী রাজনৈতিক দলের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। কোনো আলেম রাজনীতি করতে চাইলে তার জন্য আমাদের আকাবিরদের পথ অনুসরণ করা উচিত। শাইখুল হিন্দ মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ. যখন পূর্ণাঙ্গরূপে ইংরেজ খেদাও আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ইস্তিফা নিয়েছিলেন। এমনিভাবে মুফতী শফী রহ. এবং আল্লামা শাব্বীর আহমাদ উসমানী রহ. যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁরাও দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ইস্তিফা নিয়ে ছিলেন। অতএব আমরাও যারা রাজনীতি করতে চাই তারা মাদরাসা থেকে ইস্তিফা নিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে রাজনীতি করবো। তাহলে আমরা ছাত্রদেরকে ইলম থেকে মাহরূম করার কারণ হবো না। আর ইলম উঠে যাওয়ার জন্য দায়ী হবো না।

পাঁচ. সরকারী স্বীকৃতিঃ

হারদুঈ হযরতের খলীফা মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব রহ. বর্ণনা করেন, বাংলাদেশে কওমী মাদরাসার সরকারী স্বীকৃতির চেষ্টা-তদবীরের কথা শুনে হযরতওয়ালা হারদুঈ ইরশাদ করেনঃ 'এটার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, সব কওমী মাদরাসা সরকারী হয়ে যাবে। এতে ছাত্রদের চরিত্রও নষ্ট হয়ে যাবে। কাজেই এই স্বীকৃতি কোনো অবস্থাতেই সমীচীন মনে হচ্ছে না।' (মালফূযাতে মুজাদ্দিদে দ্বীন পৃ.২২) মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব রহ. আরো বলেন, আমি একবার আসআদ মাদানী রহ. কে বাংলাদেশে কওমী মাদরাসার সনদের স্বীকৃতি আদায়ের আন্দোলন সম্পর্কে অবগত করলে তিনি বললেন, 'ভারত সরকার আমাদেরকে স্বীকৃতি নেওয়ার জন্য ডাকছে, কিন্তু আমরা তাদেরকে বলে দিয়েছি, আপনারা আমাদেরকে আমাদের অবস্থায় থাকতে দিন, আমাদের স্বীকৃতির কোনো প্রয়োজন নেই।'

উপরোক্ত দুই বুযুর্গ যথার্থই বলেছেন। বাস্তবেই কওমী মাদরাসা যদি সরকারী স্বীকৃতি পেয়ে যায় তাহলে কওমী মাদরাসা আলিয়া মাদরাসায় পরিণত হতে বেশি সময় লাগবে না। ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে এমন সময় আসবে, যখন কওমী মাদরাসা থেকে দ্বীনের তাকাযা পুরা করনেওয়ালা, দাওয়াত, তা'লীম ও তাযকিয়ার রাস্তায় কাজ করনেওয়ালা কোনো আলেম তৈরি হবে না। যেমনটি এখন আলিয়া মাদরাসায় হচ্ছে। তাই যারা সনদের স্বীকৃতির ব্যাপারে আগ্রহী তাদের কাছে আকুল আবেদন, আপনারা দ্বীনের স্বার্থকে সামনে রেখে বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করুন। এই দেশ থেকে ইলম উঠে যাওয়ার কারণ যেন আমরা কেউ না হই সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন।

ছয়. ছাত্রদের মোবাইল ফোন ব্যবহারঃ

বর্তমানে ইলম উঠে যাওয়ার একটি প্রধান কারণ হলো, ছাত্রদের মোবাইল ফোন ব্যবহার করা। প্রত্যেক কওমী মাদরাসায়ই মোবাইল ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকে, কিন্তু বাস্তবে ছাত্ররা এই নিষেধাজ্ঞা মানে না। লুকিয়ে-ছাপিয়ে যেভাবেই হোক তারা মোবাইল ব্যবহার করে। অথচ মোবাইল ব্যবহারের অর্থই হলো, গুনাহের সমস্ত আসবাব নিজের হাতের মুঠোয় রাখা। হাতের মুঠোয় গুনাহের আসবাব প্রস্তুত রেখে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন ব্যাপার। যারা গুনাহের সাথে জড়িত থাকে, তারা প্রকৃত ইলম কখনোই পেতে পারে না। ছাত্র ভাইয়েরা! তোমরা যদি প্রকৃত আলেম হতে চাও, দ্বীনের সৈনিক হতে চাও, তাহলে ছাত্র যামানায় মোবাইল ব্যবহার করো না। আল্লাহ তা'আলা তাওফিক দান করুন। আমীন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ও আমাদের ছাত্রদেরকে মুত্তাকী, পরহেযগার ও সুগভীর ইলমওয়ালা আলেম হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের দেশের সকল কওমী মাদরাসাকে সহীহ দ্বীনী তা'লীমের মারকায হিসেবে কিয়ামত পর্যন্ত কায়েম রাখুন। আমাদেরকে ইলম উঠে যাওয়ার কারণসমূহ খতিয়ে দেখে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণের তাওফিক দান করুন। আমীন। ছুম্মা আমীন।

দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য

শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার মাধ্যমে হযরত আদম আ. ফেরেশতাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার রবকে চিনতে পারে, ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা এবং হক-বাতিলের মাঝে পার্থক্য করতে পারে। উন্নতি-অগ্রতি এবং উভয় জাহানের শান্তি-সফলতা ও কামিয়াবীর সোপানে আরোহণ করতে পারে । শিক্ষার গুরুত্ব বুঝানোর জন্য মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ "দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।" (সুনানে ইবনে মাজাহ হাদীস নং ২২৪)

আমাদের দেশের অনেক বিজ্ঞজন (?) এই হাদীসে উল্লেখিত ইলম বা বিদ্যা দ্বারা ব্রিটিশ সিলেবাস তথা দুনিয়াবী শিক্ষা উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, যা স্পষ্টই ভুল। কারণ যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ নিজের রবকে চিনতে পারে না , যে শিক্ষার দ্বারা মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হতে পারে না, যে শিক্ষা গুনাহ থেকে বাঁচতে শিখায় না তাকে ইলম বলে না। দুনিয়াবী শিক্ষা তো দূরের কথা, দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরও কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে না থাকে, নিজেকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়তে না পারে, তাহলে তার শিক্ষাকেও শরীয়াতের দৃষ্টিতে ইলম বলা হবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে বলেছেনঃ 'নিশ্চয় আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে' (সূরা ফাতিরঃ২৮)। এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, প্রকৃত আলেম তথা শিক্ষিত তারাই যারা আল্লাহকে ভয় করে। অতএব, ইলম তথা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি হতে হবে খোদা ভীতির উপর আর দ্বীনী শিক্ষার ভিত্তিও হলো খোদা ভীতির উপর। তাই হাদীসে বর্ণিত ইলম দ্বারা যে খালেস দ্বীনী শিক্ষা উদ্দেশ্য তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে তাহলে দুনিয়াবী বিদ্যা হাসিল করা কি জায়িয নেই? এর উত্তর হলো: ফরয পরিমাণ ইলম অর্জনের পরে কেউ যদি দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে, চাই দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ হাসিলের জন্য করুক বা দ্বীনের খেদমতের নিয়তে করুক, তাতে কোনো সমস্যা নেই; বরং শরীয়ত মোতাবেক চলে দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে যদি কেউ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করে তাহলে তাতে সে সাওয়াবেরও আশা করতে পারে। কারণ হাদীসে এসেছে 'কর্মের ফলাফল নিয়তের উপর নির্ভর করে' (বুখারী হা.নং ১)

কিন্তু বাস্তব কথা হলো,স্কুল-কলেজে ফরয পরিমাণ ইলম শিক্ষা দেয়া হয় না এবং সেখানে শরীয়ত মোতাবেক চলতে উৎসাহিত করা হয় না; বরং সেখানে এমন অনেক মতবাদ শিক্ষা দেয়া হয় যা ঈমানের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ এবং অনেক স্কুলের পরিবেশই এমন যে, কেউ চাইলেও শরীয়ত মোতাবেক চলতে পারে না। এমতাবস্থায় দুনিয়ার ৬০-৭০ বছরের যিন্দেগীর কল্পিত সুখ-শান্তির আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে নৈতিকতা বিবর্জিত দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে নাকি

পরকালের অশেষ-অসীম যিন্দেগীর সুখ-শান্তি অর্জনের আশায় নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করা উচিত হবে ? এর ফয়সালার ভার সুবিবেচকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হলো।

আজকাল লাখো মানুষ দ্বীনের সঠিক বুঝ না থাকার কারণে নিজের বুঝকে সঠিক মনে করে নিজের প্রাণপ্রিয় সন্তানকে দু- চার পয়সার লোভে কিংবা দুনিয়াবী সম্মানের আশায় দ্বীনী ইলম শিক্ষা না দিয়ে দুনিয়াবী শিক্ষা নামের ব্রিটিশদের তৈরি করা শিক্ষা কারিকুলাম পড়াচ্ছে।

আবার কেউ কেউ তো দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপারে নিম্নোক্ত মন্তব্য করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

১. '(কওমী) মাদরাসার বিদ্যা ফকীরি বিদ্যা' (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ কুরআন-হাদীসের ইলমের ব্যাপারে এমন মন্তব্য করার কারণে ঐ লোকের ঈমান ধ্বংস হওয়ার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে।

২. 'মাদরাসায় লেখা-পড়া করলে না খেয়ে মরবে'। অথচ দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত কোনো লোক না খেয়ে মরেছে এর কোন প্রমাণ বা উদাহরণ তারা দেখাতে পারে না এবং পারবেও না ইনশাআল্লাহ। কারণ আল্লাহ তা'আলা তার প্রিয় বান্দাদেরকে না খাইয়ে মারবেন না।

৩. কিছু দ্বীনদার (?) লোক মনে করে সন্তানকে (কওমী) মাদরাসায় পড়ানোর দরকার নেই। স্কুল-কলেজে পড়াবো। তারপর সন্তান বড় হলে তাকে দ্বীনের রাস্তায় মেহনত করার সুযোগ করে দিয়ে দ্বীনদার বানিয়ে নিব। অথচ স্কুলে পড়ে সে বদ্দীন হবেনা তার গ্যারান্টি কে দিবে? অথবা দ্বীনদার হওয়ার সুযোগ পাওয়ার আগেই সে মারা গেলে তার পরিণতি কী হবে? তা মোটেও ভেবে দেখে না।

মানুষ যাতে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার পার্থক্য বুঝতে পেরে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে, তাই নিম্নে দ্বীনী শিক্ষা ও দুনিয়াবী শিক্ষার মধ্যে বাস্তব কিছু পার্থক্য তুলে ধরা হলো:

১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর মহামানব তথা নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ অর্থাৎ তারা 'নায়েবে নবী'। কেননা নবী-রাসূলগণ শুধু ইলমের ওয়ারিশ বানান, অর্থ-কড়ির নয়। আর এরাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিখে, টাকা-পয়সার জন্য নয়। (মাজমাউয যাওয়েদ হা.নং ৫২৩)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ঐ শিক্ষার সিলেবাস যারা তৈরি করেছে তাদের ওয়ারিশ। নবী-রাসূলগণের ওয়ারিশ নয়, কেননা তারা শিক্ষা অর্জনই করে টাকা-পয়সা কিংবা কোনো পদ হাসিলের জন্য।

২. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে নবীগণের বাস্তব ওয়ারিশ বানানোর জন্য তাদেরকে ঈমান, আমল, দাওয়াত, তা'লীম, তাযকিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে কীভাবে দুনিয়া উপার্জন করা যাবে তা শিক্ষা দেওয়া হয়। ঈমান-আমল সেখানে গুরুত্বহীন বিষয়।

৩. যারা দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয় তাদের সম্মানার্থে ফেরেশতারা নিজেদের নূরের পাখা বিছিয়ে দেয়। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার ছাত্রদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের পাখা বিছানোর কোনো হাদীস নেই।

৪. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যেহেতু ইবাদত-বন্দেগী করে থাকে, তাই তাদের দ্বারাই আল্লাহ তা'আলার দুনিয়াতে মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে মানুষ পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্য। (সূরা যারিয়াতঃ ৫৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ায় মানুষ পাঠানোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না। কারণ তারা সাধারণত আল্লাহর নির্দেশ মতো চলে না। তবে হ্যাঁ, কেউ যদি উলামায়ে কেরামের সুহবতে আসে বা দাওয়াতের কাজে জুড়ে থাকে সেটা ভিন্ন কথা।

৫. খালেস দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কেউ বেকার থাকে না। তাদের কারণে দেশের বেকারত্ব বাড়ে না; বরং তারা একদিকে নিজ দেশে দ্বীনের খেদমত করছেন অন্য দিকে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইমাম, মুয়াযযিন, মাদরাসার শিক্ষক হয়ে কিংবা অন্য কোন খেদমত করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছেন, যার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকেই বেকার থাকছে। কারণ দুনিয়াবী শিক্ষাটা হলো 'কর্মমুখী শিক্ষা' অর্থাৎ এ শিক্ষায় শিক্ষিতরা দুনিয়ার বিভিন্ন কর্ম করতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে কর্মের সুযোগ কম থাকায় আর কর্মের প্রার্থী বেশি হওয়ায় অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারীরাও বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে। শেষ অবধি বেকারত্বের কারণে কেউ অর্থ উপার্জনের অনৈতিক পথ বেছে নিচ্ছে, আবার কেউবা ছিনতাই রাহাজানির মতো ভয়ংকর পথ বেছে নিতে দ্বিধা করছে না।

৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষাকেন্দ্র কওমী মাদারেসে দ্বীনী শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ বাংলা, অংক, ইংরেজী ইত্যাদি শিক্ষা দেয়া হয়। আর এখানে সরকারের কোন অনুদান নেয়া হয় না। যার কারণে সরকার নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক এখানকার সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে না।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজে প্রয়োজন পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষা দেওয়া হয় না। আর স্কুল-কলেজ সরকারী হওয়ায় বা এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সরকারের অনুদান গ্রহণ

করায় সরকার চাইলেই নিজের খেয়াল-খুশি মোতাবেক সিলেবাস পরিবর্তন করতে পারে। আর এতে যে কী পরিমাণ ক্ষতি হয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

৭. কওমী মাদারেসে ফরযে আইন এবং ফরযে কেফায়া উভয় প্রকারের ইলম শিক্ষা দেয়া হয়, যার দ্বারা এখানকার শিক্ষার্থীরা নিজেকে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতা থেকে বাঁচাতে পারে আবার সাধারণ মানুষকেও সিরাতে মুস্তাকীম এর উপর পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষা কেন্দ্র স্কুল-কলেজে ইলমের কিছু তো নেই-ই; বরং তাদের সিলেবাসে ঈমান বিধ্বংসী অনেক মতবাদ রয়েছে। যার একটি মানাই ঈমান ধ্বংস হওয়ার জন্য যথেষ্ট। যেমনঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে বাংলাদেশের মূল সমস্যা বলে আখ্যায়িত করা।

৮ দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত অর্থে মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদেরকে পিতা-মাতা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, গুরুজন, প্রতিবেশী এমনকি প্রাণীর হকও শিক্ষা দেওয়া হয়। যার ফলে তারা প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে উঠে।

পক্ষান্তরেঃ স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদেরকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয় না। পত্রিকা খুললেই স্কুল, কলেজ ও ভার্সিটির ছাত্রদের কীর্তি (?) দেখে চোখ ধাঁদিয়ে যায়। আজকাল তো তারা বিশেষভাবে শিক্ষকদের পিটাতে বেশ দক্ষতা অর্জন করেছে। তাছাড়া ওখানকার ছাত্ররাই তো পথে-ঘাটে ইভ-টিজিং করে বেড়াচ্ছে ।

৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়ানোর যোগ্যতাও অর্জন করে এবং কেবল তারাই সহীহভাবে পিতা-মাতার রূহে সাওয়াব রেসানী করতে পারে ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত কোন লোকেরই এই যোগ্যতা নেই যে, সে ঐ বিদ্যা দিয়ে পিতা-মাতার জানাযা নামায পড়াবে বা তাদের রূহে সাওয়াব রেসানী করবে কিংবা তাদের মৃত্যুর পরের হকগুলো আদায় করবে।

১০. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা নিজ পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও কিয়ামত পর্যন্ত আলেম তথা নেক সন্তানের নেক আমলের সওয়াব পেতে থাকবে। (তিরমিযী হা.নং ১৩৭৬)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই নিজ পিতা-মাতার জন্য গুনাহে জারিয়া স্বরূপ। অর্থাৎ পিতা-মাতা মৃত্যুর পরও তাদের বদ আমলের ভাগীদার হতে থাকে। কারণ তারা তাদেরকে কোনো নেক আমল শিক্ষা দেয়নি এবং জীবিত অবস্থায় তাদেরকে গুনাহের কাজ করতে নিষেধ করেনি।

১১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার মানুষকে জাহান্নাম থেকে বাঁচার পথ দেখায় এবং জান্নাতের রাহবারী করে। এজন্যই তারা বিভিন্ন মাদরাসা-মসজিদে, মাঠে-ময়দানে কুরআন-হাদীসের কথা জনসাধারণকে শুনিয়ে থাকে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত অনেকেই মানুষকে জাহান্নামের পথ দেখায়। যেমনঃ তারা নাটক, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি করে তা দেখার জন্য মানুষকে প্রেক্ষাগৃহে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। অনেকে লেখনীর মাধ্যমে নাস্তিক্যবাদ প্রচার করে। তাছাড়া আরো অগণিত উদাহরণ আপনি ভাবলেই পেয়ে যাবেন।

১২. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা যখন শিক্ষা অর্জনের জন্য বসে তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আল্লাহর রহমত তাদেরকে আচ্ছাদিত করে নেয় এবং তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। (জামিউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৪৫)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে এ ধরণের কোনো ফযিলত নেই; বরং তারা তো শিখতে বসে ক্লাস রুমেও অনেক গুনাহের কাজ করে। যেমনঃ ছেলেদের মেয়েদেরকে দেখা, মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করা।

১৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা ইসলাম ধর্ম টিকিয়ে রাখছে। কারণ ইলম শিক্ষার ধারা বন্ধ হয়ে গেলে ধীরে-ধীরে পৃথিবী থেকে ইসলাম উঠে যাবে। আর সাধারণ মানুষ যে যতটুকুই দ্বীন পালন করছে বা দ্বীনের চর্চা করছে তা এদের উসিলায় করছে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণ করে এবং তাদের অর্থে পরিচালিত এনজিওগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা করে ইসলাম ধর্মের অস্তিত্ব মিটিয়ে দিতে সাহায্য করছে। বাংলাদেশে দিন দিন খৃষ্টানদের সংখ্যা বেড়ে চলাই এর প্রমাণ বহন করে। সামান্য অর্থের লোভে বাংলাদেশী ছেলে-মেয়েরাই তো এসব এনজিওতে কাজ করছে।

১৪. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের শেষ পরিণাম কল্যাণকর হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকেই দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করেন। (জামেউ বয়ানিল ইলম হা.নং ৮০.)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের শেষ পরিণাম অজানা; বরং বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তাদের শেষ পরিণাম সুখকর হবে না। যারা আল্লাহর হুকুম মানবে না তাদের শেষ পরিণতি খারাব হওয়াই স্বাভাবিক।

১৫. হাদীসের ভাষ্য মোতাবেক 'দুনিয়ার গোটা সৃষ্টিজগত দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীর জন্য দু'আ করে'। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এ দু'আ থেকে বঞ্চিত থাকে।

১৬. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর বন্ধু। কারণ তারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক জীবন যাপন করে। আর তারা শয়তানের শত্রু কারণ তারা শয়তানের বিরুদ্ধাচরণ করে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যদি কোনোভাবে দ্বীন না শিখে, চাই উলামায়ে কেরামের সুহবতে এসে হোক কিংবা অন্য কোনোভাবে হোক, তাহলে এর বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল। কারণ তখন তারা না জানার কারণে বা আত্মার পরিশুদ্ধি অর্জন না করার কারণে স্বাভাবিকভাবেই শয়তানের পথে পরিচালিত হবে।

১৭. প্রকৃত দ্বীনী শিক্ষার প্রকৃত শিক্ষার্থীরা মুসলমানদের সর্বক্ষেত্রে ইমাম হওয়ার (নেতৃত্ব দেয়ার) যোগ্যতা রাখে।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মুসলমানদের প্রতি দিনের আমল পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের ইমামতীটুকু করার যোগ্যতা রাখে না।

১৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা দুনিয়ার অর্থের লোভে নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা এক দুই টাকার লোভেও নিজের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হতে কুণ্ঠা বোধ করে না। দুর্নীতিতে বাংলাদেশের বারবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান হওয়াই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৯. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহ তা'আলার নির্বাচিত বান্দা (সৈনিক)। এদের মাধ্যমে তিনি নিজ দ্বীনের হেফাজত করছেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা ইংরেজদের মানস সন্তান। কারণ তারা তাদের চিন্তা-চেতনাই লালন করে।

২০. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী, হক্কানী আলেম-উলামা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। কারণ গোমরাহীর অন্ধকারে মানুষ তাদের মাধ্যমে সুপথ পেয়ে থাকে। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ হা.নং ৪৮৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের কোনো ফযিলত নেই; বরং তাদের কারো কারো মাধ্যমে পৃথিবী গোমরাহীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দ্বীনদার হলে সেটা ভিন্ন কথা।

২১. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের উসিলায় আল্লাহ তা'আলা সারা দুনিয়ার মানুষকে রিযিক দিচ্ছেন, খাওয়াচ্ছেন এবং পরাচ্ছেন। (তাহযীবে তারীখে দামেস্ক ৫/ ৪৩৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্য থেকে অনেকের ভয়ানক গুনাহের কারণে দুনিয়ার মানুষকে আযাবে এবং দুর্ভিক্ষে পড়তে হয়।

২২. খালেস দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা (কওমী মাদরাসার ছাত্ররা) ইসলামের ইউনিফর্ম পরে থাকে। যেকেউ তাদেরকে দেখলেই খাঁটি মুসলিম মনে করতে বাধ্য হয়।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা বিধর্মীদের ইউনিফর্ম পরে থাকে। ফলে সে মুসলিম না কাফের বাহ্যিকভাবে তা বুঝার কোনো উপায় থাকে না।

২৩. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর 'হায়াত'। যত দিন তারা দ্বীন চর্চায় লিপ্ত থাকবে ততদিন আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে বহাল রাখবেন। কিয়ামাত ঘটাবেন না। (মুসলিম হা.নং ১৪৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতরা যত বড় ডিগ্রিধারীই হোক না কেন, তাদের কারণে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াকে টিকিয়ে রাখবেন না; বরং দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা যত বাড়বে পৃথিবী ততই কিয়ামাতের দিকে এগিয়ে যাবে।

২৪. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতরা মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে থাকেন, অবসর গ্রহণ করেন না।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অনেকে তো চাকুরিই পায় না। আর পেলেও ৩০-৩৫ বছর পর অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

২৫. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদেরকে হাশরের ময়দানে প্রচন্ড রোদের মাঝে যখন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, তখন তাদেরকে আরশের ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া হবে। (তিরমিযী হা.নং ২৩৯১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের জন্য এ ধরনের কোনো ওয়াদা বা আশ্বাস কুরআন-হাদীসের কোথাও বর্ণিত হয়নি; বরং তারা সংশোধন না হলে, হাশরের ময়দানে তাদেরকে ভয়ানক অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

২৬. দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিতদের লকব বা সনদ চিরস্থায়ী। বেহেশতে প্রবেশ করেও তারা এ উপাধিতে ভূষিত হবেন।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিতদের সনদ একেবারেই ক্ষণস্থায়ী। অবসর গ্রহণের পরই তাদের সনদ অনেকাংশে অকেজো হয়ে পড়ে। আর মরার পর কবরে ও হাশরে এ সনদের কোনো মূল্যায়নই হবে না।

২৭. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য তাদের পিতা-মাতা বা অন্য যে কেউ যত টাকা খরচ করে তাতে সে বে-হিসাব সাওয়াব পায়। (সহীহ ইবনে হিব্বান হা.নং ৪৬২৯)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য টাকা খরচ করলে সাওয়াব হবে এমন কোনো কথা কুরআন-হাদীসে নেই; বরং অনেক ক্ষেত্রে তাদের পিছনে টাকা ব্যয় করলে গুনাহ হয়। যেমনঃ অভিনয়, নাচ-গান, প্রাণীর ছবি আঁকা ইত্যাদি শিখার ক্ষেত্রে যে টাকা ব্যয় করা হয় তাতে গুনাহ হয়।

২৮. দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থী যদি ইলম শিক্ষা করা অবস্থায় ইন্তেকাল করে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করে। (আবূ দাঊদ হা.নং ৩৬৪১)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থী শিক্ষাকালীন অবস্থায় মারা গেলে এ মর্যাদা পাবে না; বরং গুনাহের কোনো কিছু শিক্ষারত অবস্থায় মারা গেলে খারাব পরিণতির আশংকাই প্রবল।

২৯. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা মহান আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সদস্য। সুতরাং পরকালে তাদের বিশেষ পাওয়ার থাকবে । (মুসনাদে আহমাদ ৩/১২৮)

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আল্লাহর পরিবারের সদস্য হওয়া তো দূরের কথা তারা অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহর শত্রুসাব্যস্ত হয়ে যায়।

৩০. সর্বোপরি দ্বীনী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের মাঝে খোদাভিরুতা, নম্রতা, ভদ্রতা, এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতার গুণ থাকার কারণে তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং বিভিন্ন ফেতনায় জর্জরিত সমাজকে জাহিলিয়াতের অতল গহবর থেকে উঠিয়ে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত করতে পারে। আদর্শ, সুশীল সমাজ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। যা দেশ ও জাতির জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ।

পক্ষান্তরেঃ দুনিয়াবী শিক্ষার শিক্ষার্থীদের দ্বারা অসামাজিক কার্য-কলাপ। যেমনঃ হত্যা, লুণ্ঠন, রাহাযানী, ধর্ষণ, ইভ-টিজিং, গাড়ী ভাংচুর, মারা-মারি, কাটা-কাটি, নেশা-মদ্যপান ইত্যাদি জঘন্য কর্মকান্ড সংঘটিত হওয়ার কারণে আদর্শ সমাজও বর্বর যুগের অসভ্য সমাজে পরিণত হতে বাধ্য। আজ নৈতিকতা বিবর্জিত, ধর্মহীন শিক্ষার কারণেই দেশজুড়ে অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তারপরও কি আমরা সন্তানদেরকে দুনিয়াবী শিক্ষায় শিক্ষিত করার দুঃসাহস দেখাতে পারি!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য কল্যাণকর শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার এবং নিজ অধীনস্থদের উক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার তাওফিক দান করুন। আমীন ।

মেয়েদেরকে স্কুল-কলেজে পড়ানোর বিধান

(হযরত মুফতী রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ.সমর্থিত একটি ফাতাওয়া)

প্রশ্নঃ ১. এই ফেতনা-ফাসাদের যুগে মেয়েদেরকে পড়া-লেখা শিখানো (যার ক্ষতিকর দিকগুলো বিজ্ঞজনদের নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট) মাকরূহে তাহরীমী হবে কি?

উত্তরঃ বর্তমান যুগে মেয়েদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করা কয়েকটি কারণে মাকরূহে তাহরীমী। কারণগুলি নিম্নরূপঃ

১. এটা সময় নষ্ট করার নামান্তর, কেননা, তার এই পড়া লেখায় না কোন পরকালীন কল্যাণ নিহিত আছে, না কোন পার্থিব কল্যাণ। মেয়েরা সাধারণত অর্থ উপার্জনের জন্য শিক্ষা অর্জন করে থাকে, অথচ শরীয়তে এর কোনোই প্রয়োজনীয়তা নেই। কেননা, তার খরচ তথা ভরণ-পোষণ ইত্যাদি তার স্বামীর দায়িত্বে, এতদসত্ত্বেও তার পড়া-লেখায় লিপ্ত হওয়াটা সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কী হতে পারে?

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন "ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো অহেতুক বিষয়াদি পরিহার করা"। (তিরমীযী শরীফ হা. ২৩১৭)

যেহেতু নারীদের জন্য এই শিক্ষা অহেতুক বিষয়, তাই হাদীসের ভাষ্যমতে একজন মুসলিম রমণী হিসাবে তার জন্য উক্ত শিক্ষা অপরিহার্য।

২. এ শিক্ষার সিলেবাসে এমন গল্প কাহিনী আর কবিতা আছে যেগুলোর মাধ্যমে নারীকে সমঅধিকার, অবাধ বিচরণ, মুক্ত ও স্বাধীন চেতনা এবং অবৈধ প্রেম-ভালবাসায় প্ররোচিত করা হয়, যা পাঠে একজন নারী ইসলাম বিদ্বেষী এবং ধর্মত্যাগী হয়ে উঠে।

তাছাড়া এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নারীরা পাশ্চাত্য বেশ-ভূষা অবলম্বন করে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার মাধ্যমে সমাজকে কুলষিত করে। বহু পুরুষ তাদের কারণে চরিত্রহীন হয়ে পড়ে এবং আপন পরিবার পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৩. নারীরা অতি শিক্ষিতা হয়ে বেগানা পুরুষদের নিকট পত্র প্রেরণ ও চিঠি লেখা-লেখি, ও বিভিন্ন আধুনিক উপায় অবলম্বন করে অবৈধ সম্পর্ক ও প্রেম ভালবাসায় লিপ্ত হয় যার পরিণতিতে তার ইজ্জত আব্রু লুণ্ঠিত হয় এবং পরিশেষে সে লাঞ্ছিতা, ধিক্কৃতা ও পরিত্যক্তা হয়ে যায়।

তবে মেয়েদেরকে অতীব প্রয়োজনীয় দ্বীনী মাসায়েল তথা নামায, রোযা, পবিত্রতা প্রভৃতির বিধি-বিধান শিক্ষা দেওয়া জরুরী। এগুলো শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব তাদের স্বামী, পিতা, ভাইসহ পর্যায়ক্রমে অন্যান্য মাহরাম পুরুষদের উপর বর্তাবে। তারা যদি নিজেরাই উপর্যুক্ত প্রয়োজনীয় দ্বীনী মাসায়েলের উপর যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হয়, তাহলে তারাই শিক্ষা দিবে, অন্যথায় বিজ্ঞ আলেমগণের নিকট থেকে জেনে নিবে।

প্রশ্নঃ সাবালিকা ও প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদেরকে বেগানা বালেগ পুরুষ এর মাধ্যমে পড়া-লেখা ইত্যাদি শিখানোর বিধান কী?

উত্তরঃ প্রথমোক্ত জওয়াব দ্বারা এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেল যে, মেয়েদের জন্য পাশ্চাত্য সিলেবাসে পড়া-শুনায় লিপ্ত হওয়া মাকরূহ, তার উপরে সেটা যদি ঘৃণিত পন্থায় তথা সরাসরি বেগানা পুরুষদের মাধ্যমে হয়, তাহলে তো সেটা কঠিন পর্যায়ের হারাম এবং সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে পাকে ইরশাদ করেন "হে নবী!

আপনি মুমিন পুরুষদিগকে বলুন তারা যেন স্বীয় দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং মুমিন নারীদেরকে বলুন তারা যেন স্বীয় দৃষ্টি অবনত রাখে” (সূরা নূরঃ)

লক্ষ করুন যে, নামাযের জামা‘আতে উপস্থিত হওয়া ইসলামের বড় একটি প্রতীক এবং গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত হওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত ফেতনা ও অনিষ্টের কারণেই মেয়েদের জন্য জামা‘আতে শরীক হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় মহিলাদের জামা‘আতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে যেটা প্রমাণিত আছে, সেটা তাঁর জীবদ্দশার সাথেই সীমিত। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের পরবর্তী সময়ে এটা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। যথা, হযরত আয়িশা রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ “নারীগণ যা (বেহায়াপনা ও অশ্লীলতা) শুরু করেছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি এটা দেখতেন, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে মসজিদে আসা থেকে বারণ করতেন, যেমন নাকি বনী ইসারাঈলের মহিলাদেরকে বারণ করা হয়ে ছিল” (বুখারী শরীফ হাঃ নং ৮৬৯)

এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, জামা‘আতে উপস্থিতি ও দুনিয়াবী পড়া লেখা শিখা দু‘টোর মাঝে আকাশ পাতাল ব্যবধান, তথাপি যখন প্রথমটি নিষিদ্ধ তখন দ্বিতীয়টি আরো কঠিনরূপে নিষিদ্ধ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয় । বিশেষ করে এই ফেতনা ফাসাদের যুগে।

স্কুল-কলেজ ও ইংলিশ মিডিয়াম প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে সিলেবাস পাঠদান করা হয়, তাতে গুনাহ ও নাফরমানী তো বটেই নিজের ঈমান আকীদাহ নিরাপদ রাখাটাই দুরূহ ব্যাপার। কারণ, মেয়েগুলোর তো প্রথমত দ্বীনী বিষয়ে নূন্যতম ধারনাও থাকে না, এমতাবস্থায় যখন তাদেরকে ইয়াহুদী-খৃষ্টান কর্তৃক নির্বাচিত সিলেবাস শিক্ষা দেয়া হয়, তখন অনুরূপ আকীদা বিশ্বাস ও সংস্কৃতি তাদের মনে রেখাপাত করে ও বদ্ধমূল হয়ে যায়। সুতরাং বিবেকবানদের ভেবে দেখা উচিত এর পরিণতি কী হতে পারে?

প্রশ্নঃ হযরত জালালুদ্দীন মুহাক্কেকে দাওয়ানী রহ. এর মতানুযায়ী মেয়েদেরকে হাতের লেখা শিখা থেকে নিবৃত রাখাটা কতটুকু কল্যাণজনক? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তরঃ জালালুদ্দীন মুহাক্কিকে দাওয়ানী রহ. এর যুগে বর্তমান যুগের মতো না কোনও স্কুল কলেজ ছিলো আর না ফেতনা ফাসাদের ছয়লাব ছিলো। তারপরেও তিনি তার যুগে মেয়েদেরকে হাতের লেখা শিখতে বারণ করেছেন। তাহলে বর্তমানের এই ফেতনা ফাসাদের যুগে মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে রাখা কতটা জরুরী হবে!

তথাপি তখনো মেয়েদের জন্য লেখা শিখা শিখানো থেকে নিবৃত থাকাটা কল্যাণজনক ছিল। তো বর্তমানের এই ফেতনা ফাসাদের যুগে সেই নিবৃত থাকাটা জরুরী। আর

মেয়েদের প্রয়োজনীয় দ্বীনী মাসায়েল শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারটি হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে কথা প্রথম জবাব থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে ‘সেটি শুধু জায়েযই নয় বরং জরুরী’ তবে এ ক্ষেত্রে শর্ত এই যে, সেখানে ফেতনার আশঙ্কামুক্ত, সম্পূর্ণ পর্দার সাথে

শরীয়ত সম্মত পন্থায় হতে হবে। (বাকীয়াতে ফাতাওয়া রশীদিয়া, মাসআলা নং- ৯৭৯, পৃষ্ঠা নং-৫৭৩)

প্রশ্নঃ ছেলেদেরকে কী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যেতে পারে? এই জন্য কোন শর্ত আছে কি না?

উত্তরঃ ছেলেরা কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে স্কুলে কলেজে পড়তে পারে।

(ক) দুনিয়াবী শিক্ষা লাভ করতে যেয়ে তাদের কোনো জরুরী আমল নষ্ট না হওয়া, যেমনঃ নামায কাযা করা, সহীহ শুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত থেকে মাহরূম হওয়া, ফরয পরিমাণ ইলম না শিখা ইত্যাদি।

(খ) তাদের নিয়ত থাকবে হালাল রিযিক উপার্জন ও দ্বীনের দাওয়াতের কাজ আঞ্জাম দেয়া।

(গ) এ শিক্ষা লাভ করতে গিয়ে কোনো গুনাহের সাথে জড়িত না হওয়া, যেমনঃ টাখনুর নীচে পাজামা প্যান্ট পরা, টাই লটকানো, দাঁড়ী মুন্ডানো, বিভিন্ন নেশায় জড়িত হওয়া, নভেল নাটকে অভ্যস্ত হওয়া, মেয়েদের সাথে বে-পর্দা দেখা সাক্ষাৎ করা বা তাদের সাথে অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়া, অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করা ইত্যাদি।

(ঘ) ইংরেজী সিলেবাসে যে-সব কুফুরী কথাবার্তা আছে তার থেকে নিজের দ্বীন ও ঈমানকে রক্ষা করার জন্য হক্কানী উলামাদের সুহবতে যাওয়া এবং ছুটির সময় তাবলীগে যাওয়া।

উল্লেখিত কোন শর্ত ভঙ্গ করলে তার জন্য দুনিয়াবী শিক্ষা অর্জন করা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয।

মাদরাসা পরিচালনার নিয়ম কানুন

পৃথিবীতে দ্বীন টিকিয়ে রাখার জন্য মাদরাসা জরুরী। কিন্তু মাদরাসা দ্বারা তখনই দ্বীন রক্ষার খেদমত আশা করা যায়, যখন মাদরাসার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে সহীহ উসূল অনুযায়ী চলবে এবং মাদরাসাকেও সহীহ উসূল অনুযায়ী চালাবে। অন্যথায় না দ্বীনের হেফাযত হবে আর না নিজেদের উন্নতি সাধন হবে বরং সময় আর অর্থ নষ্ট ছাড়া কিছুই হবে না। প্রত্যেকটা মাদরাসা যেন দ্বীন রক্ষার একেকটা কেল্লায় পরিণত হতে পারে তাই নিম্নে মাদরাসার কমিটি, ছাত্র, শিক্ষক ও মুহতামিম এর জন্য দিকনির্দেশনামূলক সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করা হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের উক্ত আলোচনার উপর আমল করার তাওফিক দান করুন!

১. আমরা মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটি হই আর মুহতামিম হই বা সাধারণ শিক্ষক হই, আমাদের নিজেদের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দু'টি কাজ করতে হবে।

ক. কোন হক্কানী বুযুর্গের সুহবত অবলম্বন করতে হবে এবং তার সাথে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম রাখার মাধ্যমে দিলের দশটা রোগ থেকে মুক্ত হওয়া এবং দশটি গুণ অর্জন করার মেহনত করতে হবে।

খ. নিজের ঈমান ও আমলের তরক্কীর জন্য দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনত করতে হবে। কারণ ব্যক্তি যতক্ষণ নিজের উন্নতির ফিকির না করে সে যতই উম্মতের ফিকির করুক তার দ্বারা কোন কাজ হয় না। খুব ভাল করে জানা দরকার,কোন ব্যক্তি নিজের ঈমান আমলের উন্নতির চিন্তা ফিকির না করলে তাকে দিয়ে আল্লাহ ইসলামের কাজ নিবেন না। বস্তুত নিয়ত থাকবে নিজের উন্নতির, এর মধ্য দিয়ে অন্যের উন্নতিও হয়ে যাবে। নিজের ফিকির না করে আগে অন্য লোককে ঠিক করতে গেলে শুরুতেই তার থেকে অহংকার প্রকাশ পায়। আর আল্লাহ তা'আলা অহংকারী থেকে দ্বীনের খেদমত নেন না।

২. আমাদের মাদ্রাসা জীবিত মাদরাসা না মৃত মাদরাসা? মৃত মাদরাসা বলে ঐ মাদরাসাকে যেখানে শিক্ষকদের সকল মেহনত ছাত্রদের মধ্যে সীমিত; বাইরের জনগণের দ্বীনী উন্নতির জন্য তাদের কোন ফিকির ও মেহনত নেই।

একটি মাদরাসা প্রতিষ্ঠা হয় ছাত্রের নামে এবং তা পরিচালিত হয় টাকার মাধ্যমে। ছাত্র এবং অর্থ এই দুই জিনিসতো আসবে জনগণ থেকে। আর জনগণ এগুলো তখনই দিবে যখন তাদের জন্য আমাদের মেহনত থাকবে এবং তাদের মধ্যে দ্বীন থাকবে। আর এটাই মূলনীতি কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হবে। তাদেরকে কিছুই দিব না, শুধুই চাইতে থাকবো, তাহলে কিছুই পাওয়া যাবে না। যে মাদরাসা শুধুই ছাত্রদের পিছনে মেহনত করে, বাইরে কোন মেহনত করে না সেটা হল মৃত মাদরাসা। আর যে মাদরাসা ছাত্রদের উপর মেহনত করার সাথে সাথে বাইরের মানুষের ঈমান-আমল ও কুরআন সহীহ করে দেয়া, জরুরী মাসায়িল শিখানো ইত্যাদির মেহনত করে সেই মাদরাসা হলো জিন্দা মাদরাসা। জনগণের দীনি তরক্কীর জন্য মাদরাসা পরিচালক এবং আসাতিযায়ে কেরাম নিম্নোক্ত উপায়ে মেহনত করতে পারেঃ

আম জনতা ও এলাকাবাসীর উপর দুই লাইনে মেহনত করবেঃ
(ক) তাবলীগের লাইনে ।
(খ) দাওয়াতুল হকের লাইনে।

তাবলীগের দ্বারা ঈমান শিখাবে আর দাওয়াতুল হকের দ্বারা যাবতীয় আমলের মেহনত করবে। যেমনঃ নামায, রোযা, যাকাত, হজ্জ, বিবাহ-শাদী কাফন-দাফন ইত্যাদি সুন্নাত মোতাবেক করার প্রশিক্ষণ দেয়া। তাবলীগের দ্বারা জনগণের ইমান মজবুত হবে এবং তাদের মাঝে আমলের আগ্রহ পয়দা হবে। আর দাওয়াতুল হকের মাধ্যমে তাদের আমল বিশুদ্ধ ও সুন্নাত তরীকায় হবে এবং তারা সহী সুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখবে।

প্রয়োজনে আশপাশের একেক গ্রামকে একেক শিক্ষকের দায়িত্বে দিয়ে দিবে। তারা ঐ গ্রামের মানুষকে তাবলীগে পাঠাবে। আমলী মশকের মাধ্যমে উযু নামায ও যাবতীয় আমলের সুন্নত তরীকা শিখাবে। নূরানী পদ্ধতিতে ২/৩ মাসে চক স্লেটের মাধ্যমে তাদের কুরআন সহী করে দিবে। এভাবে ২/৩ মাস চলার পর তার পার্শ্ববর্তী গ্রামে পর্যায়ক্রমে কাজ করবে।এতে কোন গ্রামের কোন লোক মাদরাসার বিরুদ্ধে থাকবে না; বরং প্রতিটি লোক মাদরাসার পক্ষে এসে যাবে। আর এভাবেই মাদরাসা জিন্দা মাদরাসা হবে। নতুবা মাদরাসা মুর্দা থেকে যাবে।

শুধু শিশু ছাত্রদেরকে পড়ালে হবে না; পাকা দাঁড়ীওয়ালাদেরকেও ছাত্র বানাতে হবে, যাদের কবরে যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। মুহতামীম সাহেব সর্বস্থানে তদারকী করবেন। কোন উস্তাদ কতটুকু কাজ করলেন তার তদারকী করবেন। এবং ঐ সকল গ্রামবাসীর ইন্টারভিউ নিবেন। দায়িত্বশীল উস্তাদগণ স্ব-স্ব এলাকায় গিয়ে আসরের নামায আদায় করবেন এবং মাগরিবের আগ পর্যন্ত উক্ত মেহনত করবেন।

ছাত্রদের উপর দুই লাইনে মেহনত করতে হবে:
(ক) তা'লীম।
(খ) তরবিয়াত।

তা'লীম অর্থ কিতাব পড়ানো আর তরবিয়াত হল কিতাবের ছাপানো লেখাগুলো তার শরীরে ছেপে দেয়া অর্থাৎ তাদের আমলী জীবন গঠন করে দেয়া, বাংলাতে যাকে বলে শিক্ষা-দীক্ষা। এর জন্য উস্তাদদের 'সুহবাত ইয়াফতাহ' হতে হবে এবং ছাত্রদেরকে হক্কানী শাইখের সুহবতে বসার ব্যবস্থা করতে হবে।

মাদরাসার হিসাব যেভাবে রাখবে:
মাদরাসা পরিচালনার ক্ষেত্রে আরেকটি জরুরী বিষয় হলো, মাদরাসার হিসাবটা খুবই মজবুতভাবে রাখবে। যে যেই উদ্দেশ্যে মাদরাসায় দান করবে তার টাকা সেই কাজেই ব্যয় করবে। কোন সময় যাকাত ফান্ডের টাকা যেন সরাসরি বেতন ফান্ডে না আনা হয় বা নির্মাণে খরচ না করা হয়। টাকা খাত ওয়ারী ব্যয় করতে হবে। খরচ যদি গলতভাবে করা হয় তাহলে ঐ মাদরাসার কোন ছাত্র আল্লাহওয়ালা হবে না। কোন মাদরাসায় যদি মাদরাসার সম্পদের ব্যবহার সহীহভাবে না হয় সেখান থেকে সহীহ আলেম পয়দা হয় না।

জেনেশুনে কারো হারাম টাকা নেয়া যাবে না। জানা আছে যে, এক লোকের পূর্ণ মালই হারাম-তাহলে তা নেয়া যাবে না। হ্যাঁ, নিলে সেটা টয়লেটের কাজে লাগাতে হবে। এ টাকা দিয়ে বেতন দিলে বা লিল্লাহ বোডিং এ ব্যয় করলে ছাত্র গড়বে না। আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে খাত ঠিক রাখতে হবে।

তবে লিল্লাহ ফান্ড থেকে অন্য ফান্ডের জন্য সাময়িক করজ নেয়া জায়িয আছে। তবে তা ফেরত দিতে হবে। অথবা সহীহ পদ্ধতিতে শরঈ তামলীক করতে জানলে সেভাবে

করবে। প্রচলিত হিলার আশ্রয় নিবে না, যার দ্বারা মানুষের যাকাত কুরবানী নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের মুরব্বীগণ বলেছেন, মাদরাসা এমন দ্বীনী প্রতিষ্ঠান, যেখানে দু'টি জিনিস যথাযথ সংরক্ষণ করা হয়।

১.মুসলমানদের সন্তানদের সঠিকভাবে তা'লীম তরবিয়াতের মাধ্যমে হিফাযত করা অর্থাৎ ইলম ও আমল শিখানো হয়।

২. মুসলমানদের অনুদান সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে হিফাযত করা। অর্থাৎ মালগুলো সঠিক খাতে খরচ করা এবং প্রত্যেকটি পয়সার হিসাব রাখা। প্রত্যেকটা আয় রশিদের মাধ্যমে হতে হবে, আর প্রত্যেকটি ব্যয় খরচের ভাউচারের মাধ্যমে হতে হবে। রশিদ ব্যতীত কোন টাকা মাদরাসায় জমা নেয়া হবে না। সব টাকা রশিদ দ্বারা মাদরাসায় ঢুকবে আর খরচের ভাউচারের মাধ্যমে মাদরাসা থেকে বের হয়ে যাবে। পাকা খাতা তথা ক্যাশ বুক থাকবে, যেখান থেকে খাতওয়ারি লেজার বুকে যাবে।

হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রহ. বলেছেন, ক্যাশের সাথে তোমরা চারজন লোককে জড়িত কারো যাতে মাদরাসার সম্পদে কোন খেয়ানত না হয়। যার ব্যাখ্যা নিম্নরুপঃ

১. মুহতামিম বা নায়েবে মুহতামিমঃ তাঁর কাজ হল ভাউচার অনুমোদন দেয়া। এভাবে যে, তিনি দেখবেন, এই খরচটা আদৌ প্রয়োজনীয় কিনা বা কত কম টাকায় এটা সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা যায়। এটা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন মুহতামিম বা তার নায়েব।

২. আর কমিটির কাউকে দায়িত্ব দেয়া হবে মাসে বা সপ্তাহে একবার ভাউচারে সই করার জন্য । তাহলে ওটা হবে চূড়ান্ত অনুমোদন।

৩. যিনি ক্যাশিয়ার হবেন, তার কাছে রশিদের মাধ্যমে টাকা জমা হবে আর অনুমোদিত ভাউচারের মাধ্যমে খরচ হবে। রশিদ দেখে-দেখে খাতার মধ্যে টাকা জমার সাইডে জমা করবে। আর যে ভাউচারগুলো অনুমোদন হয়ে এসেছে সেগুলো ডান পাশে খরচের পাতায় লেখবে। খাতার বাম পাশে জমা লিখতে হয়, আর ডান পাশে খরচ। ক্যাশিয়ারের একটা নিজস্ব খাতা থাকবে যাকে বলে জার্নাল বা কাচা খাতা। এটা নিজস্ব হিসাব ঠিক রাখার জন্য, যাতে পকেট থেকে ভর্তুকি দেয়া না লাগে। এই দায়িত্বে যারা থাকবে তাদের খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, খাতায় খরচের কথা না লিখে কাউকে টাকা দিবে না। পরবর্তিতে খাতায় উঠিয়ে নিবো, এই মনে করে কখনো আগে টাকা দিবে না। কেননা, পরে আর মনে নাও থাকতে পারে, তখন ঐ টাকা নিজের পকেট থেকে দেয়া লাগবে।

ক্যাশিয়ার প্রতিদিনের আয়-ব্যয়ের হিসাব লিখে দেখবে যে, আজকে তার হাতে কত আছে। এটাকে বলে ডেইলি ব্যালেন্স। প্রত্যেক দিন ক্যাশ মিলাবে। কারণ যে কোন

সময় মুহতামিম বা কমিটির কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে যে, ক্যাশিয়ার সাহেব! আজকে আপনার ক্যাশ ইন হ্যান্ড অর্থাৎ হাতে কত টাকা আছে? তিনি সাথে সাথে বলবেন যে, আজকে আমার হাতে এত আছে। এভাবে মাঝে মধ্যে খোঁজ খবর নিবে যে ক্যাশ ঠিক মত আছে, না ক্যাশিয়ার সাহেব ওখান থেকে ব্যক্তিগত ব্যয় নির্বাহ করছে।

৪. হিসাব রক্ষকঃ তার কাছে মাদরাসার পাকা খাতা থাকবে এবং লেজারবুক থাকবে , ক্যাশবুকে তো রশিদের মাধ্যমে যত টাকা এসেছে সবই বাম পাশে উঠে গেছে, আর সকল খরচাদি ডান পাশে উঠে এখানে কোন খাত পার্থক্য করা হয়নি। কিন্তু এগুলো যখন লেজারবুকে যাবে তখন জমার সাইড এবং খরচের সাইড উভয়টি খাত ওয়ারী লেজারে উঠবে। প্রত্যেক খাতের জন্য লেজার বুকে কয়েক পৃষ্ঠা বরাদ্দ করা থাকবে এবং পৃষ্ঠা নং সহ সূচিপত্র থাকবে।

ক্যাশিয়ার সাহেব আজকে যত টাকা জমা হয়েছে এবং যত টাকা ভাউচারের মাধ্যমে খরচ হয়েছে সেগুলোর রশিদ বহি ও খরচের ভাউচার আগামীকাল হিসাবরক্ষকের কাছে দিবেন। নিজের পার্সোনাল হিসাবের খাতা তাকে দিবে না। তাকে দেখাবেও না, এটা একেবারেই নিষিদ্ধ।

হিসাব রক্ষক সাহেব নিজে রশিদ দেখে দেখে জমার সাইড লিখবেন আর খরচের ভাউচার দেখে খরচের সাইড লিখবেন। এর পর যোগ-বিয়োগ করে ক্যাশ ইন হ্যান্ড বের করবেন। অতঃপর দু'জনে মতবিনিময় করবেন যে ভাই! আপনার ক্যাশ ইন হ্যান্ড কত? তখন ক্যাশিয়ার বলবেন আমার কাছে আজকে এত আছে। হিসাব রক্ষক বলবেন, আমারও এত আছে, উভয়ের কথা মিলে গেলে ঠিক আছে। আর যদি গড়মিল হয় তাহলে যেকোনো একজন ভুল করেছেন বলে ধরা হবে এবং উভয়ে হিসাব দ্বিতীয় বার ভালো করে মিলাবে ও ভুল ঠিক করে নিবে।

মুহতামিম বা হিসাব রক্ষকের কাছে টাকা থাকবে না। টাকা থাকবে ক্যাশিয়ারের কাছে। মোটকথা, অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে থাকবে দুই জন, ক্যাশে একজন, আর হিসাব রক্ষক হিসাবে একজন, মোট চারজন। এই চারজন লোক যদি হিসাবের কাজে জড়িত থাকে তাহলে মাদরাসার এক টাকাও কোন দিন অবৈধভাবে ব্যবহার হতে পারে না। চারজন একমত হলে টাকা মেরে নেয়া সম্ভব কিন্তু চারজন একমত হওয়া সহজ নয়। একই সাথে চারজন লোক গোমরাহ হবে না। সাধারণভাবে মাদরাসাগুলোতে যে হিসাব রক্ষক থাকে সেই ক্যাশিয়ার হয়, তারা একের ভিতর দুই করে রেখেছে। এটা করার কারণে যত সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

সারাবছর সঠিক উপায়ে হিসেব রেখে বছরের শেষে সরকার অনুমোদিত কোন অডিট ফার্ম দ্বারা হিসাব নিরীক্ষণ করিয়ে নিবে। তাহলে আর কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না।

কেউ টাকা আত্নসাতের অভিযোগ করতে পারবে না। আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুক।

মোটকথা, এভাবে যদি সঠিক নিয়মে মাদরাসা পরিচালনা করে নিজের জন্য, তালিবে এলেমের জন্য এবং এলাকার লোকদের জন্য আমরা মেহনত করি, তাহলে এলাকায় দ্বীন চমকে যাবে। সকল মানুষ দ্বীনদার হয়ে যাবে, মাদরাসার মধ্যে ছাত্র সংকট ও অর্থ সংকট থাকবে না ইনশাআল্লাহ! আল্লাহ আমাদেরকে আমলের তাওফীক দান করুন ! আমীন।

উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিশ্বের শীর্ষ ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসার মুহতামিম
হযরতুল আল্লাম মুফতী আবুল কাসেম নোমানী সাহেব দা.বা. এর ঐতিহাসিক বয়ান
(স্থানঃ মদীনাতুল উলূম মাছনা মাদরাসা, মনিরামপুর, যশোর। সময়ঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী,২০১৩ ঈঃ, শুক্রবার)

قال النبى صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين.

وقال ايضا : ان العلماء ورثة الانبياء....

وقال ايضا : ان الله يبعث لهذه الامة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها...

মুহতারাম উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীন! এখন এখানে যে সম্মেলন হচ্ছে এটা জনসাধারণের সম্মেলন নয়; বরং এটাতো উম্মাতের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তথা উলামায়ে কেরামের সম্মেলন। আর উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব দুই ধরণের।

একটি হলো হযরত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়ারিশ এবং নববী ইলমের ধারক-বাহক হিসেবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ থেকে যৌথভাবে অর্পিত দায়িত্ব ।

অপরটি হলো, নিজ নিজ কর্মস্থলে প্রত্যেকের পদ ও মর্যাদা অনুযায়ী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব। যেমনঃ কেউ মুহতামিম, কেউ প্রধান শিক্ষক, কেউ শাইখুল হাদীস, কেউ সাধারণ শিক্ষক, আবার কেউ ইমাম বা খতীব। আর কেউ ওয়ায়েজ।

এই বৈঠকে আপনাদেরকে ওয়াজ করে শুনানো আমার উদ্দেশ্য নয় যেমনটি করা হয় সাধারণ মানুষের জন্য। আপনারা তো সকলেই জ্ঞানী-গুণী এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। অতএব, বলা যায় আমাদের আজকের এই বৈঠক একটি পর্যালোচনামূলক বৈঠক। আর পর্যালোচনার বিষয় এইঃ বর্তমানে সারা বিশ্বে, বিশেষত আপনারা যে দেশে বসবাস করেন সেখানকার দ্বীনী হালত কোন পর্যায়ের? এবং এ অবস্থায় আমাদের কাছে দ্বীনের চাহিদা ও আবেদন কী?

শিক্ষা-দীক্ষার প্রতিষ্ঠানের দিক থেকে যদিও উলামায়ে কেরামের মাঝে কিছুটা ভিন্নতা আছে। কিন্তু চিন্তা-চেতনা ও আদর্শগতভাবে সকলে এক ও অভিন্ন। কেউ কাসেমী (দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে ফারেগ) কেউ মাজাহেরী (মাজাহেরুল উলূম সাহারানপুর থেকে ফারেগ) কেউ থানভী (হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. এর সিলসিলার কোনো শাইখের সাথে সম্পৃক্ত) কেউ মাদানী (হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত) কেউবা হযরত খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত। মোটকথা তারা সকলে তরবিয়াত ও দীক্ষাগতভাবে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী রহ. এর সাথে সম্পৃক্ত এবং তা'লীম ও শিক্ষাগতভাবে 'দারুল উলূম দেওবন্দ' এর চিন্তা-চেতনার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং এ সম্পর্ক ও বন্ধন আরো মজবুত করা চাই।

আমি আপনাদের সামনে ভূমিকাতে তিনটি হাদীস পাঠ করেছি। সাধারণত কোনো বক্তা বয়ানের শুরুতে যে আয়াত ও হাদীস পড়েন আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি তা শুনেই বুঝতে পারেন যে, বক্তা কী বলতে চান।

আমার ভাইয়েরা! আমার প্রথম কথা হলো, উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও অবস্থান কী? এবং তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য কী? তো এ প্রসঙ্গে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ان العلماء ورثة الانبياء অর্থাৎ আলেমগণ নবীগণ আ. এর ওয়ারিশ।

এখন প্রশ্ন হল, ওয়ারিশ কে হয়? তো দুনিয়ার ব্যাপারে ওয়ারিশ ঐ ব্যক্তি হয় মৃত ব্যক্তির সাথে যার আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকে এবং উত্তরাধিকার সত্ত্ব থেকে বঞ্চিতকারী কোনো কারণ না থাকে। কেননা এমন কোনো কারণ দেখা দিলে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা স্বত্বেও উক্ত ব্যক্তি মীরাছ থেকে বঞ্চিত হয়। মীরাছ পাওয়ার সূত্র হল আত্মীয়তা। কিন্তু শুধু আত্মীয়তা মীরাছ পাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং নিকটাত্মীয় হওয়া জরুরী। যেমনঃ মৃতের ছেলে থাকা অবস্থায় মৃতের ছেলের ছেলে মীরাস পায় না। আর মৃতের আপন ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই মীরাছ পায় না। কারণ নাতীর তুলনায় মৃতের সাথে মৃতের ছেলের এবং বৈমাত্রেয় ভাইয়ের তুলনায় মৃতের সাথে আপন ভাইয়ের আত্মীয়তা অধিক নিকটবর্তী ও বেশি শক্তিশালী । নিকটাত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও মীরাছ থেকে বঞ্চিতকারী কোনো কারণ ঘটা বা পাওয়ার উদাহরণ এই যে, কোনো ছেলে যদি পিতার যাবতীয় সম্পদ একাই দখল কারার জন্য পিতাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে এই ছেলে পিতার সম্পদ থেকে কিছুই পায় না। অথচ নিজ পিতাকে হত্যাকারী এই ছেলেকেও তার ছেলে বলা হয়, তার পুত্রত্বকে অস্বীকার করা হয় না।

মোটকথা, জাগতিক সম্পদে ওয়ারিশ হতে হলে মৃত ব্যাক্তির সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকা ছাড়াও নিকটাত্মীয় হওয়া এবং মীরাছ থেকে বঞ্চিতকারী কোনো কারণ না থাকা আবশ্যক।

আমার ভাইয়েরা! এটাতো দুনিয়াবী সম্পদে ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি ও নীতিমালা। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে নবুওয়াত এর মীরাছ পাওয়ার জন্য আত্মীয়তা বা বংশীয় সম্পর্কের পরিবর্তে নিসবতকে ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়েছে। আর সেই নিসবত বা সম্পর্ক হলো তিন ধরণের।

এক. রূহানী নিসবত বা আত্মিক সম্পর্ক।
দুই. ফিকরী নিসবত বা চিন্তা-চেতনাগত সম্পর্ক।
তিন. আলমী নিসবত বা যে লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছিল সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমের ওয়ারিশ হতে চাইলে, সত্যিকারের আলেম হতে চাইলে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রূহানী, ফিকরী ও আমলী নিসবত থাকা জরুরী। এই নিসবত ছাড়া কেউ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমের ওয়ারিশ হতে পারবে না।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমের ওয়ারিশ হওয়ার ভিত্তি শুধু এতটুকু নয় যে, কেউ একজন দ্বীনী মাদরাসা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করবে, সেখানের নেসাব পড়ে শেষ করবে, বার্ষিক পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করবে, অতঃপর উক্ত মাদরাসা থেকে একটি সনদ লাভ করবে। সনদ তো উক্ত মাদরাসার শিক্ষা সমাপ্ত করার একটি সাক্ষ্য প্রদান মাত্র যা شهادة الفضيلة وشهادة عالمية নামে অবহিত করা হয়। অর্থাৎ মাদরাসা কর্তৃপক্ষ সনদের মাধ্যমে একথার সাক্ষ্য দেয় যে, এই ছাত্রটি মাওলানা হওয়ার বা আলেম হওয়ার নির্ধারিত নেসাব পড়ে শেষ করেছে। সনদের অর্থ এই নয় যে, সে সত্যিকার অর্থে আলেম হয়েছে কিংবা নববী ইলমের ওয়ারিশ হয়েছে।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বলেছেন, ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم ‘নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীগণের আ.ওয়ারিশ। আর নবীগণ আ. কোনো দীনার বা দেরহামের মীরাছ রেখে যাননি, বরং তারা ইলমের মীরাছ রেখে গেছেন’। আর এই ইলমের হুকুম, চাহিদা ও নিয়মনীতি জাগতিক সম্পদে ওয়ারিশ হওয়ার নীতিমালা থেকে ভিন্ন। কেননা বাস্তবে নববী ইলমের ওয়ারিশ হতে গেলে ঐ রূহানী সম্পর্ক জরুরী যাকে নিসবত বলা হয়। আর এই নিসবত অর্জন করা, এই নিসবতের মধ্যে শক্তি পয়দা করা এবং এই নিসবত হেফাজত করা আমাদের যিম্মাদারী। কারণ আলেমগণের ওয়ারিশ হওয়া মূলত নিসবতের উপরই নির্ভরশীল।

নববী ইলমে ওয়ারিশ হওয়া জাগতিক সম্পদে ওয়ারিশ হওয়ার মত নয়। জাগতিক সম্পদে যে ওয়ারিশ হয়, সম্পদ তার হাতে আসলেই সে ঐ সম্পদের মালিক হয়ে

যায়। স্বাভাবিকভাবে সেটা আর তার হাত ছাড়া হয় না। কিন্তু নববী ইলমের ওয়ারিশ হওয়া যেহেতু নিসবত এর উপর নির্ভরশীল, তাই যত দিন নিসবত বা সম্পর্ক ঠিক থাকবে ততো দিন আপনি নববী ইলমের প্রকৃত ওয়ারিশরূপে গণ্য হবেন। আর যখই নিসবতের মধ্যে জংধরে যাবে, নিসবতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে তখনই ইলমে নববীর ওয়ারিশের খাতা থেকে আপনার নাম কেটে যাবে। তাই সারা জীবন এই নিসবত হেফাজত করতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে রূহানী সম্পর্ককে গাঢ় থেকে গাঢ়তর করতে হবে।

এখন আসুন এই নিসবত বা সম্পর্কের হেফাজত কীভাবে হবে তা জেনে নেই। তো যে মহান কাজ ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরায় আগমন করেছিলেন সেই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে নিজের একমাত্র কাজ বানানো। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্খতা ও পাপের অন্ধকারে আচ্ছন্ন এ পৃথিবীতে যেভাবে হেদায়াতের সূর্য হয়ে এসেছিলেন এবং পরিবেশের সকল বিরোধিতা ও শত্রুতা সত্ত্বেও নিজের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য (তথা দাওয়াতী মিশন) থেকে এক কদমও পিছে হটেননি। কাফের বেদ্বীনরা দুনিয়ার বড় বড় প্রলোভন দেখিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল যে, আপনাকে সারা আরবের বাদশা বানানো হবে, আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারী আপনাকে দেওয়া হবে। আরবের গোটা সম্পদ আপনার সামনে জমা করে দেওয়া হবে। তখন নবিজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উত্তরে বলেছিলেন, 'আল্লাহর শপথ, এসকল লোক যদি আমার এক হাতে চাঁদ আর অন্য হাতে সূর্য এনে দেয় তবু আমি আমার দায়িত্ব থেকে সামান্য পিছ পা হবো না।'

আল্লাহর ফজলে আমাদের যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওয়ারিশ হওয়ার মর্যাদা অর্জিত হয়েছে। তাই আমাদেরকেও নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোনো লোভ-লালসা, ভয়-ভীতি, হুমকী-ধমকি যেন আমাদেরকে নিজ দায়িত্ব পালন করা থেকে ফিরিয়ে রাখতে না পারে। যেদিন থেকে আমরা এই ইলমের বাগানে কদম রেখেছি, সেদিন থেকে আমাদের কাঁধে এ দায়িত্ব এসে গেছে। আমাদের জানা হয়ে গেছে যে, এ পথে চলতে হলে বালা-মুসীবত ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়। এপথে আমাদেরকে কেউ জবরদস্তি ও বাধ্য করে আনেনি। আমরা নিজেরাই বুঝে-শুনে এ পথ গ্রহণ করেছি। সুতরাং এখন যত দুঃখ-কষ্ট হোক বালা-মুসীবত আসুক তবুও আমাদেরকে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে শুধু অগ্রসর হতে হবে। পিছিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর প্রত্যেকেই নিজের মেধাকে সজাগ রাখবে। কোনো দিক থেকে দ্বীনের খেলাফ কোনো কাজ হতে দেখলে সেটার সংশোধন করা প্রত্যেকেই নিজের একান্ত দায়িত্ব মনে করবে। কেউ এই কাজকে সবার দায়িত্ব মনে করবে না। কেননা প্রত্যেকেই যদি একথা মনে করে যে, এই কাজ করা তো সবার দায়িত্ব, আমি একা করবো কেন?

তাহলে কেউ দায়িত্ব পালন করবে না। বরং একজন অপরজনের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তখন ফলাফল তাই হবে যা এক প্রসিদ্ধ ঘটনায় হয়ে ছিল। ঘটনা নিম্নরূপঃ

এক বাদশাহ ঘোষণা করলেন যে, আজ রাতের মধ্যে রাজ প্রাসাদ সংলগ্ন পুকুরে এই এলাকার প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ গাভীর দুধ এনে ঢেলে দিবে। সকালে আমি যেন পুকুরকে দুধে পরিপূর্ণ দেখতে পাই। অতঃপর প্রজাদের প্রত্যেকে এই চিন্তা করলো যে, সবাইতো পুকুরে দুধ ঢালবে, আমি একা এক বালতি পানি ঢাললে কীইবা সমস্যা হবে। অতঃপর সকালে উঠে দেখা গেল যে, সম্পূর্ণ পুকুর পানিতে পূর্ণ হয়ে আছে। কেন এমন হলো? উত্তর একটিই, প্রত্যেকে দুধ ঢালা নিজের দায়িত্ব মনে করেনি। যদি প্রত্যেকেই এই কথা ভাবতো যে, জানা নেই কে দুধ আনবে আর কে পানি আনবে, কমপক্ষে আমিতো দুধ ঢালি। তাহলে পূর্ণ পুকুর দুধে ভরে যেত। ঠিক তদ্রূপ কোনো আলেম যদি একথা ভাবে যে, আমি একা দায়িত্ব পালন না করলে কী হবে? আমি ছাড়া তো হাজারো আলেম আছেন তারা দায়িত্ব পালন করবেন, তাহলে কারো দ্বারাই দায়িত্ব আদায় হবে না।

আমরা যেসকল বুযুর্গানেদ্বীনের নাম নিয়ে আলোচনা করে থাকি, তাঁদের জীবনী খুলে দেখুন মাশাআল্লাহ ইলম ও তাকওয়ায় তারা ছিলেন আদর্শ। তাদের ব্যক্তিগত অবস্থান ছিল সুউচ্চে। এমন নয় যে, তাদের কোনো ভক্ত ও মুরীদ ছিল না, তাদের কোনো ছাত্র ছিল না এবং এমন নয় যে, তাদের ব্যক্তিগত ও জাগতিক কোনো প্রয়োজন ছিল না। বরং তাদেরও সন্তানাদি,ছাত্র, মুরীদ ও অন্যান্য প্রয়োজনাদি ছিল। তা সত্ত্বেও যখনই নতুন কোনো ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে আমাদের আকাবিরগণ তা শক্ত হাতে প্রতিরোধ করেছেন। তারা সেটাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করেছেন। অধীনস্ত ও ছাত্রদেরকে এ কাজে লাগাননি বরং নিজেরা প্রথম সারিতে এসে তার মোকাবেলা করেছেন এবং ফেতনাকে উৎখাত করে ছেড়েছেন। দারুল উলূম দেওবন্দের আকাবির উলামায়ে কেরামের জীবনী সম্পর্কে যাদের কিছুটা অবগতি আছে, তারা হয়তো জেনে থাকবেন যে, যখন ব্রিটিশ ইংরেজরা এই উপ-মহাদেশে আগ্রাসন চালিয়ে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের হাত থেকে রাজ্য ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলো তখন উলামা ও নেককার লোকদের বেছে বেছে ফাঁসিতে ঝুলালো, আগুনে নিক্ষেপ করলো এবং এমন হলো যে, আল্লাহ পাকের নাম নেওয়াও অপরাধ গণ্য করা হতে লাগল। সেই যমানায় আমাদের আকাবিরগণ দ্বীনে ইসলাম হেফাজতের জন্য একদিকে মাদরাসা কায়েম করলেন। আজ সেই মাদরাসার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এত বেশি হয়ে গেছে যে, মাদরাসার সংখ্যা গণনা করাই মুশকিল হয়ে গেছে। আলহামদুলিল্লাহ। অপরদিকে যখন ইংরেজ সরকারের এক বড় ব্যক্তি এই ঘোষণা করলো যে, 'আমরা এই উপমহাদেশে এমন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা-কারিকুলাম প্রণয়ন করবো, যেই কারিকুলাম অনুযায়ী লেখাপড়া করলে এদেশের মানুষ রং ও বর্ণে হিন্দুয়ানী থাকবে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃষ্টি-কালচারে বিলাতী তথা খ্রিস্টান হয়ে যাবে।' এহেন নাযুক মুহূর্তে

আকাবিরে দেওবন্দ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ইংরেজদের মোকাবিলা করার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। সাথে সাথে যেখানে যেভাবে ইংরেজরা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে তা মুকাবেলা করতে তারা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। এরই ধারাবাহিকতায় যখন ইংরেজ শাসনামলে খ্রিস্টান পাদ্রীদের উপদ্রব এতই বেড়ে গেল যে, যেখানে সেখানে তারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ও চ্যালেঞ্জ ছুড়তে লাগলো, তখন মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ., মাওলানা রহমাতুল্লাহ কেরানবী রহ. ময়দানে নেমে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুললেন।

ঐ যমানায়ই হিন্দু আর্য সমাজীদের নেতা স্বামী দিয়ানন্দ স্বরস্বতী প্রকাশ্য ময়দানে এসে ইসলামের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তুললো। নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সীরাতের বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য ও ইসলামী শিক্ষাদীক্ষার উপর নগ্ন হামলা শুরু করলো এবং এই বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকলো যে, হিন্দুস্তানের সকল বাসিন্দা বংশগতভাবে হিন্দু ছিল। মোঘল সম্রাটরা তাদেরকে প্রলোভন দেখিয়ে বা জবরদস্তীভাবে মুসলমান বানিয়েছে। আর কাফেররা তাদের অপপ্রচারে সফল হওয়ার জন্য শুদ্ধি আন্দোলন নামে একটি সংগঠন তৈরি করে ফেললো। আর ইংরেজ সরকারের সার্বিক সহযোগিতা নিয়ে সরলমনা মুসলমানদেরকে হিন্দু বানাতে থাকলো।

সে সময়ে হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রহ. এর মত দুনিয়া বিমুখ এবং খাঁটি ইসলাম চর্চায় ডুবন্ত ব্যক্তিত্ব মাদরাসার গন্ডি থেকে ময়দানে বের হয়ে এই ফেতনার মোকাবেলা করলেন। ইউপি, শাহজাহানপুর, এমনিভাবে পশ্চিম প্রদেশের বিভিন্ন শহরে তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত বলিষ্ঠ যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করতঃ আর্য সমাজীদের সকল আপত্তি খন্ডন করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সু-প্রমাণিত করেন। সেই যমানায় ঐ সকল মুনাজারা বা তর্কযুদ্ধ নিয়ে এই কিতাবসমূহ রচিত হয়ঃ

১.মুবাহাসায়ে শাহজাহানপুর ২. কেবলানুমা ৩.জাওয়াবে তুর্কি। আল্লামা কাসেম নানুতুবীর এসকল মুনাজারা ও রচনাবলী বিরোধী পথের উপর এমন প্রভাব ফেলে যে, তাদের সামনে তিনি এক বাঁধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ান। এক পর্যায়ে বাতিলের সকল প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে যায়।

মাওলানা রহমাতুল্লাহ কিরানবী রহ. খ্রিস্টান পাদ্রী ও অন্যান্য বাতিল শক্তির মোকাবেলায় ছিলেন একজন বিখ্যাত আলেম। ভারতের আগ্রাসহ যেখানে যখন বাতিল মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তিনি তা তাড়া করে ফিরেছেন। খ্রিস্টান পাদ্রীরা তার নাম শুনলে আতংকিত হয়ে পড়তো। এভাবে ব্রিটিশ সরকারের ছত্রছায়ায় খ্রিস্টবাদের ব্যাপক প্রচারণার ফলে যে বিভ্রান্তিকর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল আল্লাহ তা‘আলার দয়ায় তা বিদূরিত হয়।

এমনিভাবে ঐ যমানায়ই ব্রিটিশ সরকারের মদতে উদ্ভব ঘটে কাদিয়ানী মতবাদ নামে আরেক ভয়াবহ ফেতনার। গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী প্রথমে মুজাদ্দিদ হওয়ার দাবি করে, তারপর ঈসা মাসীহ হওয়ার দাবি করে, একপর্যায়ে সে নবী হওয়ার দাবি করে। তখন হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর মত ইলমী সাগরের বিখ্যাত ডুবুরী ও ছাত্র পাগল ব্যক্তিত্ব, কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ময়দানে নামলেন। তিনি তো ঐ ব্যক্তি, যিনি ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের নসীহতী মসনদের মধ্যমণি। তিনি ছিলেন ইলমের এমন অতল সাগর যার বক্তব্য বুঝতে ছাত্রদের বেগ পেতে হত। উপস্থিত উলামায়ে কেরাম! আপনারা হয়তো ঐসকল ব্যক্তিত্ব যারা আনওয়ারশাহ কাশ্মীরী রহ. এর ছাত্রদের থেকে কিংবা তাঁর ছাত্রদের ছাত্রদের থেকে ইলম হাসিল করে থাকবেন। যাদেরকে আল্লামা কাশ্মীরী জাহেল বলে সম্বোধন করতেন। আর ঘটনাক্রমে সেই জাহেল শব্দে সম্বোধিত ব্যক্তিদের তালিকায় রয়েছেন পৃথিবী বিখ্যাত আল্লামাগণ। যথা, পাকিস্তানের আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী, আল্লামা বদরে আলেম মিরাঠী, আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী, আল্লামা হিফজুর রহমান, কাজী যাইনুল আবেদীন, আল্লামা ক্বারী তাইয়েব রহ. যিনি দীর্ঘ দিন দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম ছিলেন। এই সকল মহান ব্যক্তিগণের মহামান্য উস্তাদ ইলমের পর্বতসম ব্যক্তিত্ব, ইলমী ব্যতায় সর্বজন বিদিত নির্জনবাসী হওয়া সত্ত্বেও এহেন নাযুক মুহূর্তে ভাগলপুর আদালতে চলমান কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রায়ের দিন দেওবন্দ ছেড়ে ভাগলপুর আদালতে গিয়ে জজের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে অত্যন্ত মজবূত প্রমাণাদির মাধ্যমে যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করতঃ কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করিয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন।

আল্লামা কাশ্মীরী বলেন, আমি আদালতে এই জন্যে উপস্থিত হয়েছি যে, সেদিন আমি যদি উপস্থিত না হতাম আর কাদিয়ানীদের পথে কোর্টের রায় হত, তাহলে হাশরের মাঠে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে আমি কীভাবে মুখ দেখাতাম। যদি তিনি প্রশ্ন করেন যে, আমার খতমে নবুয়াত ভূলুণ্ঠিত হচ্ছিল, আর তুমি কিনা ইলমী অধ্যাপনায় ব্যস্ত ছিলে? এই ছিল দেওবন্দী আলেমদের আত্মমর্যাদাবোধ ও দ্বীন হেফাযতের গুরুত্ব।

এমনিভাবে যখন বেরেলবী ফেতনার উদ্ভব হলো, তখন হযরত মাওলানা মুরতাজা হাসান সাহেব বেরেলবী সম্প্রদায়ের নেতা আহমাদ রেজা খানের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ দিলেন, মোনাযারা ও তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে তার সাথে লড়লেন এবং এই ফেতনাকে শক্ত হাতে প্রতিরোধ করলেন। এমনিভাবে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. ইলমী প্রমাণাদি দিয়ে কিতাব লিখে এই ফিতনার প্রতিরোধ করলেন। হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মাদসহ আরো অনেকে কিতাব লিখলেন। শেষের দিকে এসে ছারফারায খান সফদার এসম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর উপর কিতাব রচনা করেন। বিষয়গুলো এই, ইলমুল গাইব, হাজির নাজির, নূর আওর বাশারিয়্যাত, ইস্তিমদাদ বিগাইরিল্লাহ, নেদায়ে গায়েব এর মাসআলা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি ভিন্ন ভিন্ন কিতাব রচনা করেছেন,

www.islamijindegi.com

যেমনঃ ‘এযালাতুল গায়েব’ ‘ তাগরীবুন নাওয়াযেল’ ‘ আঁখুকি ঠান্ডাক’ ‘চেরাগকি রউশনি’ ইত্যাদি।

তারপর আসুন, লা-মাযহাবী সম্প্রদায়ের ব্যাপারে। তো এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. থেকে শুরু করে শাহ ইসহাক সাহেব, শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী, তারপর মুফতী মাহদী হাসান রায়পুরীসহ অনেক উলামায়ে কেরাম কিতাব রচনা করেছেন। এই ফেতনা আজও জোরে শোরে চলমান। এখন এদের প্রতিরোধের দায়িত্ব আমাদের।

এভাবে মওদূদী মতবাদ যখন সামনে আসলো, তখন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. এই ফিতনার বিরুদ্ধে ময়দানে নামলেন। এই ফেতনার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম আওয়াজ উত্তোলনকারী হলেন মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.। যখন উলামায়ে কেরামের একটি বড় অংশ মওদূদীর প্রতি ঝুঁকে পড়লেন। বরং হিন্দুস্তানের বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ আলেমও না বুঝে তার গঠিত দলে ভিড়ে যেতে শুরু করলেন। এমনকি কেউ কেউ নিজ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে দিয়ে শিয়াল কোটে স্থাপিত তথাকথিত দারুল ইসলামে হিজরত করা শুরু করলেন। কিন্তু হযরত মাদানী রহ. তখন এর বিরুদ্ধে আওয়ায তুললেন। তাদের দলীয় মূলনীতিতে উল্লেখ ছিল যে, আল্লাহ ও তার রাসূল ব্যতীত অন্য কাউকে সত্যের মাপকাঠি মনে করা যাবে না। একথা শুনে ঈমানী বিচক্ষণতার মূর্তপ্রতীক মাওলানা মাদানী রহ. এর কান খাড়া হয়ে গেল, তিনি একথার ব্যাখ্যা চেয়ে বললেন যে, কোনো বিষয়ে হযরত সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করা ও কোনো বিষয়ে তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা কি বৈধ? তখন মওদূদী সাহেব বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বৈধ। তখন লোকেরা বললো, মওদূদীর উত্তরের অন্তরালে কী লুকায়িত আছে? হযরত মাদানী রহ. বললেন, তার উত্তরের অন্তরালে এ কথা লুকায়িত আছে যে, শুধুমাত্র আবুল আলা মওদূদী ছাড়া দুনিয়ার আর যে কারো সমালোচনা করা বৈধ। চাই সে সাহাবী হোকনা কেন। তাইতো মওদুদী সাহিত্যে সাহাবায়ে কেরামকেও সমালোচনা করা হয়েছে।

মওদূদী সাহেব হযরত আয়েশা রা., হযরত মুয়াবিয়া রা., হযরত উসমানগনী রা., হযরত আবূযর গেফারী রা., হযরত আলী রা.সহ বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের সমালোচনা করেছেন। এমনকি নবীগণ আ. কেও ছাড়েননি। হযরত ইউনুস আ., হযরত মূসা আ., হযরত দাঊদ আ.সহ অনেক নবীর সমালোচনা মওদূদী সাহেব করেছেন।

অতঃপর এই মওদূদী মতবাদকে খন্ডন ও এর ভ্রান্তি প্রমাণে আমাদের আকাবিরদের মধ্য থেকে প্রায় সকলেই কিতাব রচনা করেছেন। আমি এখন শুধু শেষের দিকের কথা বলছি। শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব রহ. এর মত খানকাহী জীবনের নির্জনতায় অভ্যস্ত (যার হাতে লোকদের সাক্ষাৎ দেওয়ার মত সময় ছিল না। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনি আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত সময়টুকু ব্যতীত আর কোনো সময়

কাউকে সাক্ষাৎ দিতেন না, চাই সাক্ষাৎ প্রার্থী যত বড় ব্যক্তিই হোকনা কেন। শুধু মাত্র তিনজনের ক্ষেত্রে ছিল ব্যতিক্রম, মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, শাহ আব্দুল কাদের রায়পুরী, মাওলানা ইলিয়াস রহ.।) ব্যক্তিও মওদূদী সাহেবের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। মাওলানা ইউসুফ বান্নুরী রহ. এর মত জগত বিখ্যাত বিদ্বান তার বিরুদ্ধে কিতাব রচনা করেছেন। আর বেশ কিছু আলেম যারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে মওদূদী সাহেবের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছিলেন, তাদের প্রত্যেকেই একের পর এক ভুল বুঝতে পেরে মওদূদী সাহেব থেকে সরে এসে দায়মুক্ত হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন এবং এর উপর কিতাবও রচনা করেছেন। এর মধ্যে মাওলানা মনজুর নুমানী রহ. প্রণীত 'মওদূদীর সাথে আমার সাহচার্যের ইতিবৃত্ত' নামক বইটি অন্যতম।

আমার ভাইয়েরা! বাতিল ভ্রান্তবাঁদিদের যা কিছু নমুনা উপস্থাপন করলাম, ভারত বিভক্তির পূর্বে ও পরে অখণ্ড ভারত ও খণ্ডিত ভারতের তিন অংশের যেখানে যখন যে বাতিল আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, আমাদের আকাবিরগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ সাধ্য মোতাবেক তা প্রতিরোধ করে গেছেন।

প্রিয় ভাইয়েরা! আজ আমাদের দেওবন্দী জামাআত যা প্রকৃতপক্ষে হকপন্থীদের জামাআত এবং সঠিক অর্থে মুসলমান নামে আখ্যায়িত হওয়ার উপযুক্ত, যারা আকাবিরদের নাম উচ্চারণকারী এবং তাদের রেখে যাওয়া দ্বীনী মিশনকে শক্ত হাতে ধারণকারী। আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, অনেক জামাআত এমন আছে যাদের নিজেদের হিফাজাতের চিন্তা ব্যতীত অন্য কারো হেফাযতের চিন্তা নেই। বর্তমান এই নাযুক প্রেক্ষাপটে লা-মাযহাবী তথা গায়রে মুকাল্লিদদের ভ্রান্তি খন্ডন করা প্রয়োজন এবং মওদূদী মতবাদকে খণ্ডনকরা ও তাদের মুখোশ উন্মোচন করা প্রয়োজন। এমনিভাবে বেরেলবী, কাদিয়ানী ইত্যাদি মতবাদের খন্ডন করা প্রয়োজন।

শুধুমাত্র দেওবন্দী উলামাদের জামা'আতের অবস্থা এই যে, একদিকে তাদের দ্বীনের সহীহ তালীম হাসিল করা, অন্যদেরকে তালীম দেওয়া, অন্যের নিকট দ্বীনের তাবলীগ করার দায়িত্ব রয়েছে। অন্য দিকে দ্বীনে ইসলাম হেফাযতের দায়িত্বও তাদের কাঁধে, যেন নাম সর্বস্ব শিক্ষা- দীক্ষার ফাঁদে মুসলমানরা আটকে না যায়, কোথাও কেউ মওদূদী মতবাদের শিকার না হয়। খ্রিস্টান ও কাদিয়ানীরা মুসলমানদের ঈমানকে হুমকির মধ্যে ফেলে না দেয়। আমি জিজ্ঞাসা করি এবং অত্যন্ত দরদভরা দিল নিয়ে জিজ্ঞাসা করি, আজ কাদীয়ানী মতবাদ, খ্রিস্ট মতবাদ এর বিরুদ্ধে মোকাবেলা করে জনগণকে সচেতন করার জন্য কয়জন লোক কাজ করছে? সহীহ দ্বীনের উপর কে কে আছে? তো এমন গুরুত্বপূর্ণ জিম্মাদারীর চিন্তা মাথায় নিয়ে আমাদেরকে উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগতে হবে। নিজেদের দায়িত্ব পালনে যত্নবান হতে হবে।

আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি বলতে চাই, আরো কয়েকটি স্থানে যা বলেছি তা হলো, শয়তান দ্বীনের সহীহ মেহনতের কর্মীদেরকে কাজ থেকে হটানোর জন্য সবচেয়ে বেশি যে অস্ত্রটি ব্যাবহার করে তাহলো, আপোষে মতবিরোধ সৃষ্টি করা।

বর্তমানে সেই দুর্ভাগ্য আমাদের হকপন্থীদের সাথে যুক্ত হয়েছে। একই চিন্তাধারার অধিকারী, একই আকাবিরগণের নাম বুকে ধারণকারী, একই নিসাবে শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদানকারী দ্বীনের একই মিশনের কেতনধারী আলেমগণ অনৈক্য ও প্রকাশ্য মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ অবস্থা অত্যন্ত কষ্টদায়ক। দুনিয়ার বড় বড় সমস্যার সমাধান তাদের মাথার উপর তারা সেগুলির সমাধান না করে মতবিরোধে লিপ্ত আছে। দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে উভয় দেশের মধ্য থেকে তাদের বড় ব্যক্তিরা সন্ধির জন্য মিলিত হয় এবং তারা সমস্যার সমাধান করে উঠে। আমাদের শহরগুলোতে এ ধরণের ঘটনার অনেক নজীর রয়েছে। হিন্দুস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছে। তখন দুই দেশের বড় বড় ব্যক্তিরা দুই দুইবার বসে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত করেছে। এসব দুনিয়াদার লোকেরা নিজেদের দুনিয়ার স্বার্থে আপোষে মতবিরোধ দূর করার জন্য বসতে পারে। কিন্তু আলেমগণের পবিত্র জামাআত দ্বীনের জন্য নিজেদের মধ্যকার মতবিরোধ দূর করতে পারবে না? নিজের ব্যক্তি সত্বার কী মূল্য আছে? নিজের আমিত্বের কি দাম? দ্বীন কি আমাদেরকে এ কথা বলে যে আপোষে যুদ্ধ করো? আসলে আমরা আমাদের প্রবৃত্তির চাহিদার বেড়াজালে আটকে গেছি।

অতএব, আজকের যুবক উলামায়ে কেরাম এ কথার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ হোন যে, আমরা আমাদের বড় বড় উলামায়ে কেরামকে ঐক্যের প্লাটটফর্মে আনবো এবং সেজন্য তাদের পায়ে ও কাঁধে হাত রেখে খোশামোদ করে তাদের ভিতরকার অনৈক্য ও দূরত্ব দূর করে দিব। দেখুন, অনৈক্যের এই অর্থ নয় যে, বিভিন্ন মসজিদে বিভিন্ন মকতবে বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে তালীম দিচ্ছেন। এটা কোনো এখতেলাফ নয়; বরং এটাতো একই ফুল বাগানের বিভিন্ন ফুলের মত দৃশ্য। যেমন ফুল বাগানে বিভিন্ন রং ও ঘ্রাণের ফুল থাকে। কোনোটি গোলাপ,কোনোটি চামেলি, কোনোটি বেলি। একেক ফুলের একেক রং ও একেক ঘ্রাণ। রং এবং ঘ্রাণের ভিন্নতা সত্ত্বেও সব ফুল মিলে মানুষকে ও পরিবেশকে সুঘ্রাণযুক্ত করে দেয়।

এমনিভাবে সকল আলেম নিজেদের আকাবিরদের ইউনিফর্ম তথা আদর্শের ধারক হবে। কিন্তু যে বিষয়গুলো মৌলিক ও ভিত্তিমূলক সেগুলোতে সবাই ঐক্যের সূতায় আবদ্ধ থাকবে। কোনো প্রকার বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করবে না। আর যেখানে যেখানে এই বিচ্ছিন্নতা আসবে সেটা দূরীকরণের চেষ্টা করবে।

আর দ্বিতীয় জরুরী কথা হলো, এখলাসের সবচেয়ে বড় পরিচয় হচ্ছে দ্বীনের যে কাজ আমরা করছি হুবহু এই কাজ যদি অন্য কেউ করে তাহলে দুঃখিত না হওয়া বরং খুশি হওয়া। এক ছেলে তার পিতার খেদমতে লিপ্ত আছে। তাহলে পিতার অন্য ছেলের খেদমতে সে নারাজ হবে না, বরং খুশি হবে। এক মুরিদ তার শাইখের খেদমতে আছে, তখন অন্য মুরীদ তার শাইখের খেদমত করলে সে নারাজ হবে না, বরং খুশি হবে যদি সে সত্যিকার অর্থেই শাইখকে ভালবেসে থাকে। এক ব্যক্তি কোনো

প্রতিষ্ঠানে দান করে তো অন্য কেউ এই প্রতিষ্ঠানে দান করলে প্রথম ব্যক্তি নারাজ হবে না, বরং খুশি হবে। যদি আবেগ এমন হয় যে, আমি একাই খেদমত করবো অন্যকে খেদমত করতে দিব না তাহলে এটা ইখলাস হবে না; বরং তা হবে নিজের সুনাম সুখ্যাতির জন্য।

আমরা সকলেই দ্বীনের কাজে ব্যস্ত, তো একজন আলেম একটি প্রতিষ্ঠান বা একটি সংগঠন বানিয়ে কাজ নিয়ে দাঁড়ালেন, এমতাবস্থায় তার সহযোগী হতে হবে। তার বিরোধী হলে চলবে না। কেননা সে ঐ কাজই করছে যা আমি করছি। যে কেউ দ্বীনের আওয়াজ উঠাবে , পতাকা যার হাতেই থাকুক না কেন, নাক সিটকানো যাবে না। কোথাও একহাজার লোক জামা'আতে নামায আদায় করার জন্য জমা হলে, তার মধ্যে হয়তো এমন একশত লোক আছে, যারা সকলেই ইমামতী করতে পারে। কিন্তু একশত লোকই তো ইমামতী করবে না, বরং ইমামতী একজনই করবে। আর বাকী সবাই তাকে ইমাম হিসেবে মেনে নিবে। এখন অবশিষ্ট ৯৯ জন জুতা হাতে নিয়ে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায় কিংবা ইমাম সাহেবের জায়নামায কেড়ে নিয়ে বলে যে, ইমামতির যোগ্য আমি, অতএব আমি ইমামতি করবো। এ জাতীয় আচরণ করা কি কখনোই সমীচীন হবে? নাকি একজনের ইমামত মেনে নিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় উচিত হবে? এক ব্যক্তি ইমামতির জায়গাতে দাঁড়িয়ে গেছে এটাতো অন্যদের জন্য কোনো অসম্মানের বিষয় নয়। কেননা বিষয়টি এমন নয় যে, ইমামতিতে দাঁড়ালে সম্মানিত হবে আর মুক্তাদি অসম্মানিত হবে। ছাত্র ইমামতি করছে আর শাইখুল হাদীস সাহেব তার পিছনে নামায পড়ছেন। মাদানী সাহেব ছাত্রের পিছনে নামায পড়ছেন, কোথাও ছেলে ইমামতি করছে বাপ, দাদা তার পিছনে মুক্তাদী হয়ে নামায পড়ছে। তাদের জেহেনে একথা আসে না যে, একে ইমাম বানানোর দ্বারা তাদের পদমর্যাদা নষ্ট হবে। কেননা প্রথমেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, নামায জামা'আতের সাথে পড়া হবে। এই দৃশ্য প্রতিদিন পাঁচবার সামনে আসছে আর সবাই তাতে অংশগ্রহণও করছে। এমনিভাবে দ্বীনের কোনো কাজ যখন দলবদ্ধভাবে করা হয়, তখন তার মধ্য থেকে একজন সামনে নেতৃত্ব দিল আর আমি তার নেতৃত্ব মেনে নিলাম। এতে কি আমার মান সম্মান নষ্ট হয়ে যাবে? এতে সম্মান আরো বৃদ্ধি পাবে। এটা না করে কেউ যদি মনে করে যে, আমার মধ্যেও নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা আছে। অতঃপর ভিন্ন একটা দল গঠন করে সে নেতা হয়ে যায়। তাহলে দ্বীনের লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হবে। সব জায়গায় আজ বাস্তবতা দৃশ্যমান হচ্ছে। তো যুবকগণ হচ্ছে একটি জাতির শক্তি। সংসারে কোনো যুবক যদি এই জিদ ধরে যে, মা-বাপের মধ্যকার গন্ডগোল খতম করবে তাহলে তা সম্ভব হয়ে যায়। এটা না করে ছেলে যদি একদিকে থাকে, আর বাপ অন্য দিকে যায় তাহলে গন্ডগোলের নিরসন হবে না। আজকের নওজোয়ান তোলাবা ও উলামাদের শিক্ষা-দীক্ষা জাতির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যই। আমাদের মধ্যকার বড় বড় উলামায়ে কেরাম যদি পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের দর্শন ও আদর্শকে, ত্যাগ ও অগ্রাধিকারকে সামনে রাখেন,

তাহলে পরবর্তীদের জন্য এটা হবে অনুসরণীয় বিষয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই নেতা হওয়ার যোগ্য। পদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু মুসলিম জাতির ঐক্যের স্বার্থে আপোষের ঝগড়া খতম করে দিয়ে সহীহ পদ্ধতি ও এখলাসের সাথে কাজ করলে ইনশাআল্লাহ সফলতা আমাদের পদচুম্বন করবে।

সারকথা, আমি আপনাদের সামনে দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি।

এক. বিভিন্ন দিক থেকে প্রকাশিত ফেতনার দিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা এবং সে সব ফেতনা দমনের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং প্রত্যেকেই এটাকে নিজের দায়িত্ব মনে করা। মওদূদী মতবাদ আমাদের আকিদা ও আমাদের আমলের উপর আক্রমণ করছে, খ্রিস্ট মতবাদ আমাদের সরলমনা মুসলিম ভাইদের খ্রিস্টান বানাচ্ছে। কাদিয়ানীরাও ঈমানের উপর হামলা করছে। তো যেভাবে আমাদের আকাবিরগণ এসকল ফেতনার মোকাবেলা করেছেন সেভাবে আমরাও এর মোকাবেলা করা নিজেদের দায়িত্ব মনে করব।

দুই. যে কেউ দ্বীনের সহীহ খেদমত আঞ্জাম দিবে তার সহযোগিতা করবো। বিরোধিতা করবো না। কেননা আমি যেমন নায়েবে রাসূল তেমনি সেও তো একজন নায়েবে রাসূল।

আর দ্বীনের কাজ বলতে মৌলিকভাবে নববী কাজকেই বুঝায়। আর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাজের ধারা ছিল তিনটিঃ
১. কিতাবুল্লাহ ও হিকমাত তথা সুন্নাহ শিক্ষাদান।
২. তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধি।
৩. দাওয়াত ও তাবলীগ।

এগুলোকেই মূলত প্রকৃত নববী কাজ বলে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষ তা‘লীমের কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে, খানকাহগুলো তাযকিয়ার কাজ করছে, আর তাবলীগওয়ালারা দাওয়াতের কাজ করছে। এগুলোর সবই দ্বীনী কাজ। এগুলোর যেটার প্রতি যার দিলের ঝোঁক বেশি সে তাতে লেগে থাকবে। অন্যগুলোকে অস্বীকার করবে না। মাদরাসাওয়ালা যদি একথা মনে করে যে, আমরাই তো দ্বীনের কাজ করছি। দাওয়াতের লাইনের লোক দ্বীনের কাজ করছে না। এটা চরম ভুল হবে। দাওয়াত ওয়ালার একথা মনে করা যে, দ্বীনের কাজতো শুধু আমরাই করছি, মাদরাসা ওয়ালারা দ্বীনের কাজ করছে না এটাও ভুল হবে। আর খানকাহওয়ালারা যদি এটা মনে করে যে, দাওয়াতের লাইনের লোকেরা কী জানে? হাকীকত ও প্রকৃত জিনিস তো আমাদের কাছে রয়েছে। এটাও ভুল হবে। আল্লাহ পাক বলেনঃ

ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة :هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم... وقال ايضا

قل هذه سبيلى ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعنى :الحسنة... وقال ايضا.

তো যারা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নায়েব তথা ওয়ারিশ দ্বীনের সকল কাজ নিয়ে চলা তাদের দায়িত্বে। যার যেটার প্রতি মনের ঝোঁক বেশি সে সেটা করবে। আর অন্য গুলোকে সমর্থন ও সহযোগিতা করবে, বিরোধিতা মোটেই করবে না। এ পদ্ধতিতে ইনশাআল্লাহ দ্বীনের কাজ অনেক বেশি হবে। চোখের কাজ দেখা আর কানের কাজ শোনা, জিহ্বার কাজ বলা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। এমন নয় যে, চোখকে দেখার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে শ্রবণ ও বলার দায়িত্বও পালন করতে হবে। বরং দেখবে চোখ, বলবে জিহ্বা, আর শুনবে কান। তবে প্রত্যেকেই অপরের সহযোগী। এমনিভাবে সকল নায়েবে রাসূল দ্বীনের কাজ করে যাচ্ছেন। অতএব, আপোষে একে অপরের সহযোগী হতে হবে।

আপনাদের সমীপে আর একটি আবেদন এই যে, উর্দূ ভাষা ও ফার্সী ভাষা ছাত্রদেরকে খুবই গুরুত্ব দিয়ে পড়াবেন। উর্দূ-ফার্সী যদিও মাতৃ ভাষা নয়, কিন্তু এই দুই ভাষা আমাদের দ্বীনী খেদমতের ও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে গেছে। আমাদের আকাবিরদের সকল কিতাব উর্দূ ও ফার্সীতে লেখা। সেগুলো থেকে উপকৃত হতে গেলে এই দুই ভাষা শিখার বিকল্প নেই। কোনো ভাষার অস্থিত্ব বাকি থাকে সেই ভাষায় শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ ও সেই ভাষা বলার মাধ্যমে। আমরা উলামায়ে কেরাম যদি এই দুই ভাষাকে টিকিয়ে না রাখি, শিক্ষা না দেই, তাহলে এই ভাষাকে টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব আর কে পালন করবে? সাধারণ মানুষ তো এই দায়িত্ব পালন করবে না। সুতরাং এই দুই ভাষাকে নিসাবভুক্ত করে গুরুত্বসহ পড়াবেন।

যাইহোক, আপনাদের সামনে বিক্ষিপ্ত কিছু কথা আলোচনা করলাম। এসব কথার প্রথম সম্বোধিত ব্যক্তি আমি নিজেই। যদি কোনো ভুলত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে মাফ করে দিবেন। আর যদি কিছু কাজের কথা বলে থাকি, তাহলে সেগুলো আপোষে আলোচনা করে কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা যায় তার ফিকির করবেন।

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

কওমী মাদরাসার ইতিহাস ঐতিহ্য ও অবদান

বিশ্বের শীর্ষ ইসলামী বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সম্মানিত মুহতামিম
হযরত মাওলানা আবুল কাসেম নুমানি সাহেব দা. বা.এর ঐতিহাসিক বয়ান
(স্থান: ফ্রেন্ডস্ ক্লাব মাঠ, সেক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা। তারিখ: ৯ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার, ২০১৩ ঈ.)

ভাষান্তর: শাইখুল হাদীস মুফতী মনসূরুল হক দা. বা.

قال الله تبارك و تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

সম্মানিত উলামায়ে কেরাম,বুযুর্গানে দ্বীন, যুবক বন্ধুগণ, ও প্রিয় অনুজ!
আজকের এই জৌলুসপূর্ণ মাহফিল শহর অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এখানে অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে রয়েছেন নিজ নিজ অঞ্চলের উচ্চ পর্যায়ের উলামায়ে

কেরাম, বড় বড় দ্বীনী প্রতিষ্ঠানের মুহতামিমগণ, শাইখুল হাদীস, শিক্ষকবৃন্দ,শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রিয় শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ, এ দিকে লক্ষ্য করে এটি একটি মহিমান্বিত মাহফিল।

সময় স্বল্পতার কারণে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কিছু আলোচনা করবো, যা আমরা আমাদের আমলী জীবনে পাথেয়রূপে গ্রহণ করতে পারি এবং তার আলোকে আলোকিত হতে পারি।

আমার প্রিয় বন্ধুগণ!
ঘোষণার মধ্যে আমার ব্যাপারে বারংবার একটি নিসবত ও সম্পর্কের কথা বলা হচ্ছিল, আর তা হচ্ছে 'দারুল উলুম দেওবন্দ' এর নিসবত, যা আমাদের আকাবিরের আমানত, যার খেদমতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার তাওফীক আমার হয়েছে। এই নিসবতকে কেন্দ্র করেই আমাদের প্রতি গণমানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা ও মুহব্বাত, তার কারণ হলোঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের আকাবিরকে আক্বীদা, ইলম, আমল, পরহেযগারী, খোদাভীতি, দ্বীনদারী, বীরত্ব, আমানতদারী, প্রভৃতি যাবতীয় বৈশিষ্ট্যে এমনভাবে বৈশিষ্ট্যময় করেছিলেন যে, সেগুলোর যে কোন একটি নিয়ে চিন্তা করলে এবং তাদের জীবনের যে কোন অধ্যায়ের প্রতি লক্ষ্য করলে দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়, জীবনের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

দেওবন্দ পৃথক কোনো দল বা গোষ্ঠীর নাম নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ২৩ বৎসরের জীবদ্দশায় সাহাবায়ে কেরাম রাযি.কে যে শিক্ষার ধারক বাহক বানিয়ে ছিলেন, আক্বীদার সংশোধন করেছিলেন, সৎচরিত্রের মূর্তপ্রতিক বানিয়েছিলেন, ন্যায়-নিষ্ঠা, তাক্বওয়া, আমানতদারী, দ্বীনদারী, খোদাভীতি, সুন্নাতের অনুকরণ, খোদাপ্রেম, রাসূলপ্রেম, আল্লাহর রাহে সর্বস্ব বিলীন করে দেওয়ার অদম্য উদ্দীপনা, একনিষ্ঠ একত্ববাদ, দ্বীনের ক্ষেত্রে অটলতা ও দৃঢ়তা, বাতিল আক্বীদা-বিশ্বাস ও বাতিল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব প্রভৃতি সমুদয় বৈশিষ্ট্যাবলী যা সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে স্বরূপে বিদ্যমান ছিল এবং বংশ পরম্পরায় ক্রমান্বয়ে এক জামা'আত থেকে আরেক জামা'আতে, এক স্তর থেকে আরেক স্তরে ধারাবাহিকভাবে স্থানান্তরিত হয়ে বক্ষ্যমাণ হিজরী শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছে, আল্লাহ তা'আলা সেগুলোর বাস্তব নমুনা ও মৌলিক শিক্ষা আকাবিরে দেওবন্দকে দান করেছেন, তারা একদিকে ঈমান-আক্বীদাগতভাবে ছিলেন দুর্নিবার ও সুদৃঢ়, কবর পূজা প্রভৃতি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ছিলেন আপোষহীন, সুন্নাতের অনুকরণে এতটাই যত্নবান ও সতর্ক ছিলেন যে, সামান্য থেকে সামান্য আমলও সুন্নাত পরিপন্থী হতো না, চাই তা সুন্নাতে মুআক্কাদা না হয়ে সুন্নাতে আদিয়া হোক ও তাদের সুনানে ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত না হোক।

প্রথম পর্যায়ে:

আমি আপনাদের সম্মুখে সাহাবায়ে কেরামের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো, সাথে সাথে আকাবিরে দেওবন্দের কিছু ঘটনাও উপস্থাপন করবো। অতঃপর আমি আহবান করবো আপনাদেরকে এই সমস্ত ঘটনার পারস্পরিক গভীর সম্পর্ক অমিল লক্ষ্য করার জন্য, আমার এই আহবান বাস্তবতার প্রকাশ হিসেবে, কবি বলেনঃ اولئك أبائ فجئنى بمثلهم-إذا جمعتنا يا جريرالمجامع. অর্থাৎঃ [স্বীয় পূর্বপুরুষের গুণাবলি বর্ণনা করার পর] তারাই আমার পিতৃপুরুষ, জনসমাগম ঘটলে সম্ভব হলে তাদের কোন সমকক্ষ নিয়ে এসো!

বাপ-দাদাদের কৃতিত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করে নিজের বুক ফুলানোর মধ্যে কোনো বাহাদুরি নেই। বরং এর দ্বারা এই শিক্ষা গ্রহণই উদ্দেশ্য যে, তারা কী কী গুণাবলি দ্বারা বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ছিলেন এবং সে তুলনায় আমাদের মাঝে কী কী ত্রুটি, দুর্বলতা, ব্যর্থতা ও অসম্পূর্ণতা রয়েছে, সেগুলো যাচাই করে তাদেরকে আয়না বানিয়ে নিজেদের জীবনের ইসলাহ্ ও সংশোধন করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে সাহাবাদের মহব্বত ছিল ইশক এর স্তরের। তাদের ক্ষুদ্রতম কোনো আমলও সুন্নাত পরিপন্থী হবে এটা তাদের কাছে অসহনীয় ছিল। তাদের কারও কলিজার টুকরা সন্তানও যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত পরিপন্থী কোনো কাজ করতো অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো নির্দেশ পালনের ব্যাপারে সামান্য গড়িমসি করতো, তাহলে তার সাথে আজীবন কথাবার্তা পর্যন্ত পরিত্যাগ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক একটি সুন্নাত তাদের নিকট এতটাই প্রিয় ছিল যে, সেটার বিপরীতে অন্য সব কিছু একেবারেই নগণ্য ও তুচ্ছ।

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. যিনি প্রথম সারির বিশিষ্ট সাহাবিদের অন্যতম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করতে গিয়ে বলেনঃ رضيت لأمتى ما رضى لها ابن أم عبد. অর্থাৎঃ আমার উম্মতের যে ব্যাপার নিয়ে ইবনে মাসউদ সন্তুষ্ট, আমিও তাতে সন্তুষ্ট, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন সমগ্র সাহাবায়ে কেরামকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে, اتخذوا القرأن من أربعة... অর্থাৎঃ তোমরা চারজনের নিকট থেকে কুরআন শিক্ষা করো...(মুসলিম হা. নং ২৪৬৪) তাদের মধ্যে ইবনে মাসউদ রাযি. এর নামও উল্লেখ করেছেন।

তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এতটা উন্নত ছিল যে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইহধাম ত্যাগ করেছিলেন, সেই সাহাবাগণ তখনও জীবিত যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমুন্নত জীবন চরিত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, দেখেছিলেন তার আমল, উঠাবসা, চাল-চলন; তাকে স্থান দিয়েছিলেন স্বীয় মনের মনি কোঠায় ও তাকে আপন করে নিয়েছিলেন, কিন্তু যাদের এই সৌভাগ্য লাভ হয়নি তাদেরও এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

জীবন যাপন সম্পর্কে অবহিত হবেন, সুন্নাতকে শিখবেন, তদনুযায়ী জীবনকে সাজাবেন, যদি এর নমুনা জানা যায় তাহলে তো সৌভাগ্যের বিষয়, তাদের একজন জনৈক সাহাবীকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবন যাপন পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন! তার উঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি কিরূপ ছিল? তিনি উত্তরে বললেনঃ আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযি.কে চিনো? সে বললোঃ জী। তিনি বললেনঃ তাহলে এক কাজ করো, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করো, যখন ইবনে মাসউদ স্বীয় ঘর থেকে বের হবেন তখন তুমি তার অনুসরণ করে তার প্রতিটি কাজ মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করবে যে, তিনি চলাফেরা, উঠা-বসা, কথা-বার্তা, নামায আদায়, মসজিদে প্রবেশ এবং বের হওয়াসহ যাবতীয় কাজকর্ম কীভাবে সম্পন্ন করেন, তুমি তাকে যেভাবে করতে দেখবে, হুবহু এটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্মপদ্ধতি ছিলো। (বুখারী হা.নং ৩৭৬২)

দেখুন! এক সাহাবি অপর এক সাহাবির ব্যাপারে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, এমনভাবে সুন্নাতের অনুসরণ করতেন যে, তিনি সুন্নাতের জীবন্ত নমুনা হয়ে গিয়েছিলেন।

একবার আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. জুম'আর নামাযে উপস্থিত হলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন, কিছুলোক মসজিদে স্থান সংকুলানের অভাবে বিভিন্ন স্থানে দাঁড়িয়ে ছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ 'বসে পড়ো'! ইবনে মাসউদ রাযি. তখনও মসজিদে প্রবেশ করতে পারেননি, দরজার বাহির থেকে শুনলেন 'বসে পড়ো', তিনি সেখানেই বসে পড়লেন, তিনি এটা দেখতে গেলেন না যে, জায়গা পরিষ্কার কিনা, বরং তৎক্ষণাৎ বসে পড়লেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডাক দিলেনঃ ইবনে মাসউদ! ভিতরে এসে বসো, তখন তিনি ভিতরে এসে বসলেন, প্রিয় বন্ধুগণ লক্ষ্য করুন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. এর কানে আওয়াজ পৌঁছেছে 'বসে পড়ো', তো তিনি আর জিজ্ঞাসা করতে যাননি, এটা শুধু ইবনে মাসউদ রাযি. এর নয়, বরং সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এর সার্বিক জীবন পদ্ধতি।

আরেকজন বিখ্যাত সাহাবি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. এর ব্যাপারে তার পুত্র সালেম রহ.ও গোলাম নাফে' রহ. এর সূত্রে বিস্তারিতভাবে রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে যে, যখন তিনি মদিনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ পানে রওয়ানা করতেন, তখন তিনি পূর্ণ গুরুত্বের সাথে এবিষয়টি অনুসরণ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন্ পথ দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন, কোন্ বৃক্ষের নিচ দিয়ে যাতায়াত করেছিলেন, কোন্ ঘাটিতে অবতরণ করেছিলেন, কোন্ পাহাড়ে আরোহণ করেছিলেন, কোথায় তাঁবু গেড়েছিলেন, কোথায় সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে নামায পড়েছিলেন, কোথায় রাত্রি যাপন করেছিলেন, প্রভাতে কোন্ পথে বের হয়েছিলেন, কোথায় ইস্তেঞ্জার জরুরত সেরেছিলেন, এভাবে খুঁজে খুঁজে প্রতিটি আমলের পুঙ্খানো

পুঙ্খোরূপে অনুকরণ করতেন। মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফ পৌঁছা পর্যন্ত, সুন্নাত অনুসরণের ক্ষেত্রে এতটাই গুরুত্ব দিতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বৃক্ষের ছায়ায় নামায আদায় করেছিলেন, তিনিও সেই বৃক্ষের ছায়ায় নামায আদায় করেছিলেন, তা দেখে তার অনুচরগণ তাঁকে অনুরোধ করে বললেন যে, হুযুর! মসজিদ থাকতে আপনি এখানে নামায পড়ছেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখানে নামায আদায় করেছিলেন, সুতরাং আমি এখানেই নামায আদায় করবো।

একবার তিনি সফররত অবস্থায় একস্থানে বাহন থেকে অবতরণ করে একপাশে ইস্তেঞ্জা করার পদ্ধতিতে কিছুক্ষণ বসে পুনরায় সফর শুরু করলেন, সহচরবৃন্দ জিজ্ঞেস করলেনঃ হুজুর! বিষয়টি বুঝতে পারলাম না, আপনার ইস্তেঞ্জার জরুরত না থাকা সত্ত্বেও এভাবে বসার কারণ কী? তিনি বললেনঃ আরে বোকা! আমি একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এক সফরে তার সফরসঙ্গী থাকাবস্থায় তিনি এই স্থানে বাহন থামিয়ে ইস্তেঞ্জার জরুরত সেরেছিলেন, আমি কীরূপে এই স্থান অতিক্রম করে চলে যাবো?

এক্ষেত্রে শরী'আতের কোনো বাধ্য বাধকতা নেই, এগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্বাভাবিক কার্যক্রম ছিল যে, যেখানে নামাযের সময় হয়েছিল সেখানে নামায পড়ে নিয়েছিলেন, যেখানে রাত্র হয়েছিল সেখানে রাত্র যাপন করেছিলেন, যেখানে ইস্তেঞ্জার জরুরত হয়েছিল সেখানে সেটা সেরে নিয়েছিলেন, যে এর অনুসরণ করবে না বা এর বিরোধিতা করবে, সে সুন্নাত পরিত্যাগকারী বা বিরোধিতাকারী গণ্য হবে এমন কিছু নয়। কিন্তু ইশক ও মুহাব্বতের তাকাযা এটাই ছিলো যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতিটি কার্যক্রমের হুবহু অনুকরণ করতেন, যত সামান্য ব্যাপারই হোক না কেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের এ ধরনের রাসূলপ্রেমের ঘটনাবলি বর্ণনা করা শুরু হলে সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তবুও শেষ করা যাবে না। তাদের সমগ্র জীবনটাই ছিল রাসূলপ্রেমের অপূর্ব নমুনা।

এ পর্যায়ের আকাবিরে দেওবন্দের সুন্নাতের অনুসরণ ও রাসূলপ্রেমের কিছু নমুনা সংক্ষিপ্তরূপে আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি।

আকাবিরে দেওবন্দের মধ্য থেকে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাদের অন্যতম হলেনঃ কাসেম নানুতবী রহ. ও রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ.। কাসেম নানুতবী রহ. এর সাধারণ জীবন-যাপন, পোশাক-পরিচ্ছেদ, চাল-চলন ও সাধারণ অবস্থা দেখে কারও বোঝার উপায় ছিল না যে, ইনিই হলেন বিশ্বখ্যাত দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা, হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ.। তিনি সর্বাত্মকভাবে সুন্নাতের

অনুকরণ করতেন এবং বড় বড় ত্যাগ স্বীকার করার জন্য আত্মোৎসর্গ করে দিতে পর্যন্ত সদা প্রস্তুত ছিলেন। তার পুরো জীবনে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

আমি তাঁর সম্পর্কে দু'টি ঘটনা বর্ণনা করছিঃ

প্রথম ঘটনা হলোঃ

১৮৫৭ সালে এই ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য শামেলীর ময়দানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুসলমানগণ আমীরে শরীয়ত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. এর নেতৃত্বে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেখানে অগ্রণী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সম্মুখ সমরে বীর দর্পে লড়েছিলেন মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ., রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ., হাফেয যামেন শহীদ রহ., মাওলানা রহমতুল্লাহ্ কিরানবী রহ. সহ আরো বড় বড় উলামায়ে কেরাম। শামেলীর ময়দানে হাফেয যামেন শহীদ রহ. শাহাদাত বরণ করেন, কিন্তু ইংরেজদের চাটুকারিতায় মুসলমানদের পরাজয়ে রাজ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ বেনিয়াদের করতলগত হয়ে যায়। সম্মুখসমরে নেতৃত্বদানকারীদের নামে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী হয়ে যায় এবং তারা ইংরেজদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়ার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ফাঁসির হুকুম হয়ে যায়। জেনে শুনে নিজের প্রাণকে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া ও শত্রুর হাওয়ালা করে দেওয়া যেহেতু ইসলামের শিক্ষা নয়, বরং যথাসাধ্য আত্মরক্ষার পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তাই কাসেম নানুতবী রহ. দেওবন্দ প্রত্যাবর্তন করে তিনদিন পর্যন্ত নিজ গৃহে আত্মগোপনে ছিলেন, তিনদিন পূর্ণ হওয়ার পর ঘর থেকে বের হয়ে 'সাত্তা মসজিদে' চলে এলেন যেখানে ডালিম বৃক্ষের নিচে দারুল উলুম দেওবন্দের গোড়াপত্তন হয়, খাদেমগণ তাকে অনুনয় বিনয় করে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন যে, হযরত! ইংরেজরা আপনাকে পাগলা কুকুরের ন্যায় হন্য হয়ে খুঁজছে, আপনি এখনো বিপদমুক্ত নন, আপনার আরো কিছুদিন আত্মগোপনে থাকা উচিত, তখন তিনি উত্তরে যা বলেছিলেন সেটাই আমাদের জন্য লক্ষণীয় ও শিক্ষণীয়, আর তা হলোঃ তিনি বললেন যে, কাসেম এর প্রাণ তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযি. এর চেয়ে অধিক মূল্যবান নয়, কাসেম এর উপর আপতিত বিপদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাযি. এর উপর আপতিত বিপদের চেয়ে অধিক ভয়ানক নয়। হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে যখন মক্কার কাফেররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শহীদ করে দেওয়ার চূড়ান্ত পাঁয়তারা করে ফেলেছিলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাযি.কে নিয়ে রজনীর অন্ধকারে বের হয়ে তিনদিন পর্যন্ত ছওর গুহায় আত্মগোপনে ছিলেন, চতুর্থ দিন সেখান থেকে বের হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন, কাসেমের আত্মমর্যাদা এটা বরদাস্ত করতে পারে না যে, আমার মুনিব তিনদিন পর্যন্ত আত্মগোপনে ছিলেন, সেখানে আমি এর চেয়ে বেশী দিন আত্মগোপনে থাকবো।

চিন্তা করুন, কোথায় ছিল তাদের দৃষ্টি! প্রতি মুহূর্তে এই আশঙ্কা ছিল যে, শত্রুরা ধরে ফেলবে, যার পরিণতিতে নিশ্চিত ফাঁসি, কিন্তু দৃষ্টি ছিল সুন্নাতের উপর, আত্মগোপনেও সুন্নাতের অনুকরণ এবং বের হওয়াতেও সুন্নাতের অনুকরণ।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনাঃ

তখন হিন্দুস্তানে হিন্দুদের কুসংস্কারে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানদের মধ্যেও বিধবা-বিবাহকে দোষনীয় ভাবা হতো, ফলে বিধবাদের বিবাহ হতো না। তাই কাসেম নানুতবী রহ. যথারীতি এর বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়ে উঠলেন, বিধবা বিবাহের পথে জোরালো প্রচারণা চালাতে লাগলেন এবং এ বিষয়টি জনসম্মুখে বয়ান করতে লাগলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পুণ্যাত্মা পত্নীগণের মধ্যে একমাত্র হযরত আয়েশা রাযি.ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কুমারী অবস্থায় বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন, অন্য সকল পত্নীগণের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন তালাকপ্রাপ্তা আর অধিকাংশই ছিলেন বিধবা, সুতরাং 'বিধবা-বিবাহ' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাত, এটাকে দোষনীয় মনে করা মারাত্মক অন্যায় ও ঈমানের জন্য হুমকি স্বরূপ।

এরই ধারাবাহিকতায় তিনি একবার দিল্লীর জামে মসজিদে এ বিষয়ের উপর বয়ান করছিলেন, হঠাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললোঃ হুযুর! আমার একটি কথা আছে, তিনি যেহেতু আল্লাহর ওলী ছিলেন তাই তৎক্ষণাৎ ঘটনা আঁচ করতে পেরে বললেনঃ আপনি বসুন, অতঃপর উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেনঃ আমাকে দশ মিনিট সময় দিন আমি একটি কাজ সেরে আসছি আপনারা বসুন, একথা বলে তিনি তার অন্দর মহলে প্রবেশ করে যেখানে তার এক বয়স্কা বিধবা বড় বোন ছিল, যার কাছে ইতিপূর্বে কোন পয়গাম আসেনি এবং তিনি প্রস্তাবও পাঠাননি, তিনি স্বীয় পাগড়ী তার পায়ের কাছে রেখে বললেনঃ আপা! আমি জানি, আপনার আর বিবাহের প্রয়োজন নেই, তবুও আপনি যদি পুনরায় বিবাহে সম্মত হয়ে যান, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনেক বড় একটি সুন্নাত পুনর্জীবন লাভ করবে। তখন তার বড় বোন বললেন যে, আমার দ্বারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত প্রায় একটি সুন্নাত পুনর্জীবন লাভ করে তাহলে আমি এর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি বের হয়ে তার এক বন্ধুর নিকট আসলেন যার স্ত্রী কিছুদিন পূর্বে মারা যায়, তাকে স্বীয় বড় বোনের সাথে তার বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে বললো যে, এটাতো আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয়, আমি এতে রাজি। ঐ বন্ধু সানন্দে উক্ত প্রস্তাব লুফে নিলে তিনি ঘটনাস্থলেই দুই সাক্ষীর মাধ্যমে ঈজাব কবুল দ্বারা বিবাহ সম্পন্ন করে ফেললেন। তিনি দশ মিনিটের মধ্যেই এই পুরো কার্যক্রম সমাধা করে মসজিদে ফিরে আসলেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করলেনঃ কে যেন কী বলতে চাচ্ছিলেন এবার বলুন, লোকটি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে বললো যে, ভালোই তো নিজের ঘরে বিধবা বড় বোন রেখে আমাদেরকে বিধবা বিবাহে উদ্বুদ্ধ করছেন, আগে তাকে বিবাহ দিয়ে আসুন, তিনি বললেনঃ আলহামদুলিল্লাহ! এই অসম্পূর্ণ কাজটি এইমাত্র সম্পন্ন করে এসেছি।

তারপর ইশারা করলে সেই বন্ধু দাঁড়িয়ে বললোঃ আমিই তার বড় বোনকে বিবাহ করেছি, আমি তার ভগ্নীপতি।

এভাবেই আমাদের আকাবিরের প্রত্যেকে সর্বদা এ উদ্দীপনা নিয়ে থাকতেন যে, আমার প্রিয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিপন্ন প্রায় প্রতিটি সুন্নাত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যেই ত্যাগ তিতিক্ষাই দরকার হোক না কেন তা দেয়ার জন্য আমি সদা সর্বদা প্রস্তুত।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমাদের আকাবির এর এ ধরনের অনেক ঘটনাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা বলবো ভেবে পাচ্ছি না।

এখন তাদের কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ করছিঃ
(১) আরওয়াহে ছালাছা। (২) শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. রচিত 'আপবীতী'। (৩) শাহ্ আব্দুল কাদের রায়পুরী রহ. এর জীবনী 'সাওয়ানেহে মাওলানা আব্দুল কাদের'। (৪) মাওলানা কাসেম নানুতবী রহ. এর জীবন বৃত্তান্ত 'সাওয়ানেহে কাসেমী'। (৫) মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রহ. এর জীবন বৃত্তান্ত 'তাযকিরাতুর রশীদ'। উর্দূ পড়া সম্ভব হলে উর্দূতে আর বাংলা অনুবাদ সহজবোধ্য হলে বাংলাতে সেই কিতাবগুলো অধ্যয়ন করা জরুরী।

এর দ্বারা আত্মশংশোধন হবে, নিজের মধ্যে আমলের আগ্রহ তৈরী হবে এবং নিজেদের নিসবতের মূল্যায়ন ও গুরুত্ব বুঝে আসবে যে, আল্লাহ তা'আলা কত মহান বুযুর্গদের নিসবত এর সাথে আমাদেরকে সম্পৃক্ত করে রেখেছেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে
আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো তা হলোঃ আমাদের আকাবির এ ব্যাপারে সদা সজাগ থাকতেন যে, খালেস দ্বীনের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত দিক দিয়ে বিদআত ও নব উদ্ভাবিত কোন বিষয়ের অনুপ্রবেশ কেউ যেন ঘটাতে না পারে, তাদের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ববহ ছিল।

সাহাবা যুগ থেকে তাবেঈ যুগ, তাবেঈ যুগ থেকে তাবে তাবেঈ যুগ এভাবে ক্রমান্বয়ে এক স্তর থকে আরেক স্তর হয়ে যুগ যুগ ধরে যে সম্মিলিত ও সর্বসম্মত কর্ম পদ্ধতি আজ অবধি চলে এসেছে সেটাকেই আঁকড়ে ধরতে হবে। বিশেষত সাহাবায়ে কেরাম এর সাথে মুহাব্বাত রাখা এবং তাদের ব্যাপারে সঠিক আক্বীদা পোষণ করা, তাদেরকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করা, তাদের প্রত্যেককে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়া ও বিভিন্ন মুআমালা ও মাসআলাগত বিষয়ে সাহাবায়ে কেরাম এর যে অবস্থান ছিল সেটা ধরে রাখাই আমাদের আকাবিরে দেওবন্দের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল।

#আমার সম্মানিত উস্তাদ হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমাদ মুরাদাবাদী বুখারী শরীফের দরসে বলেনঃ পৃথিবীতে যত নতুন নতুন দলের আবির্ভাব ঘটছে, প্রত্যেকেরই একই দাবি যে, আমরাই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমরা কিতাবুল্লাহ ও

সুন্নাতে রাসূল এর অনুসরণ করি এবং সে মতে তারা নিজ নিজ মতবাদ আয়াত-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করার চেষ্টা করে থাকে, এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের সম্মুখে এমন কোন মাপকাঠি থাকা উচিত, যার দ্বারা এ বিষয়টি নির্ণীত হয় যে, প্রত্যেকেই নিজ দাবির উপর কতটা সত্যবাদী।

অতঃপর আমার শাইখ বলতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافا كثيرا .

অর্থ: আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের মধ্য থেকে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অনেক মতভেদ দেখতে পাবে, যথা এই বিংশ শতাব্দীতে অনেক নতুন দল ও নতুন মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে, তোমাদের জন্য এ পরিস্থিতিতে আমার দিকনির্দেশনা হলোঃ فعليكم بسنتى و سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ.

অর্থাৎঃ তখন তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার কর্মপদ্ধতি এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত ও সঠিক পথের দিশারী খলীফাগণের কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করো এবং তা দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। (মুসনাদে আহমাদ হা.নং ১৭১৪৫)

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: পূর্বের উম্মত ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে, তাদের মধ্যে একদল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামী। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেনঃ তারা কারা হবে? হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেনঃ ما أنا عليه وأصحابى অর্থাৎঃ যে পথের উপর আমি ও আমার সাহাবাগণ রয়েছে। সুতরাং ‘আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতই হলো একমাত্র দল যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম এর আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ও সাহাবায়ে কেরামকে হুজ্জাত তথা প্রমাণ ও সত্যের মাপকাঠি হিসেবে জানে, তাদের সিদ্ধান্তকে শরী‘আতের সিদ্ধান্ত মনে করে ও তাদের ইজমা তথা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তকে আল্লাহর হুকুম হিসেবে মনে করে।

এই ব্যাখ্যার পর হযরত মাওলানা ফখরুদ্দীন আহমাদ মুরাদাবাদী বলেনঃ যদি কোন দলের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাও যে, তারা হকের উপর আছে কিনা? তাহলে এটা যাচাই করো যে ‘তারা সাহাবায়ে কেরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে করে কিনা? সাহাবায়ে কেরাম এর ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী? তাহলে বুঝা যাবে যে তারা হক থেকে কতটুকু দূরে বা কাছে রয়েছে।

এ মাপকাঠির ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই যে, হিজরী প্রথম শতাব্দীতে মুতাযেলা, খাওয়ারেজ, রাওয়াফেয এর আবির্ভাব ঘটে, তাদের সকলেই সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বিরূপ ও জঘন্য আক্বীদা পোষণ করতো, তারা সাহাবায়ে কেরামকে গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেছে, আবার কোনো কোনো সাহাবীকে কাফের পর্যন্ত সাব্যস্ত করেছে। (নাঊযুবিল্লাহ্) তারা কোনো সাহাবীকে মর্যাদা দিতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করেছে, আবার কোনো সাহাবীকে দোষারোপ করে বাস্তব মর্যাদা থেকে অনেক নিচু

স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। এই শেষ যমানায়ও নতুন কিছু দলের আবির্ভাব ঘটেছে, আমি সুনির্দিষ্টভাবে দু'টি দলের কথা বলবো।

একটি দল হল 'জামায়াতে ইসলামী', আমাদের আকাবির এর সাথে তাদের কোন ধরনের সম্পর্ক ছিল না, যদিও আমাদের একদল বিজ্ঞ আলেম, গ্রন্থ প্রণেতা ও ইসলাহী মুরব্বী মওদুদীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.কে উত্তম প্রতিদান দান করুন, তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও ঈমানী দূরদর্শিতার দ্বারা আচঁ করতে পারলেন যে, তারা সুন্দর লিখনি ও পোশাক-পরিচ্ছেদের অন্তরালে ঘাপটি মেরে ছিল। তাদের প্রথম প্রকাশনার মধ্যে লিখিত ছিল: 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ব্যতীত কাউকেও সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা যাবে না, বরং প্রত্যেককেই আল্লাহ প্রদত্ত মাপকাঠির উপর রাখতে হবে। কথা তো খুব সুন্দর। কিন্তু হযরত হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. প্রশ্ন উত্থাপন করে বসলেন যে, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে কী বলেন?, তারাও কি সাধারণ উম্মতের ন্যায়, তাদেরও কি কাজকর্মের সমালোচনা করা যাবে যেমনি ভাবে সাধারণ মানুষের বেলায় করা যায়? তারা উত্তরে বললোঃ হ্যাঁ। এ কারণেই দেখা যায় যে, তারা প্রথম সারির সাহাবায়ে কেরাম যথা উমর রাযি. উসমান রাযি. আমর বিন আস রাযি. আয়েশা রাযি. মুআবিয়া রাযি. প্রমুখ বিখ্যাত সাহাবিকে নির্মমভাবে সমালোচনার পাত্র বানিয়েছিলো, তাদের কাছে এ বিষয়ে জবাবদিহিতা করা হলে তারা বললো যে, মানুষের অন্তরে উপরোক্ত সাহাবাদের সম্মানের ভূত এমনভাবে চেপে বসেছে যে, যতক্ষণ না তাদেরকে সমালোচনার তীরে বিদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের অন্তর থেকে সেই ভূত অপসারণ করা সম্ভব হবে না। (নাঊযুবিল্লাহ)

আরেকটি দল হলোঃ 'আহলুল হাদীস', অর্থাৎ যারা শরীয়ত স্বীকৃত চারটি মূলনীতি থেকে দু'টি মূলনীতি ইজমা ও কিয়াসকে বর্জন করে আর বাকী দু'টি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসের অনুসরণের দাবী করে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাষ্য "ما أنا عليه وأصحابي" অর্থাৎঃ আমি ও আমার সাহাবাগণ যে পথে রয়েছেন তা তোমরা আঁকড়ে ধরো।" এর আলোকে উল্লেখিত চারটি বিষয়ই শরী'আতের মূলনীতি হিসেবে সু-প্রমাণিত। এরাই আবার এমন সব মাসআলাতে দ্বিমত পোষণ করে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্ থেকে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেছে, যার সবক'টিই সাহাবায়ে কেরাম পর্যন্ত বিশুদ্ধ ও নিরবচ্ছিন্ন বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত।

উদাহরণ স্বরূপ:

তারাবীহ এর নামায বিশ রাকা'আত হওয়ার সিদ্ধান্ত হযরত উমর রাযি. এর যুগের সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এর সম্মতি ও ঐক্যমতে গৃহীত হয়।

জুম'আর নামাযের প্রথম আযান এর সিদ্ধান্ত হযরত উসমান রাযি. এর যুগের সকল সাহাবার ঐক্যমতে হয়।

এক মজলিসে তিন তালাক দেওয়ার দ্বারা তিন তালাকই সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে হযরত উমর রাযি. এর যুগের সকল সাহাবায়ে কেরাম এর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়।

এ সব মাসআলা সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম এর সম্মিলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কার্যকর হয়ে ক্রমাগতভাবে আমাদের নিকট পৌঁছেছে, এতে কারো কোনো দ্বিমত ছিল না, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. অর্থাৎঃ সাহাবায়ে কেরাম এর কর্মপদ্ধতিকে দৃঢ়তার সাথে আঁকড়ে ধরো। আমরা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার অনুসরণ করছি, আমাদের তো এই স্পর্ধা ও দুঃসাহস নেই যে, হযরত উমর রাযি. কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত কোনো সিদ্ধান্তকে 'বিদআতে উমরী' বলবো, অথবা উসমান রাযি. কর্তৃক সম্মিলিত কোনো সিদ্ধান্তকে 'বিদআতে উসমানী' বলবো। এটাই হলো আমাদের আকাবির এর আদর্শ।

সুতরাং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমাদের করণীয় হলোঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে যে মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে গিয়েছেন তাদের সেই মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সচেষ্ট থাকা ও তাদেরকে সেই স্তরেই সমাসীন রাখা, তাদের সিদ্ধান্ত, বর্ণনা ও সর্বসম্মত ঐক্যকে তদ্রুপভাবেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করা, যেরূপে কুরআন ও সুন্নাহকে বাস্তব নির্দেশ ও মূলনীতি সাব্যস্ত করা হয়। এভাবেই আমাদের আকাবির সুন্নাতের অনুকরণের সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করে থাকতেন।

তদ্রুপভাবে তাযকিয়াহ ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা ও এটাকে বিদআত বলা মারাত্মক গোমরাহী। বস্তুত এটি হলো ইসলামের নির্দেশ, হাদীসে জিবরাঈলের সুস্পষ্ট ভাষ্য: জিবরাইল আ. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে মানুষের আকৃতিতে এসে জিজ্ঞেস করলেনঃ أخبرني عن الإيمان আমাকে ঈমান সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করলেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করলেনঃ أخبرني عن الإحسان আমাকে ইহসান সম্পর্কে বলুন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ ان تعبدالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. অর্থ: এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে দেখছো এটা ভাবতে না পারো, তাহলে মনে রাখবে যে, অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন। উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য 'ঈমান' ও 'ইসলাম' এর পর স্বতন্ত্রভাবে 'ইহসান' সম্পর্কেও প্রশ্নোত্তর করেছেন, এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'ইহসান' একটি স্বতন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: فأحسنوا،إن الله يحب المحسنين. অর্থ:তোমরা 'ইহসান' করো, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 'ইহসানকারীদের'কে পছন্দ করেন।

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ! এই ইহসানই হলো তাসাওউফ ও সুলূক তথা আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মবাদ, এটাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস إنما الأعمال بالنيات. (অর্থ: যাবতীয় আমলের প্রতিদান নিয়তের উপরই নির্ভরশীল) এর মাধ্যমে, এটাই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী أن تعبدالله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. (অর্থ: এমনভাবে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছো, আর যদি তুমি তাঁকে দেখছো এটা ভাবতে না পারো তাহলে মনে রাখবে যে, অবশ্যই তিনি তোমাকে দেখছেন।) এর মাধ্যমে, চরিত্র সংশোধনের জন্য এটারই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এ লক্ষ্যেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরাধামে আগমন করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو عليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. অর্থ: তিনিই সেই সত্তা যিনি নিরক্ষরদের মাঝে রাসূল প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্য থেকেই, যে তাদের কাছে আয়াত পাঠ করবে এবং তাদেরকে কুরআন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে এবং তাদের আত্মার সংশোধন করবে, এখানে আল্লাহ তা'আলা কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দানের মাধ্যমে আত্মার সংশোধনের কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার রয়েছে। তিনি আরও ইরশাদ করেন: ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে বকরীর পালে ছেড়ে দিলে ততটা ক্ষতিসাধন হয় না, অর্থ ও পদের লালসা দ্বারা ইসলামের যতটা ক্ষতিসাধন হয়।

যদি পন্থা বলে দেওয়াটাই আত্মশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট হত, তাহলে সেটা ' ويعلمهم الكتاب والحكمة অর্থাৎ; তাদেরকে কুরআন ও প্রজ্ঞা শিক্ষা দিবে' এর মধ্যেই এসে গেছে, তো ভিন্নভাবে 'ويزكيهم অর্থাৎঃ এবং তাদের আত্মার সংশোধন করবে' এটা সংযোজন করার কীইবা প্রয়োজন ছিলো? এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, 'তাযকিয়াহ' তথা আত্মশুদ্ধির আমল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তাবে তাবিঈন সকলেই করেছেন, এবং ক্রমাগতভাবে এটি দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে উম্মতের প্রতিটি স্তরে বিদ্যমান ছিল, এরই ধারাবাহিকতায় বিদআত ও বানোয়াট মুক্ত এই বিশুদ্ধ তাসাওউফ ও আত্মশুদ্ধি আমাদের আকাবির এর কর্মপন্থারই অংশ হিসেবে ছিল। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. ছিলেন এই আধ্যাত্মিক জগতে আমাদের সকলের শিরোমণি, আর কাসেম নানুতবী রহ., রশীদ আহমাদ গঙ্গুহী রহ., আশরাফ আলী থানবী রহ. ছিলেন সরাসরি তার অনুমতিপ্রাপ্ত খলীফা ও শিষ্য। থানবী মাদানী সাহারানপুরী সহ হেদায়াতের যাবতীয় সিলসিলা তার সাথে গিয়েই একীভূত হয়েছে।

বিশুদ্ধ তাওহীদ, রাসূলপ্রেম, সুন্নাতের অনুকরণ, সাহাবায়ে কেরাম এর সম্মান ও তাদের প্রতি সঠিক আক্বীদা পোষণ করা আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শ, আর সমগ্র দ্বীনী ও কওমী মাদরাসাসমূহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট বড় বড় মাশায়েখবৃন্দ যারা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, তারা সকলেই উক্ত আদর্শের ধারক-বাহক, তারা একদিকে হাদীসের মসনদে শাইখুল হাদীসের আসনে অধিষ্ঠিত, অন্যদিকে খানকার মধ্যে মুরশিদ ও পথ প্রদর্শক এর ভূমিকায় অবতীর্ণ, একদিকে অসংখ্য ইলম পিপাসু তাদের থেকে উপকৃত হচ্ছেন, অপরদিকে সাধারণ মানুষ বাতিলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে ধন্য হচ্ছেন।

সুতরাং প্রিয় ভাইগণ! এই নিসবতকে মূল্যায়ন করুন, এর গুরুত্ব অনুধাবন করুন, এই দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বাত্মকভাবে সচেষ্ট থাকুন, সর্বদা এর সহযোগিতা করুন, উলামায়ে কেরামের দরবারে বেশি বেশি উপস্থিত হোন, তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখুন, তাদের কথাবার্তা ও যাবতীয় দিক নির্দেশনা মেনে চলার জন্য সদা সচেষ্ট থাকুন, তাহলে আশা করা যায় এই ফেৎনা-ফাসাদের যুগেও এটাই হবে আমাদের হেদায়াতের পথ, এটাই হবে আমাদের মুক্তির পথ, ইনশাআল্লাহ্।
আপনাদের নিকট সংক্ষিপ্ত এই কথাগুলো পেশ করে এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

নামাযের ওয়াক্ত

আল্লাহ তা'আলা নামাযকে সময়ের সাথে খাস করে দিয়েছেন। প্রত্যেক নামাযের নির্ধারিত সময় রয়েছে। প্রত্যেক নামাযকে তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করা ফরয। গ্রহণযোগ্য কোনো ওযর ছাড়া এক নামায অন্য নামাযের সময়ে আদায় করলে কবীরা গুনাহ হবে। সবাই যেন নামাযের সঠিক সময় জেনে সময় মতো নামায আদায় করতে পারে সেজন্যই আমাদের এই প্রয়াস।

হুজুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মে'রাজ থেকে এসে নামাযের প্রাকটিক্যাল ট্রেনিং, নামাজের ওয়াক্ত এসব কিছু সাহাবাদের রা. যুহরের সময় জানালেন। ফজরের সময় যেহেতু সকলকে একত্র করা কঠিন ছিল, তাই এসব কিছু যুহর থেকে শুরু করলেন। এজন্য হাদীসের কিতাবেও নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা যুহর থেকে শুরু করা হয়েছে।

যুহরের ওয়াক্ত: দ্বিপ্রহর থেকে সূর্য যখন একটু পশ্চিম দিকে হেলে যায় তখন যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয়। এবং প্রতিটা জিনিসের আসল ছায়া ব্যতীত তার ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যুহরের ওয়াক্ত থাকে। জুম'আ আর যুহরের নামাযের ওয়াক্ত এক ও অভিন্ন। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪২৩)

বি.দ্র.: ঠিক দুপুরে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া যে পরিমাণ থাকে তাকে ঐ জিনিসের আসল ছায়া বলা হয়। কোনো ইমামের মতে আসল ছায়া ছাড়া প্রত্যেক জিনিসের ছায়া যখন একগুণ হয়ে যায় তখনই যুহরের সময় হয়ে যায়। আমাদের হানাফী মাযহাবের ফাতাওয়া এমন না। তাই একান্ত অপারগতা ছাড়া এই মতের উপর আমল করা যাবে না।

যুহর ও জুম'আর নামাযের উত্তম সময়ঃ শীত কালে যত তাড়াতাড়ি যুহরের নামায পড়া যায় তত ভাল। গরমের দিন এক মিছিলের শেষ চতুর্থাংশে পড়া ভাল। তবে জুম'আর নামায সব মৌসুমে আউয়াল ওয়াক্তে পড়া উত্তম। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪২৯)

জুম'আর নামাযের উত্তম সময়ঃ যখন যুহরের সময় হবে তখন সাথে সাথে আযান হবে এবং তখনই মসজিদে রওনা করা জরুরী হয়ে যাবে। তিনটি জিনিস এক সাথে হবে: ১. ওয়াক্ত হওয়া ২. আযান হওয়া ৩. মসজিদে রওনা হওয়া। তারপর ১৫/২০ মিনিট বা সর্বোচ্চ আধা ঘণ্টা বয়ান হবে। বয়ান চলাকালীন যাদের উযূ প্রয়োজন তারা উযূ করে নিবে। বয়ান শেষে জুম'আর দ্বিতীয় আযান হবে। আযান শেষ হলে খুতবা তারপর ফরয নামায হবে। সাধারণত শীতকালে দিন ছোট হওয়ার কারণে একটু আগে ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। সর্বোচ্চ দুপুর সোয়া একটা থেকে দেড়টার মধ্যে পুরো নামায শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু জুম'আর আগে বয়ানের জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যায় না তাই নামায শেষে পুনরায় দীনী বয়ান বা মাসআলা মাসায়েলের আলোচনা হতে পারে।

জুম'আর নামায: জুম'আর নামায মোট বার রাকা'আত। কাবলাল জুম'আ চার রাকা'আত, ফরয দুই রাকা'আত, বা'দাল জুম'আ চার রাকআত, ওয়াক্তিয়া সুন্নাত দুই রাকা'আত। কোনো কোনো বড় গ্রামে এখনও আখেরী যুহর বা এহতিয়াতি যুহর পড়ে, এগুলি জায়েয নেই। বাংলাদেশের বড় গ্রামগুলো শহরের হুকুমে। সেখানে আখেরী যুহর পড়লে গুনাহ হবে। হ্যাঁ, এখনো যদি কোনো অজপাড়া থাকে যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিস পাওয়া যায় না, রাস্তা ঘাট নেই, দোকান পাট নেই, কম সংখ্যক লোক ব্যবসা করে তাহলে তারা জুম'আ ও ঈদ পড়বে না। সেখানে ভুলক্রমে জুম'আ পড়ে ফেললে চার রাকা'আত ইহতিয়াতি যুহর পড়ে নিবে।

আসরের নামাজের ওয়াক্ত: যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসারের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। এর মাঝখানে কোনো বিরতী নেই। সূর্য অস্থ যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত থাকে। তবে সূর্য ডুবার ১৫ মিনিট আগ পর্যন্ত উত্তম সময়। । (আল বাহরুর রায়েক ১/৪২৫)

আসরের মাকরূহ ওয়াক্ত: সূর্য অস্থ যাওয়ার ১৫ মি. আগ থেকে মাকরূহ সময় শুরু হয়ে যায়। এই সময় নামায পড়লে নামায আদায় হয়ে যাবে কিন্তু মাকরূহ হবে। ইচ্ছা করে এই সময়ে নামায পড়লে গুনাহ হবে। আর যদি এমন হয় যে, কেউ ঐ দিনের

আসরের নামায আদায় করেনি ইতিমধ্যে সূর্য ডুবে যাচ্ছে তাহলে তাকে ঐ সময়ই আসর পড়তে হবে। কিন্তু এটা মাকরূহে তাহরীমা হবে। তবে ফরজের যিম্মাদারি আদায় হয়ে যাবে। । (আল বাহরুর রায়েক ১/৪৩৫)

আসরের উত্তম সময়ঃ আসর সবসময় দেরি করে পড়া ভালো। কেননা আসরের পরে কোনো নফল পড়া যায় না। সুতরাং আসরের সময় হওয়ার প্রায় আধাঘণ্টা বা পোনে এক ঘণ্টা পরে আসর পড়বে। যাতে আসরের আগে বেশি করে নফল পড়া যায়। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪২৯)

মাগরিবের ওয়াক্ত: বেলা সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত এবং ইফতারের ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। (ইফতার দেরি করে করা মাকরূহ) মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার সাথে সাথে আযান ইকামাত দিয়ে নামায আদায় করা উত্তম। পশ্চিম আকাশ বেশ কিছু সময় লালিমা থাকে, এই লালিমা শেষ হওয়ার পর একটু সাদা ভাব হয়। সাদা ভাব শেষ হওয়ার পর আকাশ কালো হতে শুরু করে। আকাশ কালো হওয়ার আগ পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। অর্থাৎ আকাশের অবস্থা যতক্ষণ লাল ও সাদা মিশ্রিত থাকে ততক্ষণ মাগরিবের ওয়াক্ত থাকে। মাগরিবের সময় প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। আমাদের দেশের অনেকে মনে করে মাগরিবের সময় ১৫-২০ মি. থাকে। যার কারণে এই সময়ের ভিতর মাগরিব পড়তে না পারলে আর পড়ে না। মনে করে কাযা যখন হয়ে গেল তখন পরে এক সময় পড়ে নিব। অথচ সোয়া এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে নামায পড়লেও আদায় হয়ে যাবে। কোনো ইমামের মতে লাল শেষ হয়ে সাদা শুরু হওয়ার সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হয়ে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। আমাদের হানাফী মাযহাবে এ মতের উপর ফাতাওয়া নয়। তাই একান্ত ঠেকা ছাড়া ঐ সময়ে ইশা পড়বে না। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪২৫-২৬)

মাগরিবের উত্তম সময়ঃ মাগরিব নামায ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে পড়া উত্তম। কিন্তু রমযান মাসে একটু দেরি করে পড়তে বলা হয়েছে। যাতে আগে ইফতার করে নেয়া যায়। কারণ আগে ইফতার করতে পারলে নামায খুশু-খুযুর সাথে হবে। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪৩১

ইশার নামাযের ওয়াক্ত: মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। ইশার ওয়াক্ত ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত থাকে। তথা সাহরীর ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত থাকে। (আল বাহরুর রায়েক ১)

ইশার উত্তম সময়ঃ রাতের এক তৃতীয়াংশের শেষের দিকে ইশা পড়া উত্তম। অর্থাৎ ইশার সময় হওয়ার সোয়া এক থেকে দেড় ঘণ্টা পরে ইশা পড়া উত্তম। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪৩০)

ইশার মাকরূহ সময়ঃ বিশেষ কোনো ওযর ছাড়া মধ্য রাতের পরে ইশা পড়া মাকরূহ। রুগীর সেবা ওযরের মধ্যে গণ্য হতে পারে কিন্তু ওয়ায মাহফিল ওযরের মধ্যে গণ্য

হবে না। তাই ওয়ায মাহফিলেও যথা সময়ে ইশার নামায আদায় করা জরুরী। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪৩১)

ফজরের ওয়াক্ত: সুবহে সাদিক থেকে নিয়ে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে। পূব আকাশের উত্তর-দক্ষিণে যখন সাদা একটা আলো ছড়ায় তখন ফজরের ওয়াক্ত হয়। সূর্যের কিনারা দেখা পর্যন্ত ফজরের ওয়াক্ত থাকে। ফজরের সময়ের মধ্যেও মাগরিবের মতো আকাশ সাদা ও লাল হয়। ফজরে প্রথমে আকাশ সাদা হয় তারপর লাল হয় আর মাগরিবে প্রথমে লাল হয় এরপর সাদা হয়। ফজরের সময়ও প্রায় সোয়া এক ঘণ্টা থেকে দেড় ঘণ্টা পর্যন্ত থাকে। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪২৩)

ফজরের উত্তম সময়ঃ ফজরের সময় আলো উত্তর-দক্ষিণে ছড়িয়ে যাওয়ার পরে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজর পড়তে বলেছেন। এ সময় ফজর পড়া উত্তম এবং বেশি সাওয়াব লাভের কারণ। কিন্তু রমযান মাসে আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ার মধ্যে বেশি সাওয়াব। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪২৮-২৯)

ইশরাকঃ সূর্য উঠা শুরু হওয়া থেকে নিয়ে ১৫-২০মি. পর এই নামাযের সময় শুরু হয় এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এর সময় থাকে। সময় হওয়ার পর পর ইশরাক পড়া ভাল। এই নামায নফল। দুই চার রাকা'আত যা পারা যায় পড়া। এই নামায যে পড়ে, সারা দিনের সমস্ত প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। (আততারগীব ওয়াত তারহীব হা.নং ১০০৯)

চাশত: ইশরাক এবং চাশতের নামাযের সময় এক। তবে বেলা এগারটার দিকে চাশতের নামায পড়া ভাল। চাশতের নামায সর্বোচ্চ বার রাকা'আত। এই নামাযও নফল। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১২৪)

যাওয়ালঃ যখন যুহরের ওয়াক্ত শুরু হয় তখন সাথে সাথে যাওয়ালের ওয়াক্ত শুরু হয়। যাওয়ালের নামায ২-৪ রাকা'আত। এই নামাযকে দিনের বেলার তাহাজ্জুদ বলা হয়। এর নেকীও তাহাজ্জুদ নামাযের মতো এবং হাদীসে এসেছে, এই সময়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আসমানে সব দরজা খুলে দেন। (আততারগীব ওয়াত তারহীব হা.নং ৮৫৭,৮৫৯,৮৬২)

আউয়াবীনঃ মাগরিবের ফরযের পর এই নামায। মাগরিবের দুই রাকা'আত সুন্নাত ছাড়া ছয় রাকা'আত পড়তে পারলে উত্তম। তবে মাগরিবের দুই রাকা'আত সুন্নাতসহ পড়লেও হবে। (গুনইয়াতুল মুতামালি পৃ.৪৩০)

তাহাজ্জুদ: এই নামায রাতে ঘুম থেকে উঠে পড়তে হয়। উত্তম হলো শেষ রাতে পড়া। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পূর্ণ সুস্থ ছিলেন তখন আট রাকা'আত পড়তেন। যখন একটু বয়স বাড়লো তখন ছয় রাকা'আত পড়তেন। যখন আরো বয়স বাড়লো, শরীর ভারী হয়ে গেল তখন চার রাকা'আত পড়তেন। এই নামায ৪-৮ রাকা'আত পড়তে হয়। এই নামায পড়ার জন্য ইশার নামায পড়ে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে

গেলে ভালো হয়। তবে বিশেষ কারণে কেউ যদি এই নামায উত্তম সময়ে পড়তে না পারে তাহলে সে যদি ইশার সুন্নাতের পর বিতিরের আগে দুই চার রাকা'আত তাহাজ্জুদের নিয়তে পড়ে নেয় তাহলে আশা করা যায় এতেও আল্লাহ তা'আলা তাকে তাহাজ্জুদের নেকী দান করবেন। (গুনইয়াতুল মুতামালি পৃ. ৪৩২)

নামাযের মাকরূহ ওয়াক্ত: তিনটি সময় আছে যখন যেকোনো ধরণের নামায, জানাযার নামায ও সিজদায়ে তিলাওয়াত নিষেধ:
১. সূর্য উঠার সময়।
২. সূর্য যখন মাথার ঠিক উপরে থাকে তখন। (ক্যালেন্ডারে দ্বিপ্রহর বলে এই সময়কে বুঝানো হয়)
৩. সূর্য অস্থ যাওয়ার সময়। তবে ঐদিনের আসর না পড়ে থাকলে এই মাকরূহ ওয়াক্তে পড়া যাবে। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪৩২-৩৩)

তিনটি সময় এমন আছে যখন নফল নামায পড়া মাকরূহ। তবে ঐ সময়ে কেউ উমরী কাযা পড়তে চাইলে পড়তে পারবে।

১. ফজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ফজরের সুন্নাত ছাড়া অন্য কোনো সুন্নাত বা নফল পড়া যায় না। এমনিভাবে ফজরের ফরয নামায পড়ার পর থেকে নিয়ে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত কোনো নফল নামায পড়া যায় না।

২. সূর্য্য যখন উঠতে শুরু করে তখন থেকে ১৫ মি. পর্যন্ত নফল নামায পড়া যায় না।

৩. আসরের নামায পড়ার পর থেকে সূর্য অস্থ যাওয়া পর্যন্ত কোনো নফল পড়া যায় না। (আল বাহরুর রায়েক ১/৪৩৭)

প্রচলিত আযানের শরয়ী বিধান

বর্তমানে আমাদের দেশে অধিকাংশ মসজিদে লক্ষ্য করা যায় যে, আযানের মধ্যে মাদ্দের (টানের) ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা হয়। তাজবীদের কায়েদা অনুসরণ না করেই যেখানে এক আলিফ থেকে বেশি টানা নিষেধ সেখানে তিন চার আলিফ পর্যন্ত টানা হয়। আর যেখানে শেষে তিন আলিফ মাদ্দ আছে সেখানে মুআয্যিনের দম শেষ না হওয়া পর্যন্ত টানতে থাকে। অথচ নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে এই তরীকার আযানকে নিকৃষ্ট বিদ'আত ও মাকরূহে তাহরীমী পর্যন্ত বলা হয়েছে। এবং এই ধরণের আযানদাতাকে জাহিল আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে নিম্নে নির্ভরযোগ্য কয়েকটি কিতাবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলোঃ

১. وحده مقدار الف وصلا و وقفا ونقصه عن الف حرام شرعا فيعاقب على فعله ويثاب على تركه فما يفعله بعض ائمة المساجد واكثر المؤذنين من الزيادة فى المد الطبعى عن حده العرفى اى عرف القراء فمن اقبح البدعة واشد الكراهة لاسيما وقد يقتجى بهم بعض الجهلة من القراء. نهاية القول المفيد فى علم التجويد للشيخ محمد مكى نصر ص (১৬৬كلمات اذان مين مد كى تحقيق لابى الحسن الاعظمى, مجالس ابرار ص(১৩৫

আনুবাদঃ মাদ্দে ত্ববাঈর পরিমাণ হল এক আলিফ। চাই তাতে ওয়াক্‌ফ করা হোক বা মিলিয়ে পড়া হোক। মাদ্দে ত্ববাঈতে এক আলিফ থেকে কম টানা হারাম। কেউ এমনটা করলে তাকে পাকড়াও করা হবে। আর এক আলিফ থেকে কম টানা ছেড়ে দেওয়ার কারণে সাওয়াব লেখা হবে। কাজেই কিছু কিছু মসজিদের ইমামগণ এবং অধিকাংশ মুআয্যিনগণ মাদ্দে ত্ববাঈকে কিরাআতের পরিভাষায় তার প্রচলিত সীমা থেকে বেশি টেনে থাকেন এটা নিকৃষ্টতম বিদ'আত এবং শক্ত পর্যায়ের মাকরূহ। বিশেষত যখন তাদেরকে কিছু মূর্খ কারীগণ অনুসরণ করে থাকেন। (নেহায়াতুল কাওলুল মুফীদ ফী ইলমিত তাজবীদ পৃ.১৬৬) (কালিমায়ে আযান মে মাদ্দ কি তাহকীক, মাজালিসে আবরার পৃ.১৩৫)

২. فانه لايجوز قصر احدهما عند جميع القراء ولو قرأ بالقصر يكون لحنا جليا و خطأ فاحشا مخالفا لما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم بالطرق المتواترة, و كذا اذا زاد فى المد الاصلى والطبعى على مد العرفى من قدر الف بان جعله قدر الفين او اكثر كما يفعله اكثر الائمة من الشافعية و الحنفية فى الحرمين الشريفين فانه محرم قبيح لاسيما وقد يقتدى بهم بعض الجهلة و يستحسن ماصدر عنهم من القراءة. (المنح الفكرية شرح مقدمة الجزرية ص(৫৬

অনুবাদ: মাদ্দে ওয়াজিব এবং মাদ্দে লাযেমে সকল কারীদের নিকট মাদ্দ ছেড়ে দেওয়া বা কম করা নাজায়েয। যদি তা মাদ্দ ছাড়া পড়া হয় তাহলে লাহনে জলী এবং মারাত্মক ভুল হবে এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুতাওয়াতিরভাবে যা প্রমাণিত তার বিপরীত হবে। অনুরূপ হুকুম হবে যখন মাদ্দে আসলী ও মাদ্দে ত্ববাঈকে এক আলিফ থেকে বেশি টানা হবে। অর্থাৎ দুই আলিফ বা তার চেয়ে বেশি টানা হয়। যেমনটি করে থাকে হারামাইন শরীফাইনের হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাবের অধিকাংশ ইমামগণ। এটা নিকৃষ্ট হারাম... (আল মিনাহুল ফিকরিয়্যাহ শরহু মুকদ্দামাতিল জাযরিয়্যাহ পৃ.৫৬)

৩. ويترسل فيه اى يتمهل بلا لحن وترجيع... فلا ينقص شيئا من حروفه ولايزيد من كيفيات الحروف كالحركات و السكنات و المدات و غير ذالك لتحسين الصوت. شرح الوقاية ১৩৪/১

অনুবাদ: আর আযান দিবে ধীরে ধীরে কোনো লাহন (মাদ্দের অতিরিক্ত টানা) ও তারজী (প্রথমে আস্তে পরে বড় আওয়াজে বলা) ছাড়া। সুতরাং আযানের মধ্যে কোনো হরফ কমাবে না এবং তার মধ্যে কোনো হরফ বাড়াবে না। অনুরূপভাবে আওয়াজকে সুন্দর করার জন্য হরফের অবস্থার মধ্যে বাড়াবে-কমাবে না যেমন: হরকত, সাকিন, মাদ্দ ইত্যাদি। (শরহে বেকায়া ১/১৩৪)

উল্লেখ্য এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আযানের মধ্যে মাদ্দ বাড়াবে না কমাবে না। সুতরাং আল্লাহু আকবার এর লামের মধ্যে এক আলিফ মাদ্দকে অধিকাংশ মুআয্যিনগণ যে ৩/৪ আলিফ টানতে থাকেন তা নিঃসন্দেহে ভুল এবং সুন্নাতের খেলাফ। ৬০৪/৯

৪. والترجيع بالقران و الاذان بالصوت الطيب طيب ان لم تزد فيه الحروف وان زاد كره له. الدر المختار

অনুবাদ: সুমিষ্ট আওয়াজে টেনে টেনে কুরআন পড়া এবং আযান দেয়া উত্তম যতক্ষণ না তার ভেতর হরফ বাড়ানো হয়। আর যদি হরফ বাড়ানো হয় তবে তা মাকরূহ। আদ্দুরুল মুখতার ৯/৬০৪

আর একথা স্পষ্ট যে, মাদ্দকে তার গন্ডি থেকে বাড়িয়ে দিলে অবশ্যই সেখানে কোনো না কোনো হরফ বৃদ্ধি পাবে। যা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে সক্ষম।

৫. وفى الذخيرة وان كانت الالحان لاتغير الكلمة عن وضعها و لاتؤدى الى تطو يل الحروف التى حصل التغنى بها حتى يصير الحرف حرفين بل لتحسين الصوت و تزيين القراءة لايوجب فساد الصلاة و ذالك مستحب عند نا فى الصلاة وخارجها. رد المحتار ৬০৪/৯

অনুবাদ: যদি সূর শব্দের গঠনে পরিবর্তন না আনে এবং হরফকে লম্বা না করে যেমন: এক হরফকে দুই হরফ বানিয়ে দেয়া; বরং সূর আওয়াজ ও কিরাআতের সৌন্দর্য করণের জন্য হয় তাহলে, তা নামাযকে ফাসেদ করবে না। এটা আমাদের নিকট নামাযে এবং নামাযের বাহিরে মুস্তাহাব। (রদ্দুল মুহতার ৯/৬০৪)

৬. ويكره التلحين و هو التغنى بحيث يؤدى الى تغير كلماته كذا فى شرح المجمع لابن الملك و تحسين الصوت للاذان حسن ما لم يكن لحنا كذا فى السراجية. الفتاوى الهندية ৫৬/১

অনুবাদ: তালহীন করা মাকরূহ। আর তালহীন হলো এমনভাবে সূর দেয়া যে, তা শব্দের গঠনে পরিবর্তন আনে। আযানের জন্য আওয়াজকে সুন্দর করা পছন্দনীয়, যতক্ষণ না তা শব্দের ভেতর পরিবর্তন নিয়ে আসে। (ফাতাওয়ায়ে আলমগিরী ১/৫৬)

উল্লেখ্য মাদ্দের মধ্যে কম-বেশি করলে শব্দের গঠনের ভেতর পরিবর্তন আসে। সুতরাং প্রত্যেক মাদ্দকে তার নিয়ম অনুযায়ী টানা জরুরী। সুর করার জন্য বেশি টানা যাবে না।

৭. قال الشيخ اللكنوى فى السعاية على قول شرح الوقاية : قوله فلا ينقص شيئا من حروفه الخ هذا بظاهره يفيد انه يكره التلحين فى جميع كلمات الاذان و عليه الجمهور. السعاية ১৫/১

অনুবাদ: শরহে বেকায়ার উক্তি ‘সুতরাং আযানের হরফসমূহের মধ্যে কোনো হরফকে (যেখানে মাদ্দ আছে সেখানে মাদ্দ না করার দ্বারা) কমাবে না...’ উল্লেখিত উক্তি দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, আযানের যেকোনো বাক্যে কোনো হরফকে পরিবর্তন করা মাকরূহ। আর এটাই জমহূরের মত। (আসসিআয়াহ ১/১৫)

৮. التغنى و الترنم فى الاذان بالطريقة المعروفة عند الناس فى زما ننا هذا لايقرها الشرع لانه عبادة يقصد منها الخشوع لله تعالى ... الحنفية قالوا ঃ التغنى بالاذان حسن الا اذا ادى الى تغيير الكلمات بزيادة حركة او حرف فانه يحرم فعله ولايحل سماعه. كتاب الفقه على المذاهب الاربعة ৩৯১/১

বর্তমানে প্রচলিত নিয়মে যেভাবে আযান দেওয়া হয়, শরীয়ত তা সমর্থন করে না। কারণ আযান এমন একটি ইবাদত যার মধ্যে খুশু-খুযু কাম্য। হানাফীদের নিকট সুন্দর আওয়াজে আযান দেওয়া উত্তম। তবে এটা যেন শব্দের মধ্যে পরিবর্তন না

আনে যেমন, হরকত বা হরফ বাড়িয়ে দেওয়া। কারণ এমনটি করা হারাম এবং এমন আযান শোনা তথা সমর্থন করা জায়েয নয়।

৯. বুখারী শরীফের কিতাবুল আযানে আছে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. যিনি এই উম্মতের প্রথম মুজাদ্দিদ ছিলেন তিনি তার মুআয্যিনকে বললেন, اذن اذانا سمحا والا فاعتزلنا 'সাদাসিধে আযান দাও অন্যথায় আযান দেওয়া বন্ধ করো' । (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আযান, বাবু রফউস সাওতি বিন্নিদা)

বর্তমান যামানায় মাদ্দের মধ্যে বৃদ্ধি করে যেভাবে রং-ঢং এর আযান দেওয়া হচ্ছে আবার অনেকে গানের সূরে আযান দিচ্ছে তা কোনো অবস্থায় বুখারী শরীফের এই হাদীস অনুযায়ী হচ্ছে না। বরং তা মুআয্যিনদের খামখেয়ালী ও মনগড়া খেলাফে সুন্নাত আযান। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের অনুসারীদের জন্য বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা উচিৎ এবং সর্বত্র সাদাসিধে সুন্নাত তরীকার আযান চালু করা উচিৎ।

অনেকে কারী ফাতাহ মুহাম্মাদ রহ. এর কিতাব 'মেফতাহুল কামাল শরহু তুহফাতিল আতফাল' এর বরাত দিয়ে মুফীদুল আকওয়াল এবং ফাতহুল মালিকিল মুতাআ'ল নামক কিতাবদ্বয়ের নিম্নোক্ত এবারত পেশ করে থাকেন:

وله سبب معنوى كالتعظيم ولاجله اجاز الفقهاء مد الف الجلالة اربع عشرة حركة فى الله اكبر.

'মাদ্দের আভ্যন্তরীন কারণ রয়েছে যেমন মাদ্দে তা'যীম। আর এ কারণেই ফুকাহায়ে কেরাম আল্লাহু আকবারে আল্লাহু শব্দে সাত আলিফ পর্যন্ত টানার অনুমতি দিয়েছেন।' অথচ ফিকহের নির্ভরযোগ্য কোনো কিতাবে কোনো ফকীহ আল্লাহু আকবার এর আল্লাহু শব্দে সাত আলিফ পর্যন্ত টানার অনুমতি দিয়েছেন এমনটি পাওয়া যায় না।

আর আল্লাহু শব্দকে মিলিয়ে পড়ার সময় সাবাবে মা'নাবী এর কথা বলে এক আলিফ থেকে বেশি টানা একাধিক কারণে সঠিক নয়:

১. এটা একটা দুর্বল কারণ অর্থাৎ সাবাব টি সাবাবে যয়ীফ।
২. আহলে আরব সাবাবে মা'নবী এর কারণে যে মাদ্দে তা'যীম এর কথা বলে থাকে তা লায়ে নাফী জিন্স এ ব্যবহৃত হয়। যাতে নাফী এর মধ্যে মুবালাগা হয়। যেমন: لااله الاانت। মুহাক্কিক ইবনুল জাযরী রহ. মাদ্দে তা'যীমীকে আল্লাহু শব্দে বলেননি। তিনি বলেন,

واما السبب المعنوى فهو قصد المبالغة فى النفى وهو سبب قوى مقصود عند العرب وان كان اضعف من السبب اللفظى عند القراء ومنه مد التعظيم نحو لااله الاالله,لااله الاهو

'আর মাদ্দের আভ্যন্তরীন কারণ, তা হল না সূচককরনকে অতিরঞ্জন করা। এটা আরবদের নিকট একটা শক্তিশালী কারণ। যদিও তা কারীদের নিকট শাব্দিক কারণ থেকে দুর্বল। আর এর মধ্য থেকে হচ্ছে মাদ্দে তা'যীম যেমনঃ لااله الاهو لااله الاالله, '

এ ধরনের কিছু ইবারত দেখে মানুষ আযানের মধ্যেও মাদ্দে তা'যীম এর কথা বলে আল্লাহু শব্দে মিলিয়ে পড়ার সময়ও টান শুরু করে দেয়। অথচ এই মাদ্দ লায়ে নাফী জিন্স এর জন্য প্রযোজ্য।

৩. এটা ইমাম শাতেবী রহ. এবং জমহুর কারীদের নিকট আমলযোগ্য নয়।

৪. অধিকাংশ উলামাদের মতে আল্লাহু শব্দে মিলিয়ে পড়ার সময় এক আলিফ থেকে বেশি টানা শুধু নাজায়েয নয় বরং নিকৃষ্ট বিদ'আত বলা হয়েছে। আর কেউ কেউ জায়েয বলেছেন। আর মূলনীতি হলো, যখন কোনো বিষয়ে জায়েয ও নাজায়েয এর মধ্যে সংঘর্ষ হয় তখন না জায়েযকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

অনেকে তাআমুল এর কথা বলে এটা জায়েয বলতে চায়। অথচ যে কোনো তাআমুল দলীল নয়। তাআমুল দলীল হওয়ার জন্য শর্ত হলো তা নস (দলীল) এর খেলাফ না হওয়া। আর উপরে আযান সম্পর্কে স্পষ্ট দলীল উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এই দলীল এর বিরুদ্ধে তাআমুল গ্রহণযোগ্য নয়।

সারকথা হলো আযানে আল্লাহু আকবারের আল্লাহু শব্দের লাম এর মধ্যে মাদ্দে তবাঈ অর্থাৎ এক আলিফ টান হবে। এখানে এক আলিফ থেকে বেশি টানা যাবে না। হ্যাঁ, আল্লাহু শব্দ যখন বাক্যের শেষে আসে অনুরূপভাবে الصلاة الفلاح , তে মাদ্দে আরেযীর কারণে আমাদের কিরাআতে তিন আলিফ এবং অন্য মাযহাব মতে পাঁচ আলিফ পর্যন্ত টানা জায়েয আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক জিনিস জানার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন।

জামা'আতে নফল নামায পড়ার বিধান

নফল নামাযের অর্থ আল্লাহ তা'আলার সাথে একান্তে সাক্ষাৎ। এ জন্য শরীয়তে নফল নামায জামা'আতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। চাই তা রমাযান মাসে হোক বা রমাযানের বাইরে হোক। ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে ইযামের মাসলাক এ ব্যাপারে এমনই। সালাফে সালেহীনের ফাতাওয়া এবং তাদের আমলও এমন ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

তবে তারাবীহের নামায এর ব্যতিক্রম। তারাবীহের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। এটা খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত এবং চৌদ্দশত বছরের ধারাবাহিক আমল ও খিলাফে কিয়াস সাবেত। আর খিলাফে কিয়াস অর্থাৎ সাধারণ নিয়ম বহির্ভূত যে বিধান সাবেত হয় তা তার নিজস্ব পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ থাকে, অন্য বিধানকে তার উপর কিয়াস করা যায় না। তাই এমন বলা চলবে না যে, যেহেতু তারাবীহের নামায জামা'আতের সাথে পড়ার বিধান, সুতরাং কেউ যদি তারাবীহ এর জামা'আত শেষ হওয়ার পর পুনরায় নিজেরা তারাবীহ

পড়তে চায় বা তাহাজ্জুদ নামায জামা'আতে পড়তে চায় তাহলে জামা'আতের সাথে পড়তে পারবে।

কেননা তাহাজ্জুদ তো সব সময়ের জন্যই নফল, আর দ্বিতীয় বারের তারাবীহও সাধারণ নফলে পরিণত হয়েছে, আর সাধারণ নফল নামায জামা'আতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। যেমন বাদায়িউস সানায়ি' ওয়ালা বলেন:

اذاصلوا التراويح ثم ارادوا ان يصلوابها ثانيا يصلى فرادى لابجماعة لان الثانية تطوع مطلق و التطوع المطلق بجماعة مكروه. بدائع الصنائع ১/২৯০

অর্থাৎ যদি লোকেরা তারাবীহর নামায পড়ার পর ২য় বার পড়ার ইচ্ছা করে তাহলে একাকী পড়বে, জামা'আতে পড়বেনা। কেননা ২য় বারের তারাবীহ সাধারণ নফলের ন্যায়, আর সাধারণ নফল জামা'আতে পড়া মাকরূহে তাহরীমী। (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী, ১ম খণ্ড পৃ.১২৩, বাযযাযিয়া ৪র্থ খণ্ড ৩১পৃ.)

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহ.) বলেন, জামা'আতের সাথে নফল পড়া মুস্তাহাব নয়। কারণ সাহাবায়ে কেরাম রমাযানের তারাবীহ ছাড়া এমন করেননি। (শামী ১ম খণ্ড পৃ.৬৬৪)

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. বলেন, কাফী কিতাবের সূর্যগ্রহণের নামায অধ্যায়ে হাকেম শহীদ রহ. ও স্পষ্ট করেছেন, যে তারাবীহ ও সূর্যগ্রহণের নামায ছাড়া অন্যান্য নফল নামায জামা'আতের সাথে পড়া মাকরূহ। (ফাতহুল কাদীর ১ম খণ্ড পৃ. ৪৩৮)

এছাড়া বিবেকের দাবি এটাই যে, নফল নামায একাকী পড়া হবে। কারণ নফল ইবাদতের মধ্যে গোপনীয়তা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ উদ্দেশ্যেই বলেছেন: صلوة المرء في بيته افضل من صلوته في مسجدى هذا الا المكتوبة

অর্থ: কোন ব্যক্তির নফল নামায তার ঘরে পড়া আমার এই মসজিদে (নববী) পড়ার চেয়ে উত্তম, তবে ফরয নামাযের কথা ভিন্ন অর্থাৎ ফরয মসজিদে পড়া জরুরী। (আবূ দাঊদ শরীফ হা. নং ১০৪৪) অন্য হাদীসে আছে: أفضل صلاة الرجل صلاته فى بيته الا المكتوبة

অর্থাৎ ফরয নামায ব্যতীত পুরুষের শ্রেষ্ঠ নামায হলো তার ঘরের নফল নামায । (তাবারানী ৫/১৬০)

শুধু ফরয নামাযকে অন্য সকল নামায থেকে পৃথক করার দাবি হলো তারাবীহের নামাযও অন্যান্য নফলের ন্যায় বাড়িতে একাকী পড়া উত্তম। তবে তারাবীহের নামায সাধারণ নফলের হুকুম থেকে ব্যতিক্রম। কেননা তারাবীহের জামা'আত নবী আলাইহিস সালাম ও সাহাবায়ে কেরাম থেকে প্রমাণিত।

উপরের আলোচনা দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নফল নামায একা পড়তে হয়, জামা'আত বদ্ধ হয়ে নয়। যদি জামা'আত করার অনুমতি থাকত তাহলে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী যুগের উলামায়ে কেরাম নফল নামাযের জামা'আত করা থেকে বিরত থাকতেন না।

এরপরও কোন কোন আলেম শুধুমাত্র রমাযান মাসের তাহাজ্জুদের জামা'আতকে বৈধ বলতে চান। তারা দলীল হিসাবে হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ ও ফিকহের কিতাবের ঐ সমস্ত বর্ণনা পেশ করেন যার মধ্যে তারাবীহকে বুঝানোর জন্য কিয়ামে রমাযান শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে তারা বলেন, কিয়ামে রমাযান যে নামাযের মাধ্যমেই হাসিল হবে এখানে সেই নামাযই উদ্দেশ্য। আর তাহাজ্জুদ দ্বারাও কিয়ামে রমাযান হাসিল হয়। আর কিয়ামে রামাযানে জামা'আত জায়িয হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু সকল উলামায়ে কেরাম একমত, তাই রমাযান মাসে তাহাজ্জুদের মধ্যেও জামা'আত জায়িয।

কিন্তু বাস্তবতা হলো কিয়ামে রমাযান আক্ষরিক অর্থে যদিও ব্যাপক তবে ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনদের পরিভাষা হলো তারা কিয়ামে রমাযানকে শুধু তারাবীহর সাথে নির্দিষ্ট করে থাকেন। তবে তারাবীহ না লিখে কিয়ামে রমাযান কেন লিখেন সে ব্যাপারে আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবারতী রহ. বলেন 'তারাবীহের নামায এর বয়ানের জন্য কিয়ামে রামাযান দ্বারা শিরোনাম করা হয় হাদীসের শব্দের অনুকরণের উদ্দেশ্যে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর রোযা ফরয করেছেন আর আমি তোমাদের জন্য কিয়ামে রমাযানকে সুন্নাত করেছি। (ইনায়া আলা হামিশিল ফাতহিল কদীর ১/৩৩৩)

এছাড়া ফুকাহায়ে কেরামের ইবারত দেখলে বুঝা যায় যে, তারা কিয়ামে রামাযান দ্বারা তারাবীহই উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাহাজ্জুদ নয়। যেমন: হিদায়ার গ্রন্থকার রহ. فصل في التراويح এর স্থলে فصل في قيام رمضان এর শিরোনাম লাগিয়ে তারাবীহর নামাযের আলোচনা শুরু করেছেন। হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলোতেও এমনটি করা হয়েছে। যেমন: ফাতহুল কদীরে মুহাক্কীক ইবনুল হুমাম রহ. কিয়ামে রমাযান শিরোনামে তাহাজ্জুদ এর পরিবর্তে তারাবীহ শব্দের ব্যাখ্যা শুরু করেছেন। যেমন: فصل في قيام رمضان. التراويح جمع ترويحة.... (ফাতহুল কদীর ১ম খণ্ড পৃ.৩৩৩)

'ইনায়া' গ্রন্থে আল্লামা আকমালুদ্দীন বাবারতী রহ. কিয়ামে রমাযান শিরোনাম দিয়ে তারাবীহকে সুনান এবং নাওয়াফেল থেকে আলাদা করার কারণ বর্ণনা করা শুরু করেছেন।

শামসুল আইম্মা সারাখসী রহ. তারাবীহর নিয়তের ব্যাপারে বলেন, সঠিক কথা হলো তারাবীহর নিয়ত করবে অথবা কিয়ামুল্লাইলের নিয়ত করবে। (মাবসূত লিস্সারাখসী ২য় খণ্ড পৃ. ১৪৫)

ফাতাওয়ায়ে কাযীখানে আছে."যদি তারাবীহ অথবা সুন্নাতে ওয়াক্ত বা রমাযানের কিয়ামুল্লাইলের নিয়ত করে তাহলেও জায়িয আছে। (১ম খণ্ড পৃ ২১৬)

এসব ইবারত দ্বারা বুঝা যায় যে, কিয়ামুল্লাইল ও তারাবীহ এক ও অভিন্ন বিষয় যার কারণে তারাবীহের ক্ষেত্রে কিয়ামুল্লাইল বলে নিয়ত করলে ও তারাবীহ হয়ে যাবে।

এমনি ভাবে আল্লামা আনওয়ারশাহ কাশ্মিরী রহ. তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ العرف الشذى এর মধ্যেقيام شهر رمضان এর তাফসীর করেছেন তারাবীহ দ্বারা। (১ম খণ্ড পৃ.৩২৯)

আল্লামা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রহ. আরো স্পষ্ট করে বলেছেন:

باب في قيام شهر رمضان هذا القيام كان عاما ثم اختص بالتراويح فمطلقه يراد به التراويح .

(الكوكب الدرى٢٦٧ঃ١)

অর্থাৎ কিয়ামে রমযান বিষয়টি আগে ব্যাপক ছিল পরে তারাবীহর সাথে খাছ হয়ে গেছে। সুতরাং এখন সাধারণভাবে "কিয়ামে রামাযান" বললে তারাবীহই উদ্দেশ্য হবে। (আল কাউকাবুদ্দুররী ১ম খণ্ড পৃ.২৬৭)

এছাড়াও তাহাজ্জুদের জামা'আতকারীরা মুআত্তা ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর এই ইবারত দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন-

قال محمد رحمة الله عليه ঃولهذا كله نأخذ لا باس بالصلوة في شهر رمضان ان يصلي الناس تطوعا بامام لان المسلمون قد اجمعوا علي ذلك

অর্থাৎ 'রামাযান মাসে ইমামের পিছনে নফল পড়তে কোন অসুবিধা নাই কেননা এ ব্যাপারে মুসলমানদের ইজমা রয়েছে, এর জবাবে আমরা বলবো, তারা যে ইবারতকে নফলের জামা'আত জায়িয হওয়ার দলীল মনে করেছেন এটা আসলে তাদের বিপথের অর্থাৎ জায়িয না হওয়ার দলীল আর সে দলীল মুসলমানদের ইজমা। কারণ তারাবীহ ছাড়া অন্য কোন নফল নামাযের জামা'আতের উপর ইজমা তো দূরের কথা মূল জামা'আতই খাইরুল কুরূনে সাবেত নেই।

উপরের আলোচনা দ্বারা আমাদের কাছে একথা স্পষ্ট হয় যে, নফলের জামা'আত কোন ক্রমেই বৈধ নয়। চাই রামাযান মাসে হোক বা রামাযানের বাইরে হোক। সুতরাং আমাদের কর্তব্য হলো, কোথাও এধরণের জামা'আত হতে দেখলে তাদেরকে হেকমতের সাথে বুঝিয়ে এই মাকরুহে তাহরীমী কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন। আমীন।

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতের শরয়ী বিধান

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন: 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। নিশ্চয় যারা অহংকার বশত: আমার ইবাদত (অর্থাৎ আমার কাছে দু'আ করা) থেকে বিমুখ হয় বা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (সুরা মুমিনঃ৬০, তাফসীরে ইবনে কাছীর:৭/১৫৩)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: 'নিশ্চয় দু'আ ইবাদত।' (মুসনাদে আহমাদ হা. নং ১৮৪১৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: ‘দু‘আ হলো ইবাদতের মূল।’ (সুনানে তিরমিযী হা.নং ৩৩৭১)

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: ‘যে ব্যক্তি আল্লাহ তা‘আলার নিকট দু‘আ করে না আল্লাহ তা‘আলা তার উপর নারাজ হন ।’ (সুনানে ইবনে মাজাহ:হা. নং ৩৮২৭ , তিরমিযী হা.নং ৩৩৭৩)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে বুঝা গেল যে, সকলের জন্য দু‘আ করা অপরিহার্য । চাই উহা ফরয নামাযের পরে হোক বা অন্য সময় হোক । যারা দু‘আ করবে না তারা আল্লাহ তা‘আলার ক্রোধের পাত্র হবে।

নামাযের পর বা ফরয নামাযের পর কোন প্রকার বাড়াবাড়ি ব্যতিরেকে আমাদের দেশে যে মুনাজাত চালু আছে তা মুস্তাহাব আমল, বিদ‘আত নয় । কারণ, বিদআত বলা হয় ঐ আমলকে, শরী‘আতে যার কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না । অথচ উক্ত মুনাজাত বহু নির্ভরযোগ্য রিওয়ায়েত দ্বারা সু-প্রমাণিত।

সম্মিলিত মুনাজাত দুইভাবে হতে পারে । এক. সমবেত লোকদের মধ্যে একজন দু‘আ করবে এবং অন্যরা আমীন বলবে। দুই. একস্থানে সমবেত হয়ে সবাই নিজস্বভাবে দু‘আ করবে । এই উভয় সূরত জায়িয । এ ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আমল ও নির্দেশ বিদ্যমান । তাই যারা মুনাজাতকে একেবারেই অস্বীকার করে তারা ভুলের মধ্যে আছে । যারা ইমাম-মুক্তাদির সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ‘আত বলে তাদের দাবিও ভিত্তিহীন। আবার যারা মুনাজাতকে জরুরি মনে করে বাড়াবাড়ি করে অর্থাৎ কেউ না করলে তাকে কটাক্ষ করে গালি দেয় তারাও ভুলের মধ্যে আছে ।

হাদীসে সম্মিলিত মুনাজাতের গুরুত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায় । ফিকহের কিতাবসমূহেও ইমাম-মুক্তাদির সম্মিলিত মুনাজাতকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে । অসংখ্য হাদীস বিশারদগণের রায়ও সম্মিলিত মুনাজাতের স্বপথে স্পষ্ট বিদ্যমান । এমতাবস্থায় প্রচলিত সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ‘আত বলা হঠকারিতা ছাড়া কিছুই নয় । (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত এর শরয়ী বিধান-মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.)

নিম্নে মুনাজাত স্বপক্ষে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হলো:

১. হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘যদি কোন দল একত্রিত হয়ে তাদের একজন দু‘আ করে থাকে আর অপররা ‘আমীন, আমীন’ বলে থাকে তাহলে আল্লাহ তা‘আলা তাদের দু‘আ অবশ্যই কবুল করেন।’ (মুস্তাদরাক হাকেম: ৫৪৭৮)

২. হযরত সালমান রা. বলেন, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন: ‘যদি কোন জামা‘আত কোন বিষয় প্রার্থনা করার জন্য আল্লাহ তা‘আলার

দরবারে হাত তুলে আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব হয়ে যায় যে, তিনি তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদের হাতে দিয়ে দিবেন।' (সুনানে আবূ দাউদ: হা. নং ১৪৮৮)

৩. ইতিহাসে হযরত আলা আল-হাযরামী রা. এর ঘটনা সুপ্রসিদ্ধ। বাহরাইনের মুরতাদদের বিরুদ্ধে ১১ হিজরীতে যে লড়াই হয়েছিল তাতে তিনি সিপাহসালার ছিলেন। এই ঘটনার মধ্যে আছে যে, মুসলিম বাহিনী একস্থানে যাত্রা বিরতি করলে কাফেলার সকল উট রসদপত্রসহ পলায়ন করলো। ঘটনার শেষে আছে যে যখন ফজরের আযান হলো। তখন হযরত আলা আল-হাযরামী রা.নামাযের ইমামতি করলেন। নামাযের পর দুজানু হয়ে বসে অত্যন্ত বিনয় ও কাতরতার সঙ্গে দু'আয় মশগুল হয়ে গেলেন। কাফেলার সকলেই তার সাথে সম্মিলিতভাবে দু'আ করতে লাগলেন। এ অবস্থায় সূর্য উদিত হলো তবুও তারা দু'আয় মশগুল রইলেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা তাদের সন্নিকটে একটি বড় জলাশয় সৃষ্টি করে দিলেন। সবাই সেখানে গিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করলেন এবং গোসল করলেন। বেলা কিছু চড়ার পর একে একে সকল উট সমস্ত রসদপত্রসহ ফিরে আসতে লাগলো। আরবী মূল পাঠ নিম্নরূপ: (আল-বিদায়া ওয়ান নেহায়াঃ৬/৩২৪)

فلما قضي الصلوة جثي علي ركبتيه وجثا الناس و نصب في الدعاء و رفع يديه وفعل الناس مثله

فلما قضي صلوته جثي لركبتيه وجثا الناس فنصب في الدعاء ونصبوا معه -مكتبة دار الكتب العلمية

(তারীখে তাবারী ২য় খণ্ড ২৮৭ পৃষ্ঠায়)

৪. আসওয়াদ আমেরী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম, যখন তিনি সালাম ফিরিয়ে ঘুরে বসলেন তখন উভয় হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। (ইলাউস সুনান হা.নং ৯৩৭)

৫. হযরত আবূ উমামা বাহেলী রা. বর্ণনা করেন যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে, কোন দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? ইরশাদ হলো, শেষ রাত্রে (তাহাজ্জুদের পর) এবং ফরয নামাযের পর। (সুনানে তিরমিযী হা.নং ৩৪৯৯)

৬. ইয়া'লা বিন শাদ্দাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, একবার আমরা নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছিলাম। তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে কি কোন অপরিচিত ব্যক্তি আছে, অর্থাৎ আহলে কিতাব? আমরা বললাম, না ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি দরজা বন্ধ করার আদেশ দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা সকলেই হাত উত্তোলন করো এবং বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু!' আমরা সকলেই এক সাথে হাত উত্তোলন করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এই কালেমা দিয়ে প্রেরণ করেছেন এবং এর উপর জান্নাতের ওয়াদা করেছেন আর আপনি ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতঃপর

তিনি বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো ,তোমাদের মাফ করে দেয়া হয়েছে।' (মুসনাদে আহমাদঃ হা.নং১৭১২৬)

উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, একজন দু'আ করবে আর অন্যরা সবাই আমীন বলবে, এভাবে সকলের দু'আ বা সম্মিলিত মুনাজাতের কবুল হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

হযরত আলা আল-হাযরামী রা. তার জামা'আতের সকলকে নিয়ে ফজরের নামাযের পর যে সম্মিলিত মুনাজাত করেছেন, সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে যদি এমনটি করতে না দেখতেন তাহলে তারা কখনো এমনটি করতেন না।

ফরয নামাযের পর দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশী:

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন। আর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দু'আ সর্বদা কবুল হতো । তাই হুযুর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করবেন আর সাহাবাগণ তার বিরুদ্ধাচরণ করনার্থে হাত না উঠিয়ে বসে থাকবেন এটা কল্পনাই করা যায় না ।

বিধায় উল্লেখিত হাদীসসমূহ দ্বারা ফরয নামাযের পরে ইমাম মুক্তাদি সকলের জন্য সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে গেল । অতএব, সম্মিলিত মুনাজাত মুস্তাহাব হওয়াই হাদীসসমূহের মর্ম ও সমষ্টিগত সারকথা ।

যারা ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতকে বিদ'আত বলে থাকেন তারা বলেন, হাদীসের মাঝে ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাতের কথা পাওয়া যায় না, কিছু হাদীসে শুধু দু'আর কথা পাওয়া যায়, কিন্তু তাতে হাত তোলার কথা নেই। আবার কোন জায়গায় হাত তোলার কথা আছে, কিন্তু একাকিভাবে সম্মিলিতভাবে নয় । আবার কোনটিতে সম্মিলিত হওয়ার কথা আছে, কিন্তু ফরয নামাযের পরে হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। অতএব, এ সকল হাদীস দ্বারা ফরয নামাযের পরে সম্মিলিত মুনাজাত প্রমাণিত হয় না ।

তাদের কথা ঠিক নয়। কারণ, আমরা ইতিপূর্বে আলা আল-হাযরামী রা. এর সকল সাথীকে নিয়ে ফজরের ফরয নামাযের পরে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করার কথা উল্লেখ করেছি।

তাদের অভিযোগের ভিত্তিই সহীহ নয়। কারণ শরী'আতে এমন কোন বিধান নেই যে, প্রত্যেক ইবাদতের সকল অংশ কোন একটি আয়াত বা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। এটা তেমনি যেমন নামাযের বিস্তারিত নিয়ম, আযানের সুন্নাত তরীকা, উযূর সুন্নাত তরিকা ইত্যাদি একত্রে কোন হাদীসে বর্ণিত নেই। বিভিন্ন হাদীসের সমষ্টিতে তা ছাবিত হয়, তারপরেও তা সকল উলামায়ে কেরামের নিকট গ্রহণযোগ্য ।

যারা ফরয নামাযের পরে সর্বাবস্থায় ইজতেমায়ী মুনাজাতের বিরোধী এবং সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই উঠে পড়েন, তাদের এ কর্ম-কাণ্ড দ্বারা নামাযের পর যে মাসনূন ও জিকির দু'আ ইত্যাদি রয়েছে তা তরক করা হয় এবং ফরয ও সুন্নাতের মাঝখানে কিছু সময়ের ব্যবধান করার যে হুকুম হাদীস শরীফে এসেছে তাও লঙ্ঘন করা হয় ।

তাদের জন্য নিম্নের হাদীসটি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য, আবু মিরছা রা. বর্ণনা করেন, একবার আমি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে নামায পড়ছিলাম। হযরত আবু বকর ও উমর রা. ঐ নামাযে উপস্থিত ছিলেন। তারা প্রথম কাতারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে দাঁড়াতেন। আমাদের সাথে এক ব্যক্তি ছিল, যে উক্ত নামাযে তাকবীরে উলা থেকেই উপস্থিত ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায শেষ করে সালাম ফিরালেন এমনভাবে যে, উভয়দিকে আমরা তার গণ্ডদয় দেখতে পেলাম । অতঃপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুরে বসলেন। তখন ঐ তাকবীরে উলায় উপস্থিত ব্যক্তি সুন্নাত নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লো। তৎক্ষণাৎ হযরত উমর রা. লাফিয়ে উঠলেন এবং ঐ ব্যক্তির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, বসে পরো, পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের ধর্মীয় পতন হয়েছে যখন তারা (ফরয ও সুন্নাত) নামাযের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতো না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উমর রা. এর কাজ দেখে দৃষ্টি উঠালেন এবং বললেন, 'হে খাত্তাবের পুত্র! আল্লাহ তোমাকে সঠিক পন্থী বানিয়েছেন।' (সুনানে আবূ দাঊদ হা.নং ১০০৭)

এ সকল বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, নামাযের পর ইমাম মুক্তাদি সকলের জন্য ওয়াজিব মনে না করে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা মুস্তাহাব ।

উল্লেখ্য, কোন আমল মুস্তাহাব প্রমাণের জন্য নবীজীর আমল বিদ্যমান থাকা জরুরী নয় বরং মৌখিক হাদীস দ্বারাও মুস্তাহাব প্রমাণিত হয়। যেমন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে আযান দেয়া ইশরাক, চাশতের নামায পড়া তাহিয়্যাতুল উযূ ও তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া প্রমাণিত নাই। তারপরেও মৌখিক হাদীস বিদ্যমান থাকায় উলামায়ে কেরাম এ আমলগুলোকে মুস্তাহাব বলেছেন । (ফয়যুল বারী ২/৩৫১)

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিক বিধান বুঝার এবং সুন্নাত মুতাবিক সহীহ আমল করার তাওফীক দান করুন । আমীন ।

সারা বিশ্বে একইদিনে রোযা ও ঈদ

শরীয়ত কী বলে?

সম্প্রতি কিছু লোক সারা বিশ্বে একইদিনে রোযা শুরু ও একই দিনে ঈদ উদযাপন নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি করছে। আমাদের দেশের কিছু এলাকায় সৌদিআরবকে মডেল বানিয়ে সৌদিআরবের সাথে মিলিয়ে রোযা ও ঈদ পালনও শুরু করেছে। এ ব্যাপারে তাদের বক্তব্য হলো, 'হানাফী মাযহাবেই সারা বিশ্বে এই দিনে রোযা ও ঈদ পালন করতে বলা হয়েছে'। অথচ কুরআন-সুন্নাহ, ইজমা ও হানাফী মাযহাবের আলোকে এ কথা প্রমাণিত যে, সারা বিশ্বে একদিনে রোযা ও ঈদ শুরু করা শরীয়াতের চাহিদা নয় । বরং প্রত্যেক দূরবর্তী এলাকার লোকজন নিজের এলাকার চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ শুরু করাই শরীয়াতের হুকুম। নিম্নে এ ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও ফিকহে হানাফীর উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো যাতে বিভ্রান্তির নিরসন হয় এবং সত্য প্রেমিরা পথ খুঁজে পায়।

এ ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য:

فمن شهد منكم الشهر فليصمه

'সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তিই রমযান মাস পাবে সে যেন এ সময় অবশ্যই রোযা রাখে।' (সূরা বাকারা: ১৮৫)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, যে অঞ্চলের লোকেরা যখন চাঁদ দেখবে তখন তারা রোযা শুরু করবে। এখানে সারা বিশ্বে একই দিনে রোযা শুরু করতে বলা হয়নি।

সূরা বাকারার ১৮৯ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে: يسئلونك عن الاهلة 'লোকেরা আপনার কাছে নতুন মাসের চাঁদসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে...' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাসীর আবুল আলিয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে, সাহাবায়ে কেরাম নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নতুন চাঁদের রহস্য কী? তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রোযা শুরু করা ও রোযা খতম করার সময় নির্ধারণী হিসেবে নতুন চাঁদ সৃষ্টি করেছেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৪৮৮)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো এই আয়াতে চাঁদ বুঝানোর জন্য هلال শব্দের বহুবচন الاهلة শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ নতুন চাঁদসমূহ। এখানে বহুবচন ব্যবহার করাই হয়েছে এ কথা বুঝানোর জন্য যে, মাতলা বা উদয়স্থলের ভিন্নতার ভিত্তিতে রোযা ফরয হওয়ার বিধান জারী হবে। অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন হেলাল তথা নতুন চাঁদের ভিত্তিতে ভিন্নভিন্ন উদয়স্থলের লোকদের উপর রোযা ফরয হবে। আর কুরআনের যেখানে শব্দের মধ্যে ব্যাপকতা থাকে তা শানে নুযূল তথা অবতীর্ণের উৎস মূলের

মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। (বিস্তারিত জানতে দেখুন মাবাহেস ফী উলূমিল কুরআন পৃ.৭৮ শায়েখ মান্না কাত্তা)

এ ব্যাপারে সুন্নাহর ভাষ্য:

১. হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'তোমরা চাঁদ দেখে রোযা শুরু কর, আবার চাঁদ দেখে ইফতার (ঈদুল ফিতর) করো, যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে তাহলে শাবান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ করো।' (সহীহ বুখারী হা.নং১০৯০, মুসলিম হা.নং ২৫৬৭)

এই হাদীস দ্বারা শুধু এতটুকু বুঝে আসে যে, চাঁদ দেখে রোযা রাখতে হবে, আবার চাঁদ দেখেই রোযা ছাড়তে হবে। কাছের এলাকা বা শহর থেকে যদি চাঁদ দেখার সংবাদ আসে তা গ্রহণ করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে এই হাদীসে কোনো নির্দেশনা নেই। কিন্তু অপর এক হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যদি নিকটবর্তী কোনো এলাকা থেকে চাঁদ দেখার সংবাদ আসে তাহলে নিজেরা চাঁদ না দেখলেও তা গ্রহণ করা হবে।

যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, গ্রামে বসবাসকারী জনৈক ব্যক্তি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন, আমি গত রাতে রমযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্যপ্রদান কর যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সত্যিকার কোনো ইলাহ নেই? লোকটি বলল হ্যাঁ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? লোকটি উত্তর দিল হ্যাঁ। অতঃপর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেলাল রাযি.কে লক্ষ্য করে বললেন, হে বেলাল! তুমি লোকদেরকে জানিয়ে দাও তারা যেন আগামী দিন থেকে রোযা রাখা শুরু করে। (আবূ দাঊদ হা.নং ৬৯১, নাসায়ী হা.নং২১১২)

বর্ণিত হাদীসে আগত ব্যক্তি শহরের বাহির থেকে এসে চাঁদের সাক্ষ্য প্রদান করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা গ্রহণও করেছেন। এর দ্বারা এ কথা স্পষ্ট বুঝে আসে যে, নিজেরা চাঁদ না দেখলেও কাছের এলাকার বা শহরের কারো দ্বারা চাঁদ দেখা প্রামাণিত হলেও রোযা রাখা ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখার সংবাদ এলে বা সেখানের আমীর কর্তৃক চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে ফয়সালার খবর এলে তা গ্রহণ করা হবে কিনা? সে ব্যাপারে অপর একটি হাদীসে নির্দেশনা পাওয়া যায়।

'কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত, উম্মুল ফযল বিনতে হারেস তাকে সিরিয়ায় হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কাছে পাঠালেন (কুরাইব বলেন) আমি সিরিয়ায় পৌঁছলাম এবং প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করলাম। আমি সিরিয়ায় থাকা অবস্থায় জুমআর রাতে রমযানের নতুন চাঁদ দেখেছি। এরপর রমযানের শেষভাগে আমি মদীনায় ফিরে এলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস আমার নিকট কিছু প্রশ্ন করলেন এবং নতুন চাঁদ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। এরপর তিনি বললেন, তোমরা কোন দিন নতুন চাঁদ

দেখেছ? আমি বললাম জুমআর রাতে চাঁদ দেখেছি। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, তুমি কি নিজে দেখেছ? আমি বললাম হ্যাঁ, আর লোকেরাও দেখেছে এবং তারা রোযাও রেখেছে, মুআবিয়া রাযি.ও রোযা রেখেছেন। তখন ইবনে আব্বাস রাযি. বললেন, আমরা কিন্তু শনিবার সন্ধ্যায় চাঁদ দেখেছি এবং সেই হিসাবেই আমরা শেষ পর্যন্ত রোযা থাকবো, অর্থাৎ চাঁদ না দেখা গেলে ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা ২৯ তারিখে নিজেরাই চাঁদ দেখব। আমি বললাম, মুআবিয়া রাযি. এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখা কি আপনার জন্য যথেষ্ট নয়? তিনি বললেন, না। কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম হা.নং১০৮৭, মুসনাদে আহমাদ হা.নং২৭৮৯, আবূ দাঊদ হা.নং২৩৩২, তিরমিযী হা.নং ৬৯৩)

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বুঝে আসছে যে, যদি চাঁদ দেখার স্থান দূরবর্তী হয়, তাহলে সেখানের চাঁদ দেখা অন্যদের জন্য যথেষ্ট হবে না। কারণ কুরাইব বিন আবী মুসলিম (মৃত: ৯৮হি.) একজন তাবেঈ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি এবং ইবনে আব্বাস রাযি. এর অতিঘনিষ্ট জন। আর ইবনে আব্বাস রাযি. এর নিকট রমযান সম্পর্কে এক ব্যক্তির সংবাদই যথেষ্ট। তিনি নিজেই এ সম্পর্কে হাদীস বর্ণনা করেছেন যা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর কুরাইব শুধু নিজের চাঁদ দেখার সংবাদ দেননি বরং তখনকার আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া রাযি. এর কাছে চাঁদ দেখা প্রামাণিত ও কার্যকর হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন। সুতরাং তার সংবাদের ভিত্তিতে ইবনে আব্বাস রাযি. এর কাছে চাঁদ দেখার এই সংবাদ গ্রহণ করতে কোনো বাধা ছিল না। এতদসত্ত্বেও ইবনে আব্বাসে রযি. এর নিকট সিরিয়া দূরবর্তী এলাকা গণ্য হওয়ায় তিনি সে সংবাদ গ্রহণ করলেন না বরং বলে দিলেন : هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 'নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে এমনই আদেশ করেছেন'

এ কথা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, ইবনে আব্বাস রাযি.এর মাযহাব এটাই ছিল যে, দূরবর্তী এলাকায় চাঁদ দেখার ভিত্তিতে রোযা ফরয হবে না। হতে পারে ইবনে আব্বাস রাযি. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী 'চাঁদ দেখে রোযা রাখো ও চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ো' এর উপর তার মাযহাবের ভিত্তি রেখেছেন। অথবা সরাসরি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এমন আদেশে আদিষ্ট হয়ে এ কথা বলেছেন।

উম্মতের ইজমা: দূরবর্তী এলাকার চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে ইজমা তথা মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইমাম আবূ বকর আল-জাসসাস আহকামুল কুরআনে লিখেন: 'আর এ ব্যাপারে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, দূরবর্তী অঞ্চলের প্রত্যেক শহরের জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে অন্যের দেখার অপেক্ষা করা ছাড়াই।' (আহকামুল কুরআন:১/৩০৫)

ইমাম জাসসাস রহ. এখানে ইজমার কথা উল্লেখ করেছেন যে, দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য। যদিও এর ব্যাখ্যায় তিনি ভিন্ন ক্ষেত্রের কথা বলেছেন। কিন্তু মূল বিষয়টির ব্যাপারে ইজমার স্বীকারোক্তি দিয়েছেন।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. মুআত্তা মালেকের ভাষ্য গ্রন্থ 'আল ইসতিযকার'-এ লিখেছেন: 'এ ব্যাপারে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দূরবর্তী শহর যেমন খোরাসান থেকে স্পেন, এমন ক্ষেত্রে এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তদ্রূপ প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের চাঁদ দেখা ধর্তব্য, তবে বড় শহর হলে বা চাঁদের উদয়স্থল কাছাকাছি হলে এমন শহরের কথা ভিন্ন। অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী এলাকার চাঁদ দেখা ধর্তব্য হবে। (ইসতিযকার:৩/২৮৩)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. ইমাম ইবনে আব্দুল বারের পূর্বোক্ত ইজমার কথা উল্লেখ করে দ্বিমত পোষণ করেননি। তিনি লিখেছেন: ' ইবনে আব্দুল বার উল্লেখ করেছেন, এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? এই মতানৈক্য ঐ সব এলাকার ক্ষেত্রে যেসব এলাকার চাঁদের উদয়স্থল এক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর যেসব এলাকা দূরবর্তী যেমন খোরাসান ও স্পেন এসব এলাকার ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই যে, এমন দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য ধর্তব্য নয়।' এ কথা উল্লেখ করার কিছু পরেই তিনি এ ব্যাপারে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বলের মাযহাব বর্ণনা করে লিখেছেন: 'দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা ধর্তব্য না হওয়ার যে ইজমা ইবনে আব্দুল বার বর্ণনা করেছেন তা ইমাম আহমাদ রহ. এর দলীলের খেলাফ না।' (মাজমূআতুল ফাতাওয়া : ২৫/১০৩, ১৩/৬২)

হাফেজ ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে লিখেছেন: 'ইবনে আব্দুল বার রহ. দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না মর্মে ইজমা নকল করেছেন। তিনি বলেছেন, উলামায়ে উম্মত এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন যে, দূরবর্তী এক এলাকার চাঁদ দেখা অন্য এলাকার জন্য যথেষ্ট নয়।' (ফাতহুল বারী: ৪/১৫৫)

ইমাম ইবনে রুশদ বেদায়াতুল মুজতাহিদ কিতাবে লিখেছেন: 'এ ব্যাপারে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, দূর দেশের ক্ষেত্রে এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য হবে না। যেমন: স্পেন ও হেজাজ।' (বেদায়াতুল মুজতাহিদ নেহায়াতুল মুকতাসিদ:২/৫০)

আল্লামা ইউসুফ বান্নুরী মাআরেফুস সুনানে লিখেছেন: 'শাইখ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ. বলেন, ইমাম যায়লায়ীর কথার উপর আমার সিদ্ধান্ত স্থির ছিল। পরে কাওয়ায়েদে ইবনে রুশদ কিতাবে এ ব্যাপারে ইজমার বর্ণনা পেয়েছি যে, দূরবর্তী স্থান হলে উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হবে। আর কতটুকু দূরকে দূর বলে ধরা হবে তা অবস্থার শিকার ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নিবে, তার নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারিত নেই।' (মাআরিফুস সুনান: ৫/৩৪০)

তবে এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হলো, যে দুই দেশে বা এলাকার চাঁদ দেখার তারিখ সব সময় একই হয় সে দুই দেশকে নিকটবর্তী এলাকা গণ্য করা হবে। যে সব এলাকার মধ্যে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাধারণত একদিন বা ততোধিক দিনের পার্থক্য থাকে সেসব এলাকাকে দূরবর্তী শহর বা এলাকা গণ্য করা হবে। (ফাতহুল মুলহিম: ৩/১১৩, কিতাবুল মাজমূ : ৬/১৮৩)

আরব বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলেম ড. ওয়াহবা আয্যুহায়লী 'আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু' তে ও ইবনে রুশদের অনুরূপ ইজমা নকল করেছেন। (আল ফিকহুল ইসলামী : ৩/১৬৫৮)

পূর্বের আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হলো যে, দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য নয়, এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং ইজমার কথা যখন বর্ণনা হয়েছে এবং ইবনে তাইমিয়া, ইবনে হাজার ও ইমাম কাশ্মীরীর মত বিদগ্ধ উলামায়ে কেরামও ঐ ইজমাকে অস্বীকার করেননি বরং ইবনে তাইমিয়া তো বিভিন্ন স্থানে বারবার এ কথা বলেছেন যে, এটা ইবনে আব্দুল বারের বর্ণনা করা ইজমার খেলাফ না। সুতরাং বর্ণিত ইজমাকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। তাছাড়া প্রথম যুগের ইমামদের থেকে বর্ণিত মতামত হয়তো একাধিক রয়েছে অথবা মুজমাল (ব্যাখ্যা সাপেক্ষ)। সুতরাং সে মতের কারণে ইজমার উপর কোনো প্রভাব পড়বে না। (মাআরেফুস সুনান:৫/৩৪৩)

যদিও মাসআলাটি মূলত মুজতাহিদ ফীহ হওয়ায় পরবর্তী উলামায়ে কেরাম মতানৈক্য ও ভিন্নভিন্ন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন।

হানাফী মাযহাব: উদয়স্থলের বিভিন্নতার সূরতে চাঁদ প্রমাণিত হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আসহাবে মাযহাব অর্থাৎ ইমাম আবূ হানিফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. থেকে কোনো মতামত আমরা পাইনি। আর পরবর্তীদের মধ্যে দুই ধরনের মতামত পাওয়া যায়।

ক. ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ চন্দ্রের উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হবে। সুতরাং এক দূরবর্তী দেশের চাঁদ দেখা অন্য দূরবর্তী দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না। হ্যাঁ, নিকটবর্তী দেশ হলে এক দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে।

খ. ইখতিলাফে মাতালে গ্রহণযোগ্য নয়। অর্থাৎ চন্দ্রের উদস্থলের পার্থক্য ধর্তব্য নয়। সুতরাং এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে অন্য অঞ্চলের জন্য তা গ্রহণযোগ্য হবে। এ মতটির প্রয়োগস্থল নিকটবর্তী এলাকা না দূরবর্তী এলাকা তা অস্পষ্ট এবং ব্যাখ্যাহীন।

দ্বিতীয় মতের আলোচনা ও তার ব্যাখ্যা পরে উল্লেখ করা হবে, প্রথমে প্রথম মতের স্বপক্ষে যেসব হানাফী উলামায়ে কেরাম মতামত ব্যক্ত করেছেন তাদের নাম ও কিতাবের হাওয়ালা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. ইমাম হুসামুদ্দীন শহীদ 'আলফাতাওয়াল কুবরা' (পৃ. ১৬)

২. ফকীহ আবুল ফাতাহ যহীরুদ্দীন আল ওয়ালওয়ালেজী 'আল ফাতাওয়া আলওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ (১/২৩৬) তে,
৩. আল্লামা কাসানী 'বাদায়েউস সানায়ে' (২/৫৭৯)
৪. আল্লামা আইনী 'শরহুল আইনি আলা কানযিদ্দাকায়েক' (১/১৩৮)
৫. ইমাম মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রশীদ কিরমানী 'জাওয়াহেরুল ফাতাওয়া' (১/৩২ : ৩৩)
৬. মোল্লা আলী কারী 'ফাতহু বাবিল ইনায়া' (১/৫৬৫)
৭. ফকীহ্ আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মাদ শায়খী যাদা 'মাজমাউল আনহুর' (১/৩৫৩)
৮. ইমাম আব্দুল হাই লাখনাবী 'মাজমূআতুল ফাতাওয়া'-এর রুয়াতুল হেলাল অধ্যায় (উর্দূ ১/৩৪৪)
৯. ফকীহ আলী ইবনে উসমান 'আল ফাতাওয়াস সিরাজিয়্যাহ' (৩১পৃ)
১০. ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলায়ী 'তাবয়ীনুল হাকায়েক' (২/১৬৪)
১১. আল্লামা শাব্বির আহমাদ উসমানী 'ফাতহুল মুলহিম' (৩/১১৩)
১২. মুফতী শফী রহ. 'জাওয়াহেরুল ফিকহ' (৩/৪৩৯)
১৩. আল্লামা মুসিলী 'আল ইখতিয়ার' কিতাবে 'ফাতাওয়া হুসামিয়া' থেকে উক্ত মত বর্ণনা করেছেন। এবং তার নিজের রুজহানও সেদিকে হওয়া বুঝে আসে।
১৪. মক্কা-মদীনার উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়াও অনুরূপ। (ফাতাওয়া উলামাউল বালাদিল হারাম পৃ.৮৮৭)
১৫. 'মাজালিসে তাহকীকাতে শরইয়্যাহ নদওয়াতুল উলামা'-এর সিদ্ধান্তও এরূপ। (নাফায়িসুল ফিকহ:৩/১৪১)

আল্লামা ইবনুল হুমাম পূর্বে উল্লেখিত কুরাইব রহ. থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করার পর বলেন: 'এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এ হাদীসের অনুসরণ অধিকতর শ্রেয়, কারণ দূরবর্তী অঞ্চলের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য কিনা এ ব্যাপারে এ হাদীসটি সুস্পষ্ট বর্ণনা। তাছাড়া এ সম্ভাবনা রয়েছে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদেরকে তাদের নিজেদের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে রোযা রাখার আদেশ করা হয়েছে। (ফাতহুল কদীর: ২/৩১৯)

আল্লামা কাসানী রহ. লিখেছেন: (এক শহরবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা পুরা করার সূরতে অপর শরহবাসী উনত্রিশ রোযা রাখলে একটি রোযা কাযা করবে।) 'এটা সে ক্ষেত্রে যখন দুই শহর কাছাকাছি হয়, উদয়স্থলের পার্থক্য না হয়। আর যদি অপর শহর দূরে হয়, তাহলে এক শহরবাসীর জন্য অন্য শহরের হুকুম আবশ্যক হবে না। কারণ শহর বা অঞ্চলের মাঝে অনেক দূরত্ব হলে উদয়স্থলও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং এমন ক্ষেত্রে প্রত্যেক শহরবাসীর জন্য তাদের উদয়স্থলই ধর্তব্য হবে অন্যদেরটা নয়। (বাদায়েউস সানায়ে: ২/৫৭৯)

আল্লামা ফখরুদ্দীন যায়লায়ী লিখেছেন: 'দলীল প্রমাণের বিচারে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া। কারণ প্রত্যেক

এলাকাবাসী তাদের অবস্থা হিসাবে সম্বোধিত বা দায়িত্ব প্রাপ্ত।' (তাবয়ীনুল হাকায়েক: ২/১৬৪)

মোল্লা আলী কারী রহ. লিখেছেন: ' দলীল প্রমাণের বিচারে সর্বাধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য হওয়া।' (ফাতাহু বাবিল ইনায়াহ: ১/৫৬৭)

'ফাতাওয়া উলামায়ে বালাদে হারাম' গ্রন্থে উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণ করা হবে মতটি উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে: 'আর এই মতটিই শব্দ ও সঠিক গবেষণার বিচারে শক্তিশালী' (ফাতাওয়া উলামায়ে বালাদে হারাম পৃ.৮৮৯)

আবুল ফাতাহ ওয়াল ওয়ালেজী লিখেছেন : 'দুই দেশের উদয়স্থল যদি ভিন্ন হয়, তাহলে এক দেশের হুকুম অন্য দেশের জন্য আবশ্যক হবে না।' (আল ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালেজিয়াহ : ১/৩২৬)

দ্বিতীয় মতের বিচার বিশ্লেষণ : যেসব হানাফী উলামায়ে কেরাম দ্বিতীয় মত উল্লেখ করেছেন তাদের নাম ও কিতাবের নাম:

১. সাহেবে খুলাসাতুল ফাতাওয়া 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' (১/২৪৯)
২. আল্লামা কাযী খান 'ফাতাওয়া কাযীখান' (১/১৯৮)
৩. ফকীহ আলম উবনুল আলা 'তাতারখানিয়া' (৩/৩৬৫)
৪. ইবনে নুজাইম 'বাহরুর রায়েক' (২/৪৭১)
৫. আল্লামা বায্যাযী 'ফাতাওয়া বাযযায়িা' (১/৮৬)
৬. উমর ইবনে ইবরাহীম 'নাহরুল ফায়েক' (২/১৪)
৭. সাহেবে ফাতাওয়া হিন্দিয়া 'ফাতাওয়া হিন্দিয়া' (১/১৯৮)
৮. আল্লামা শামী 'ফাতাওয়ায়ে শামী' (২/৩৯৩)
৯. আশরাফ আলী থানভী রহ. 'ইমদাদুল ফাতাওয়া' (২/১০৭)
১০. এবং ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম সহ আরো বিভিন্ন কিতাবে এ কথা বলা হয়েছে যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না, এটাই জাহেরুর রেওয়ায়াহ। সুতরাং এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে অন্য অঞ্চলেও চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে। নিকটবর্তী অঞ্চল ও দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

উল্লেখ্য যে, এ ব্যাপারটি কারো কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা নয় যে, 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে কিনা' এ বিষয়টি মুজতাহিদ ফীহ এবং মুখতালাফ ফীহ ও বটে। 'ফাতাওয়া আল লাজনাতুত দায়িমায়' আব্দুল আজীজ বিন আব্দুল্লাহ বিন বায, আব্দুররায্যাক আফীফী এবং আব্দুল্লাহ বিন মুনি স্বাক্ষরিত ফাতাওয়াতে আছে: 'উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য না হওয়ার মাসআলাটি মাসায়েলে নাজরিয়্যাহ, এতে ইজতিহাদের সুযোগ রয়েছে। আর এ মাসআলার ক্ষেত্রে মতের ভিন্নতা হয়েছে তাদের যাদের ইলম ও দ্বীনের ক্ষেত্রে আলাদা মর্যাদা রয়েছে। আর

এটা ঐ সকল মাসায়েলের একটি যাতে ইজতিহাদ সঠিক হলে ডাবল সাওয়াব, আর ভুল হলে অর্ধেক সাওয়াব।' (প্রাগুক্ত : ১০/১০২)

সুতরাং এ ক্ষেত্রে মুজতাহিদ ইজতিহাদের যেমন সুযোগ রয়েছে তেমনি পরবর্তী ফকীহদের জন্য শর্ত সাপেক্ষে কোনো একটি মত গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। আর মূলত এ মাসআলাটি তারজীহ বা অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আমল করার মত একটি মাসআলা। সুতরাং কোনো 'আসহাবে তারজীহ' যেকোনো মতকে দলীলের ভিত্তিতে তারজীহ অর্থাৎ প্রাধান্য দিতে পারেন।

শেষোক্ত উলামায়ে আহনাফের ইবারাতের বর্ণনা থেকে এ কথা প্রতিয়মাণ হয় যে, তারা উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য গ্রহণযোগ্য হওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং এমতটিকে তারা জাহেরুল মাযহাব বলে দাবি করেছেন, আর জাহেরুল মাযহাব হওয়ার কারণেই এই মতটিকে তারা অন্য মতটির উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় হলো এই মতটি আসলেই জাহেরুল মাযহাব বা জাহেরুর রেওয়ায়াহ কিনা?

জাহেরুর রেওয়ায়াহ বা জাহেরুল মাযহাবের আলোচনাঃ

শাইখুল ইসলাম আল্লামা তাকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন : 'জাহেরুর রেওয়ায়হ বলা হয় ঐ সকল মাসায়েলকে যেগুলো ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর কিতাব মাবসূত, যিয়াদাত, জামেয়ে সগীর, সিয়ারে সগীর, জামেয়ে কাবীর, ও সিয়ারে কাবীরে পাওয়া যায়। (উসূলুল ইফতা:১১৩, উকূদু রসমিল মুফতী:৭৩)

ইখতেলাফুল মাতালে মু'তাবার না। অর্থাৎ উদয়স্থলের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এক স্থানের চাঁদ দেখা অন্য স্থানের জন্য ধর্তব্য হবে, এমন কোনো ফায়সালা আমরা জাহেরুর রেওয়ায়াহতে পাইনি (জাহেরুর রেওয়ায়াহ এর প্রায় সব কিতাবই খুঁজে দেখা হয়েছে)। ইমাম সারাখসী রহ. এর 'আল মাবসূত' যা জাহেরুর রেওয়ায়াহ' এর মাসআলা-মাসায়েলের সংক্ষিপ্ত সংকলন এবং 'কাফী'র ব্যাখ্যা গ্রন্থ সেখানেও এরূপ কোনো কথা পাওয়া যায়নি। এমনকি নাদিরুর রেওয়ায়াতেও এমন কথা স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়নি।

সুতরাং হানাফীদের কোনো গ্রন্থে 'ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার না' এটাকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ বলা এবং এ শুধু এ কারণে এই মতকে তারজীহ দেওয়ার ব্যাপারে নতুন করে ভেবে দেখা উচিত। অনেক সময় এমন হয় যে, কোনো একটি মাসআলা কারো দিকে নিসবত করা হয়, পরবর্তীরাও তার অনুসরণ করে নিজের কিতাবে তা উল্লেখ করে দেয়। কিন্তু আসল কিতাব পুনরায় নিরীক্ষণ করলে তা যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেভাবে পাওয়া যায় না। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রহ. শরহু উকূদি রসমিল মুফতীতে এ বিষয়ে অনেকগুলো দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। (শরহু উকূদি রসমিল মুফতী পৃ.৫৮)

এই মাসআলাটির উৎস:

নাদিরুর রেওয়ায়াহতে একটি মাসআলা পাওয়া যায় যার থেকে চাঁদের মাসআলাটি মুসতান্বাত বা বের হতে পারে। আহকামুল কুরআনসহ কয়েকটি কিতাবে তার বর্ণনা রয়েছে।

ইমাম জাসসাস রহ. বলেন: 'বিশর বিন ওয়ালীদ আবূ ইউসুফ রহ. থেকে এবং হিশাম মুহাম্মাদ রাহ., থেকে আমাদের আসহাবদের কারো মতোবিরোধ ছাড়াই উল্লেখ করেছেন যে, যখন কোনো শরহবাসী চাঁদ দেখে উনত্রিশ দিন রোযা রাখে, আর ঐ শহরে কোনো অসুস্থ ব্যক্তি রোযা রাখলো না, তার হুকুম হলো সুস্থ হওয়ার পর সে উনত্রিশটি রোযাই কাযা করবে। আর যদি কোনো অঞ্চলের লোক চাঁদ দেখে ত্রিশটি রোযা রাখে আর অপর অঞ্চলের লোকেরা চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রাখে তাহলে পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে বুঝে আসে যে, যারা উনত্রিশটি রোযা রেখেছে তাদের জন্য একটি রোযা কাযা করা জরুরী। আর ঐ শহরের অসুস্থ ব্যক্তির জন্য ত্রিশটি রোযা কাযা করতে হবে। (আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস : ১/৩০৩)

ইমাম জাসসাস আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহ. থেকে যে দুইটি মাসআলা বর্ণনা করেছেন সম্ভবত তার দ্বিতীয়টি থেকে ইখতেলাফে মাতালের মাসআলাটি ছাবেত করা হয়েছে। অর্থাৎ এক শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রাখল আর অপর শহরবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রাখল, তাহলে যে শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছে, তাদের ব্যাপারে বলা হয়েছে যে, তারা একটি রোযা কাযা করবে। সুতরাং এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যে শহরবাসী উনত্রিশ দিন রোযা রেখেছে তাদের উপর ঐ শহরবাসী যারা চাঁদ দেখে ত্রিশ দিন রোযা রেখেছে তাদের চাঁদ দেখার কারণেই একটি রোযা কাযা করতে হবে। অতএব, এর দ্বারা বুঝা গেল অপর শহরবাসীর চাঁদ দেখা ধর্তব্য। ফলে ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার নয় সাব্যস্ত হলো অর্থাৎ উদয়স্থলের পার্থক্য গ্রহণযোগ্য নয়।

এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়:

১. দ্বিতীয় মাসআলার ব্যাপারে ইমাম জাসসাস বলেছেন: 'পূর্বোক্ত মাসআলা থেকে বুঝা যায় যে যারা উনত্রিশটি রোযা রেখেছে তারা একটি রোযা কাযা করবে।' এর দ্বারা বুঝা গেল দ্বিতীয় মাসআলাটি প্রথম মাসআলা থেকে ইস্তিম্বাত বা বের করা হয়েছে, এটি মানসূস আলাইহি কোনো মাসআলা না।

২. বর্ণিত মাসআলায় দুই শহরের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন নাকি এক, এ ব্যাপারে কোনো কিছুই উল্লেখ নাই। তাই এ মাসআলা থেকে ইখতিলাফে মাতালে মু'তাবার না, এ কথা প্রমাণ করা অসম্ভব।

৩. তাছাড়া এ মাসআলাটি 'মুহীতে বুরহানী' এবং 'তাতারখানিয়াতে' 'মুনতাকা'-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর মুনাতাকার ব্যাপারে কাশফুযযুনূর এর লেখক

লিখেছেন: ‘আল মুনতাকা ফী ফুরূইল হানাফিয়্যাহ হাকেম শহীদ রহ. এর লেখা। এতে মাযহাবের নাওয়াদিরুর রেওয়ায়হ সন্নিবেশিত হয়েছে।’ (কাশফুয যুনূন:১৮৫১)

অতএব, যে বর্ণনার মধ্যে মাতালে বা উদয়স্থলের ভিন্নতা সত্ত্বেও চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার কোনো আলোচনাই নেই এবং যেটা নাদিরুর রেওয়ায়াহ সন্নিবেশিত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত সেটাকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ বলা কি করে বৈধ হতে পারে?

তাই আমরা বলতে পারি যে, ইখতেলাফে মাতালে মু‘তাবার না, এই মাসআলাটিকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ দাবি করে, জাহেরুর রেওয়ায়াহ হওয়ার কারণেই তারজীহ বা প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, অথচ আমাদের আলোচনা দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, এই মতটিকে জাহেরুর রেওয়ায়াহ দাবি করার কোনো কারণ নেই। সুতরাং এ ক্ষেত্রে আসহাবে মাযহাবের মতের ব্যাপারে আমরা তাই বলতে চাই যা ইউসুফ বান্নুরী রহ. বলেছেন। তিনি বলেন: ‘প্রকাশ থাকে যে, মাযহাবের উলামাদের থেকে শুধু এতটুকু বর্ণনা পাওয়া যায় যে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য না। কাছের এলাকার বা দূরের এলাকার অথবা অন্যকোনো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ছাড়া তাদের থেকে এই এজমালী কথা পাওয়া যায়... এ দিকে আমরা যখন জানতে পারলাম যে, দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সুতরাং আইম্মা কেরামের মুতলাক (ব্যাখ্যা ছাড়া) কথাকে, নিকটবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রে উদয়স্থলের পার্থক্য ধর্তব্য না, এরূপ শর্তের সাথে শর্তযুক্ত করা আবশ্যক। আমাদের শায়েখ আল্লামা কাশ্মীরী এটাই বলতে চেয়েছেন।’ (মাআরিফুস সুনান:৫/৩৪১:৪২)

এখন আর হানাফীদের দুই প্রকার মতের ক্ষেত্রে কোনো সংঘর্ষ থাকল না। শুধু এতটুকু পার্থক্য থাকলো যে, একটি মত বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, আরেকটি মত যেটির আলোচনা আমরা শেষে করেছি সেটি অস্পষ্টভাবে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মতটির ব্যাখ্যা করার পর প্রথম মতটির সাথে এর কোনো সংঘর্ষ বাকি থাকে না।

প্রিয় পাঠক! আশা করি আমাদের সংক্ষিপ্ত এই আলোচনা পড়ার পর আপনার বুঝতে বাকী নেই যে, নিকটবর্তী এলাকার কোনো এলাকায় চাঁদ প্রমাণিত হলে তাঁর পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তবে দূরবর্তী এলাকার হুকুম ভিন্ন। দূরবর্তী এলাকার ক্ষেত্রে এক অঞ্চল বা দেশের চাঁদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। বরং প্রত্যেক দূরবর্তী এলাকা নিজেদের চাঁদ দেখা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ পালন করবে। উল্লেখিত মাসআলাটি নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের একক সিদ্ধান্ত নয়। বরং মুসলিম উম্মাহর অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত এটিই। সুতরাং এ মাসআলার ব্যাপারে আর কোনো দ্বিধা-দ্বন্ধের অবকাশ নাই। চৌদ্দশত বছর ধরে উম্মতের আমল যেভাবে চলে আসছে তাই সহীহ এবং দলীল প্রমাণ সমর্থিত আর ইজমাও এর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মাসআলার বিরোধিতা করে নতুন কোনো আমল চালু করা মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো ও কুরআন-সুন্নাহের বিরোধিতার নামান্তর।

সুতরাং আমাদের দেশের গুটিকয়েক বিদআতী ও ফেতনা সৃষ্টিকারী নামধারী আলেমদের কথা শুনে ও তাদের লেখা পড়ে বিভ্রান্ত হবেন না। তাদের কথা অনুযায়ী সাউদী আরবের সাথে মিলিয়ে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক বুঝ দান করুন এবং হেদায়াতের উপর কায়েম দায়েম রাখুন। আমীন।

হজ্বের মধ্যে ঘটে যাওয়া ভুলসমূহ

হজ্ব ইসলামের একটি স্তম্ভ। বিত্তবানদের উপরে জীবনে একবার ফরয; দেরি না করা ওয়াজিব। আর স্বাস্থ্য ও অর্থ থাকলে প্রতি চার বছরে এক বার বাইতুল্লাহ শরীফে নফল হজ্ব বা উমরার মাধ্যমে হাযির হওয়া বাইতুল্লাহ শরীফের হক।

১.'হজ্বে বদল'-এ যারা যায়, পাঠানেওয়ালা যদি তামাত্তু বা যে কোনো হজ্বের অনুমতি দেয় বা সে অনুমতি নিয়ে নেয় তাহলে ফাতওয়া হলোদ যদিও ইফরাদ করা উত্তম, তবে তামাত্তু করা জায়িয। হাকীমুল উম্মত থানবী রহ., মুফতী শফী রহ. ও মাওলানা যাফর আহমদ উসমানী রহ. এই মত প্রকাশ করেছেন। এছাড়া বর্তমান যুগের কোনো আলিমের এ ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই। সূত্র: জাওয়াহিরুল ফিকহ (পৃ. ৫০৮-৫১৬) ইমদাদুল আহকাম (২য় খণ্ড, পৃ.১৮৬)

২.সাধারণত মাসআলার কিতাবগুলোতে লেখা আছে যে, মক্কা ভিন্ন শহর আর মিনা ভিন্ন শহর। অতএব দুই শহর মিলিয়ে যদি কেউ পনেরো দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে মুকীম হবে না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মুকীম বা মুসাফির হওয়ার মাসআলা পরিস্থিতির সাথে সম্পৃক্ত। পরিস্থিতি পাল্টে গেলে মাসআলা পাল্টে যাবে। আর বর্তমান পরিস্থিতি হলো মক্কা ও মিনা এখন দুই শহর নেই, আবাদী মিলে এখন এক হয়ে গেছে। এমনকি মুযদালিফা-আরাফা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে। অপরদিকে সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মিনার সমস্ত ইন্তেজামী কাজ মক্কার সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং আবাদী মিলে যাওয়া ও সরকার কর্তৃক ইন্তেজামী বিষয় এক করে নেওয়ায় মিনা মক্কা শহরের মধ্যে দাখিল হয়ে যাবে, বা কমপক্ষে মিনাকে মক্কা শহরের উপকণ্ঠ/শহরতলী বলা হবে।

অতএব কিতাবের উল্লিখিত মাসআলা পরিস্থিতি পাল্টে যাওয়ার কারণে কার্যকর থকবে না। সুতরাং এখন যদি মক্কা-মিনা মিলিয়ে কেউ পনেরো দিন বা তার বেশি থাকার নিয়ত করে তাহলে সে মুকীম গণ্য হবে। মাসআলাটি ভালো করে বুঝে রাখা দরকার। কারণ অনেক আলিমও পরিস্থিতি না জানার কারণে পুরনো কিতাবের মাসআলা বলে থাকেন।

এটার একটা নমুনা আমদের ঢাকাতেই আছে। যেমন, একটা সময় ছিল সফরের উদ্দেশ্যে কেউ ঢাকা ত্যাগ করে বিমানবন্দরে গেলে তাকে মুসাফির বলা হতো। কারণ, তখন ঢাকা আর বিমানবন্দরের মাঝে বেশ ফাঁকা ছিল; কোনো আবাদী ছিল

না। আর সরকারও তখন এয়ারপোর্ট-উত্তরা এলাকাকে শহরের মধ্যে শামিল করে নাই। তখন উলামাদের ফাতওয়া ছিল এয়ারপোর্ট গেলে সে মুসাফির গণ্য হবে। কিন্তু পরবর্তীতে এই ফাঁকাটা বসতিপূর্ণ হয়ে যাওয়ায় এবং সরকার টঙ্গী ব্রিজ পর্যন্ত শহরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করায় এখন ফাতওয়া হচ্ছে কেউ বিদেশ ভ্রমনের জন্য এয়ারপোর্ট গেলে তিনি মুসাফির হবেন না; বরং মুকীম থাকবেন যতক্ষণ না বিমান উপরে উঠে। এখানে যে মাসআলা, মক্কা-মিনায়ও সেই মাসআলা।

কাজেই যেহেতু তারা মুকীম হলো তাই তাদের জন্য আরো কয়েকটা মাসআলা মানতে হবে।

(ক) তাদের এখন মক্কা-মিনা-মুযদালিফা-আরাফায় চার রাক'আত বিশিষ্ট নামায চার রাকা'আতই পড়তে হবে। (মুসলিম ৩য় খণ্ড হাদীস নং ৬৮৭)

(খ) মিনায় ১২ বা ১৩ তারিখ পর্যন্ত থাকতে হয়। এর মধ্যে যদি কোনো দিন শুক্রবার হয় তাহলে মিনাতে জুমু'আ পড়তে হবে। কারণ, এটা শহর বা শহরতলী। (তাতারখানিয়া ২য় খণ্ড পৃ.৫৫৩, মাসআলা নং-৩২৭৬)

অথচ আমি এবার (২০১২ ইং) হজ্বে গেলাম। খবর নিলাম; কেউ যুহর পুরা পড়েছে, কেউ দুই রাকা'আত পড়েছে। অথচ তাদের অবস্থান মিনা-মক্কা মিলে পনেরো দিনের বেশি থাকা হচ্ছে এবং শহরতলীতে অবস্থান করছে। তারপরেও তারা জুমু'আ তো পড়েই নাই, আবার যুহরের মধ্যে কসর করেছে। সঠিক মাসআলা না জানার কারণে তারা এ সমস্ত ভুল করেছে এবং এখনো অনেকে করছে।

(গ) নিসাবের মালিক হওয়ার কারণে দেশে যে প্রত্যেক বছর একটা কুরবানী করতো, মুকীম হয়ে যাওয়ায় ঐ কুরবানিটা বহাল থাকবে। চাইলে দেশেও করতে পারে, চাইলে সেখানেও করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, হজ্বের কুরবানী ভিন্ন। যা তামাত্তু বা কিরান করার কারণে হারামের সীমানায় ১২ই জিলহজ্বের মধ্যে করতে হয়। (ফাতাওয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড পৃ.৫১৫)

মহিলাদের কিছু ভুলঃ

(ক) চেহারা খোলা রাখা। মাসআলা হলো চেহারা দেখা যাবে না; তবে বোরকার নেকাব চেহারার সাথে লেগে থাকবে না। এর জন্য এমন কিছু ব্যবহার করতে হবে যাতে করে নেকাব চেহারার সাথে না লেগে না থাকে। (ফাতাওয়ায়ে শামী ২য় খণ্ড পৃ.৫২৭)

(খ) মহিলাদের জন্য পাঁচ ওয়াক্ত হারামের জামা'আতে ও জুমু'আয় যাওয়া মাকরুহে তাহরীমী। অথচ দেখা যায় যে, মহিলারা পাঁচ ওয়াক্ত জামা'আতে যাচ্ছে! যার কারণে ভিড় বেশি হচ্ছে। তারাও গুনাহগার হচ্ছে, পুরুষরাও গুনাহগার হচ্ছে। আর হাজারো পুরুষের ধাক্কা খাচ্ছে, ধাক্কা দিচ্ছে। আর পুরুষের পাশে দাঁড়ানোর কারণে পুরুষের নামাযও নষ্ট হচ্ছে। তারা যাচ্ছে ফযিলতের জন্য; অথচ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো মহিলা হজ্ব বা উমরার জন্য মক্কায় এসে ঘরে

নামায পড়লে এক লাখের চেয়ে বেশি সওয়াব পাবে (মুসনাদে আহমদ ৬ষ্ঠ খন্ডঃ পৃ.২৯৭, ৩০১। হাদীস নং-২৬৫৯৮, ২৬৬২৬) । তেমনিভাবে মদীনার মসজিদে নববী থেকে তার ঘরের নামাযের ফযিলত বেশী । অতএব মহিলারা জুমু'আয়ও যাবে না, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও যাবে না। তবে তাওয়াফ করতে গিয়েছে এমন সময় কোনো নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেল সে সময় মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে নামায পড়ে নিতে পারবে। চাই তাওয়াফ হজ্বের হোক বা উমরার হোক, বা অন্য কোনো তাওয়াফ হোক।

কয়েকটি মারাত্মক ভুল:

(ক) এক শ্রেণীর হাজী সাহেব আছে, তারা সারাদিন মোবাইল বা ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলতে থাকে। অথচ জানদারের ছবি তোলা হারাম কাজ (বুখারী শরীফ ৪র্থ খণ্ড পৃ.৭১, হাদীস নং ৫৯৫০) । তারা হজ্বে গিয়েও হারাম শরীফের মধ্যে এই হারাম কাজ করছে। হজ্বের সফরে হারাম কাজ করলে হজ্বে মাবরূর নসীব হয় না।

(খ) অনেক পুরুষ ইহরাম খোলার সময় যেখানে শরীয়ত বলেছে মাথা মুণ্ডানোর কথা সেখানে তারা দাড়িও মুণ্ডায়। আমাদের শায়খ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন,"দেশে অন্যায় কাজ করলে, আল্লাহর ঘরে গিয়েও তা করলে; এভাবে তোমার কয়েক লাখ টাকার হজ্ব ঐ জায়গায়ই দাফন করে রেখে আসলে"।

হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, যখন কেউ দাঁড়ি-কাটা অবস্থায় 'আস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ!' বলে তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দেন না। কারণ সে প্রতিদিন রাসূলের কলিজায় খুর চালায়। তাই এমন কেউ সালাম দিলে তিনি চেহারা মোবারক আরেক দিকে ফিরিয়ে নেন। এমন অবস্থায় একশত বার হজ্ব করলেও তার হজ্বে মাবরূর নসীব হবে না।

(গ) 'তালবিয়া' ইনফিরাদী আমল। সবাই যার যার তালবিয়া পড়বে। দেখা যায়, অনেকে লিডারের সাথে তাল মিলিয়ে তালবিয়া পড়তে থাকে। অথচ এর কোনো প্রমাণ নাই।

(ঘ) আরাফা ও মুযদালিফার মধ্যখানে ৫ কিলোমিটার প্রশস্থ একটি ময়দান আছে, যেখানে অনেক টয়লেট ও গাছপালা আছে এ সব থেকে অনেকেই এটাকে মুযদালিফা মনে করে এখানে অবস্থান করে, অথচ এটা আরাফার মধ্যে দাখিল নয় এবং মুযদালিফার মধ্যে ও দাখিল নয়, এটা ভিন্ন একটা ময়দান, এখানে হজ্বের কোন কাজ নাই। এখানে মাগরিব ও ইশা একত্রে পড়া জায়িয নাই, এবং রাত্রে অবস্থান করাও জায়িয নাই। এবং বা'দ ফজর এখানে উকূফে করলে উকূফে মুযদালিফাও আদায় হবে না। অথচ যারা পায়দল আরাফা থেকে মুযদালিফায় যায় তাদের অনেকে এ ভুলটা করে। তাদের উপর 'দম' ওয়াজিব হয়ে যায় তাও তারা না জানার কারণে আদায় করে না।

(ঙ) ব্যাংকের মাধ্যমে কুরবানী না করানো উচিত। কারণ এতে কখনো ১০ তারিখে বড় শয়তানকে কংকর মারার আগে কুরবানী হয়ে যায়। আবার কখনো কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার আগে মাথা মুণ্ডানো হয়ে যায়। আর এ উভয় ভুলের দরুন তামাত্তু ও কিরানকারীর উপর দম ওয়াজিব হয়ে যায়। কারণ তাদের জন্য ১০ তারিখে এই তিনটি কাজে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জরুরী।

(১) বড় শয়তানকে কংকর মারা, (২) কুরবানী করা ও (৩) মাথা মুণ্ডানো।

এজন্য নিজেরা বা বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে কুরবানীর ব্যবস্থা করা জরুরী। কংকর মারার পর কুরবানী করবে, তারপর কুরবানী সম্পন্ন হওয়ার পর মাথা মুণ্ডাবে। মাথা মুন্ডানোর দ্বারা বা চুল ছোট করার দ্বারা হালাল হয়ে যাবে, তখন ইহরাম অবস্থায় যে সব কাজ নিষিদ্ধ ছিল তা এখন জায়িয হয়ে যাবে। উল্লেখ্য ইহরামের চাদর খুললে ইহরাম খোলা হয় না বা হালাল হওয়া যায় না।

এক নজরে হজ্বের এক সপ্তাহ

তারিখ	ফরয	ওয়াজিব	সুন্নাত	মুস্তাহাব ও অন্যান্য
৭ জিলহজ্ব	হজ্বের ইহরাম বাঁধা	ঘ) নফল তাওয়াফ করে হজ্বের সা'ঈ করে নেয়া যায়। উল্লেখ্য,ওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করা সুন্নত।	খ) ১. ইহরাম বাঁধার পূর্বে হাযামাত বানান। ২. স্ত্রী সাথে থাকলে প্রয়োজন সেরে নেওয়া।	ক) ১. চার পাঁচ দিনের জন্য জরুরী সামান নিয়ে হাত ব্যাগ প্রস্তুত করা। ২.বড় ব্যাগ বাসায় রেখে যাওয়া
৮ জিলহজ্ব	নেই	নেই	ক) ১. মিনা ময়দানে অবস্থান করা । ২. বেশি বেশি তালবিয়া পড়া।	খ) ১. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করা। ২. বেশি বেশি তিলাওয়াত ও যিকির করা।
৯ জিলহজ্ব	খ) আউয়াল ওয়াক্তে যুহর আদায় করে আরাফায় খিমার মধ্যে উকূফ করা।	ঘ) ১. সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফার ময়দানে অবস্থান করে, মাগরীব না পড়ে তালবিয়া পড়তে পড়তে মুযদালিফায় রওনা হওয়া। ২. মুযদালিফায় পৌছে ইশার ওয়াক্ত হলে মাগরিব ও ইশা একত্রে	ক) ১. সুর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফায় রওনা হওয়া। ২. যুহরের নামাজের পূর্বে গোসল করে নেয়া।	গ) ১. বেলা ডুবা পর্যন্ত দু'আ দূরুদ ও কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকা। ২. কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে উকূফ করা।

		পড়া। উল্লেখ্য, মুযদালিফায় রাত্রী যাপন করা এবং সেখান থেকে ৭০টি ছোট কংকর সংগ্রহ করা সুন্নত।		
১০ জিলহজ্ব	ঙ) ফরয তাওয়াফ করা। উল্লেখ্য, ৭ই জিলহজ্ব সা'ঈ না করে থাকলে এ তাওয়াফের পরে সা'ঈ করা।	খ) ১. আউয়াল ওয়াক্তে ফজর পড়ে সূর্য উঠার আগ পর্যন্ত উকূফে মুযদালিফা করা অর্থাৎ অবস্থান করা। ঘ) ১. দিনে শুধু বড় শয়তানকে ৭টি কংকর মেরে দ্রুত চলে আসা। ২. ১০,১১,১২ তারিখের মধ্যে নিজেরা কুরবানী করা, ব্যাংকরে মাধ্যমে না করা। ৩. মাথা মুন্ডানো। উল্লেখ্য: এই কাজগুলি ধারাবাহিকভাবে করা।	গ) ১. সূর্যোদয়ের সামান্য পূর্বে মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া। চ) ১. রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	ক) ১. সুবহে সাদেকের পরে গোসল করা । ২. বেশি-বেশি তালাবিয়া, যিকির, দূ'আ ও তিলাওয়াত করতে থাকা।
১১ জিলহজ্ব	খ) ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে করে নেওয়া	ক) ১. বাদ যুহর সূর্যাস্তের আগে আগে পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মারা।	গ) ১. রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	১. ১১, ১২ ও ১৩ তারিখে ছোট শয়তানকে পাথর মারার পর সামনে অগ্রসর হয়ে কিবলা মুখী হয়ে তাসবীহ তাহলীল ও দু'আ করা। মাঝারী শয়তানকে পাথর মারার পর অনুরূপ ভাবে দু'আ করা। তবে বড় শয়তানকে পাথর মেরে সেখানে দাঁড়িয়ে দু'আ করবে না বরং দ্রুত সেখান থেকে চলে আসবে। ২. প্রত্যেক কংকর
১২ জিলহজ্ব	খ) ফরয তাওয়াফ না করে থাকলে আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই তাওয়াফ করে নেওয়া জরুরী।	ক) ১.বাদ যুহর সূর্যাস্তের আগে আগে পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মারা।	গ) ১.রাত্রে মিনায় অবস্থান করা।	
১৩ জিলহজ্ব		ক) ১. বাদ যুহর পর্যায়ক্রমে ছোট, মাঝারী ও বড় শয়তানকে সাতটি করে কংকর মেরে মক্কায়	খ) ১.প্রত্যেক দিন কংকর মারার সময় ধারাবাহিকতা (অর্থাৎ ছোট,	

	নেই	ফিরে আসা। (উল্লেখ্য: ১৩ জিলহাজ্জ সুবহে সাদিকের পর যারা মিনায় থাকবে তাদের জন্য ১৩ জিলহাজ্জ শয়তানগুলোকে পাথর মারা ওয়াজীব) গ) ১. মক্কা শরীফ থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে বিদায়ী তাওয়াফ করা।	মাঝারী ও বড়) ঠিক রাখা।	নিক্ষেপের সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়া।

বি:দ্র: প্রতিদিনের আমলের মধ্যে ক,খ,গ,ঘ,ঙ,চ অনুযায়ী সিরিয়াল রক্ষা করতে হবে।

শেয়ার ও বর্তমান শেয়ার বাজার

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন: (অর্থ) হে ঈমানদারগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার করো, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দিয়েছি। (সূরা বাকারাহ-১৭২)

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন: (অর্থ) মানুষের নিকট এমন এক সময় আসবে যখন সম্পদ উপার্জনে এ মর্মে কোনো তোয়াক্কা করবে না যে, সে হালাল উপার্জন করছে, নাকি হারাম উপার্জন করছে। (সহীহ বুখারী হা. নং ২০৫১)

৩. অন্যত্র ইরশাদ করেন: (অর্থ) হারাম খাদ্যে লালিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (বাইহাকী হা. নং ৫৭৫৯)

৪. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেন: (অর্থ) হালাল ও হারামের বিষয় তো স্পষ্ট। তবে এ দু'য়ের মাঝে কতিপয় সন্দেহযুক্ত বিষয় আছে, যেগুলো সর্ম্পকে বহু লোক অবহিত না। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বিরত থাকে সে নিজ দ্বীন ও মর্যাদার হেফাযত করতে পারে। আর যে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয় সে পর্যায়ক্রমে হারামে পতিত হয়। (সহীহ বুখারী শরীফ হাদীস নং ২০৫১, সহীহ মুসলিম শরীফ হা. নং.১৫৯৯)

উপরের আয়াত ও হাদীসসমূহ দ্বারা একথা স্পষ্ট যে, পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য রুযী-রোযগার হালাল হওয়া আবশ্যক। স্পষ্ট হারাম থেকে বাঁচা যেমন জরুরী তেমনি শর'ঈ প্রমাণের ভিত্তিতে হারামের সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বিরত থাকা জরুরী।

যারা কুরআন, হাদীস ও পরকাল বিশ্বাস করে না দুনিয়ার জীবনে হয়তো তারা হারাম বা সন্দেহযুক্ত রুযী-রোযগার বর্জনের কষ্টটুকু স্বীকার করবে না; কিন্তু কোনো

মুসলমান ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রাচুর্যের লোভে চিরস্থায়ী আখিরাতকে ঝুঁকিপূর্ণ করতে পারে না, বরং অসীম জীবনের সুখ-সাফল্যের লক্ষ্যে সীমিত সময়কে পূর্ণ সংযমের মাধ্যমে অতিবাহিত করতে সচেষ্ট হবে। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় আয়-উপার্জনেও হারাম তো বটেই, সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও থাকবে নিরাপদ দূরত্বে। বর্তমান যামানায় আয়-উপার্জনের একটি মাধ্যম হলো শেয়ার বেচা-কেনা। অথচ শর'ঈ দৃষ্টিকোণ থেকে এতে রয়েছে হারাম ও নাজায়িযের ব্যাপক সম্পৃক্ততা যা থেকে বাঁচতে হলে তা জানতে হবে খুব গভীরভাবে। আর এজন্যই আমাদের নিম্নোক্ত প্রয়াস।

শেয়ারের শর'ঈ বিশ্লেষণ

বর্তমানে শেয়ারসমূহের রয়েছে দ্বিমুখী সংশ্লিষ্টতা

(ক) কোম্পানির সাথে সংশ্লিষ্টতা ও (খ) শেয়ারবাজার বা পুঁজি বাজারের সাথে সংশ্লিষ্টতা।

কোম্পানি বার্ষিক যে লভ্যাংশ ঘোষণা করে তা শেয়ার-হোল্ডারের একাউন্টে জমা হয়ে যায়, তেমনি কোম্পানি যদি লভ্যাংশের পরিবর্তে বোনাস শেয়ার প্রদান করে তাও শেয়ারধারীর বি.ও তে জমা হয়, কিংবা রাইট-শেয়ার নিতে চাইলে সে-ই প্রাধান্য পায়। আর ভবিষ্যতে কখনো কোম্পানি বিলুপ্ত হলে শেয়ার-হোল্ডারগণ শেয়ার অনুপাতে সকল সম্পদে অংশীদার হয়। এসকল বিষয়ের বিবেচনায় প্রতিটি শেয়ার মানে কোম্পানির সকল সম্পদে আনুপাতিক অংশীদারিত্ব।

পক্ষান্তরে বর্তমান শেয়ার বাজারে শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানি থেকে প্রায় স্বতন্ত্র। এখানে শেয়ারের মূল্যায়ন ভিন্নভাবে হয়। দেশের আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গ্রাহকদের চাহিদা বা অনীহা এসব বিষয়ের প্রভাব শেয়ারের ক্ষেত্রে এক রকম, আর কোম্পানির ক্ষেত্রে আরেক রকম। কোম্পানির লাভ-লোকসানের সাথে শেয়ার-মূল্যের উত্থান বা পতনের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। শেয়ারবাজারে যারা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে তাদের অধিকাংশের ধারণায়ও একথা থাকে না যে, সে কোম্পানির আনুপাতিক অংশের ক্রয়-বিক্রয় করছে। এ সকল দিক বিবেচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ারের বাস্তবতা হলো শুধু সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার সংখ্যা। এ ছাড়া অন্য কিছু নয়।

শেয়ারের মূল্য:

শেয়ারের মূল্য তিন ধরনের হয়ে থাকে

(ক) গায়ের দর (Face value): অর্থাৎ শেয়ারের প্রথম নির্ধারিত মূল্য।

(খ) বাজার দর (Market value): অর্থাৎ শেয়ারবাজারে যে দরে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

(গ) বাস্তব দর (Neet Asset value/Break up value): অর্থাৎ কোম্পানি বিলুপ্ত হলে প্রতি শেয়ার হোল্ডার যা পাবে।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর'ঈ বিধান:

(ক) শরীয়তমতে কোনো বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হতে হলে তা মাল তথা সম্পদ হওয়া আবশ্যক। আর মাল বা সম্পদ বলা হয় যা ব্যবহারযোগ্য হয়, এবং যার নিজস্ব মূল্য আছে। (ফিকহী মাকালাতঃ ১ম খণ্ড, বুহূস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাঃ ১ম খণ্ড)

একথা অনস্বীকার্য যে, শর'ঈ সংজ্ঞা মতে শেয়ার-সার্টিফিকেট মাল নয়। বরং মাল হলো কোম্পানীস্থিত অর্থ-সম্পদের আনুপাতিক অংশ। কাজেই শেয়ার কেবল তখনই বেচা-কেনার যোগ্য হবে, যখন তা কোম্পানীস্থিত অর্থ-সম্পদের আনুপাতিক অংশের প্রতিনিধিত্ব করবে। যদি কোম্পানির অর্থ-সম্পদের সাথে তার সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, এবং তার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য এসে যায় তখন শর'ঈ দৃষ্টিতে তা ক্রয়-বিক্রয়ের যোগ্য থাকবে না।

(খ) ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো হারাম কিংবা হারাম যুক্ত না হওয়া। কাজেই কোনো কোম্পানির মূল কারবার যদি হারাম হয়, যেমন মদ বা মাদক জাতীয় বস্তুর উৎপাদন বা ব্যবসা, অনুরূপ প্রচলিত ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি, যাদের মূল কারবার হয় সুদের উপর অর্থ লগ্নি করা, এধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় শরীয়তমতে বৈধ নয়।

(গ) গায়ের দরের চেয়ে কম-বেশিতে শেয়ার লেন-দেন করার ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো কোম্পানির 'স্থির সম্পদ' (Fixed Assets) থাকা। কাজেই যে সকল কোম্পানি 'স্থির' পণ্যের মালিক হয়নি সেগুলোর শেয়ার গায়ের দরের চেয়ে কম-বেশিতে লেনদেন শরীয়তমতে জায়িয নয়।

(ঘ) ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ফটকাবাজী, প্রতারণা ও জুয়ামুক্ত হওয়াও জরুরী। অন্যথায় এর দ্বারা যে আয় হবে তা হালাল হবে না।

মোটকথা, সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা-নির্ভর, স্থির সম্পদ-সমৃদ্ধ, ফটকাবাজী ও জুয়া-মুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়া এবং পরবর্তীতে আনুপাতিক হারে লভ্যাংশ গ্রহণ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়িয আছে।

সুদী লেনদেনের সাথে জড়িত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের হুকুম:

আজকাল একশত ভাগ হালাল কারবার করে, প্রাসঙ্গিক পর্যায়েও হারাম ও নাজায়িয লেনদেন করে না, এমন কোম্পানির অস্থিত্ব না থাকার মতই। বিশেষ করে ব্যাংকে টাকা রেখে সুদ নেওয়া ও ব্যাংক থেকে সুদী লোন নিয়ে ব্যবসায় লাগানোর কাজটি প্রায় সব কোম্পানীই করে থাকে। প্রশ্ন হলো এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়া জায়িয আছে কি না?

ইসলামী অর্থনীতি ও লেনদেনের মাসায়িল সম্পর্কে বিজ্ঞ কিছুসংখ্যক আলিমের মতে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে এজাতীয় কোম্পানির শেয়ার কেনা জায়িয হতে পারে।

শর্তগুলো যথাক্রমে:

(ক) কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভায় (AGM) কিংবা যে কোনো উপায়ে নীতি-নির্ধারকদের নিকটে একজন শেয়ার-হোল্ডার হিসাবে সুদী লেনদেনের বিপথে প্রতিবাদ পাঠাবে। তার প্রতিবাদ কার্যকর না হলেও যেহেতু সে নীতিনির্ধারক বা পরিচালক নয়, কাজেই এ প্রতিবাদের পর সুদী লেনদেনের দায় তার উপর বর্তাবে না।

(খ) যদি কোম্পানি ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত সুদ তার শেয়ার-হোল্ডারদের মাঝে বণ্টিত লভ্যাংশের মধ্যে শামিল করে তাহলে কোম্পানির 'ব্যালেন্সশীট' তথা আয়-ব্যয়ের খতিয়ান দেখে সুদের আনুপাতিক অংশটুকু সাওয়াবের নিয়ত না করে সদকা করে দিবে।

(গ) যারা লভ্যাংশের জন্য নয়, বরং শেয়ার দিয়ে ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে কিংবা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় ব্রোকারী করে, তারাও আয়ের একটা অংশ অনুমান করে সদকা করে দিবে।

পক্ষান্তরে ইসলামী অর্থনীতি ও লেনদেনের মাসায়িল সম্পর্কে বিজ্ঞ বিশ্বের অধিকাংশ আলিমের মত হলো, সুদের মতো জঘন্য পাপের ক্ষুদ্রতম দায় বর্তায় এমন কাজও বিনা ঠেকায় কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ হতে পারে না। কাজেই মূল ব্যবসা হালাল হওয়া সত্ত্বেও প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে সুদী লেন-দেন করে এমন কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ নয়। প্রতিবাদ করলে কোনো কাজ হবে না জেনেও স্বেচ্ছায় তাতে অংশীদার হওয়া, অতঃপর এ ঠুনকো প্রতিবাদ করা তাতে সুদের দায় এড়ানো যাবে না। কোম্পানির সুদী লোনের পরিমাণ কম-বেশি হওয়া এক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করবে না। অনুরূপ এ জাতীয় কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়াকে এজাতীয় কোম্পানির পণ্য ক্রয় করার সাথে তুলনা করাও ঠিক হবে না। সুদী লেন-দেনের বর্তমান ব্যাপকতাও এক্ষেত্রে অজুহাত হতে পারে না, যেমন বর্তমানে সুদের মারাত্মক ব্যাপকতা সত্ত্বেও সুদের কোনো অংশ বৈধ নয়।

বর্তমান শেয়ার বাজারের শরঈ বিধান:

বর্তমান শেয়ারবাজার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যেখানে শুধু Capital Gain তথা বিক্রয় করে মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করা হয় (যদিও কখনো লোকসানও গুনতে হয়), কোম্পানিতে অংশীদার হয়ে লভ্যাংশ (Divident) গ্রহণ মূল উদ্দেশ্য নয়; যদিও কখনো দাম বাড়ার অপেক্ষা করতে হয়। এ বাজারকে Secondary Market (সেকেন্ডারি মার্কেট), Money Market (মানি মার্কেট), Capital Market (ক্যাপিটাল মার্কেট) ও বলা হয়। এ বাজারে শেয়ারের লেন-দেন হয় স্বতন্ত্র গতিতে। কোম্পানি-ঘোষিত 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু' তথা শেয়ারের বাস্তব মূল্যের সাথে এবং কোম্পানির বাস্তব অবস্থার সাথে শেয়ার বাজারের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সম্পর্ক একেবারে গৌণ।

এ বাজারের শেয়ার আর কোম্পানিতে আনুপাতিক অংশীদারিত্ব মোটেও এক জিনিষ নয়। অথচ শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধতার মূল ভিত্তিই ছিল এ কথার উপর যে, শেয়ার মূলত কোম্পানির সকল সম্পদের আনুপাতিক মালিকানা। শুধু কাগজ বা সংখ্যা হলে তার ব্যবসা জায়িয হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কেননা তখন সে ব্যবসার অর্থ হবে টাকার বিনিময়ে টাকার ব্যবসা। তাছাড়া কিছুসংখ্যক ফিকাহবিদের মতে প্রাসঙ্গিক পর্যায়ে সুদী কারবারে জড়িত কোম্পানিসমূহের শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা বৈধ হওয়ার জন্য সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের যে শর্ত রাখা হয়েছে, শেয়ার ব্যবসায়ীদের জন্য সে শর্তটি পালন করাও সম্ভব নয়। কারণ, তারা কখনো দিনেই কয়েকবার বেচাকেনা করে আবার একসঙ্গে বহু কোম্পানির শেয়ার লেন-দেন করে। এ অবস্থায় তারা কতবার সুদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে? কার কাছেই বা প্রতিবাদ করবে? আর যদি প্রতিবাদ করেও, তা কি হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে না?

সুতরাং বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় (Capital Gain) করে অর্থোপার্জন এক ধরণের জুয়া যা কোনো সূরতেই জায়িযের আওতায় পড়ে না এবং উপরোক্ত পদ্ধতিতে শেয়ার-ব্যবসা করাকে কোনো নির্ভরযোগ্য আলিম বৈধ বলেছেন বলেও আমাদের জানা নেই।

যারা শেয়ার-ব্যবসার সাথে জড়িত হয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে শরী'আতের হুকুম কী?

বলা বাহুল্য যে, শর'ঈ মাসআলা সম্পর্কে অবগত না হয়ে লাখ লাখ মুসলমান এমনকি অনেক দ্বীনদার লোকেরাও এযাবৎ এ ব্যবসায় জড়িত হয়েছেন এবং অনেকেই এ ফটকাবাজী ব্যবসার স্বাভাবিক পরিণতিও বরণ করেছেন। এ পর্যায়ে কেউ কেউ ভবিষ্যতে কখনো এ ব্যবসা না করার সংকল্প করেছেন; কারো কারো কিছু শেয়ার অবশিষ্টও রয়ে গেছে। এদের ক্ষেত্রে শর'ঈ হুকুম কী?

এ প্রশ্নের উত্তর জানার আগে একটি কথা মনে রাখতে হবে। তা হলো, একজন লোক বিপদে জড়িয়ে পড়ার পর তা থেকে মুক্ত হতে চায়, আরেকজন ভবিষ্যতে স্বেচ্ছায় সেই বিপদে জড়াতে চায়। দু'জনের হুকুমে ক্ষেত্র বিশেষে একটু পার্থক্য হয়। কাজেই নতুন করে এ ব্যবসা শুরু করা, বা পুরাতন ব্যবসায়ীর জন্য এতে জুড়ে থাকা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টি তো নির্ধারিত। সুদের অংশ সদকা করবেন এ নিয়তেও তাদের জন্য এ ব্যবসায় প্রবেশ করা জায়িয হবে না। কিন্তু যারা হালাল পণ্য উৎপাদনকারী বা বৈধ পণ্যের ব্যবসা করে এমন কোম্পানির প্রাইমারী বা সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে ইতিপূর্বে আয় করেছেন, তারা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিসমূহের বিগত দিনের 'ব্যালেন্সশীট' দেখে নিবেন। ব্যালেন্সশীটে আয়ের মধ্যে যদি সুদের অংশ উল্লেখ থাকে তাহলে সে অংশ অনুপাতে, বরং সতর্কতামূলক কিছু বেশি টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবেন। অনুরূপভাবে শেয়ারবাজার যখন জুয়াড়িদের ষড়যন্ত্র, বা 'মার্চেন্ট ব্যাংক' সমূহের অতিমাত্রিক লোনের প্রভাবে কৃত্রিমতায় ভাসছিল তখন যারা রাতারাতি লাখ লাখ টাকা বানিয়েছেন তারাও কোম্পানির বাস্তব অবস্থার সাথে

তুলনা করে অস্বাভাবিক আয়টুকু সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবেন। আর যাদের নিকট এখনো কোনো কোম্পানির শেয়ার বিদ্যমান আছে তারা তাদের শেয়ারের বাজার-মূল্য কোম্পানির 'নীট অ্যাসেট ভ্যালু'র সমপরিমাণ হলেই বিক্রয় করে এ ব্যবসা থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়বেন। এতে যদি আর্থিক ক্ষতি হয় তাহলে পরকালের কথা ভেবে সেই ক্ষতি মেনে নিবেন।

আর যারা ব্যাংক-বীমা ও হারাম কারবারে জড়িত কোম্পানির শেয়ার দ্বারা ব্যবসা করেছেন তাদের তো সম্পূর্ণ আয়ই সদকা করে দেওয়া জরুরী। এক সাথে সম্ভব না হলে আস্তে আস্তে সদকা করতে থাকবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সকলেই আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাঁটি মনে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। আল্লাহ তা'আলা সকলকে নিজ অপার কৃপায় ক্ষমা করুন। আমীন।

ব্যাংক ডিপোজিটের প্রকারভেদ ও তার শরয়ী বিধান

ব্যাংকিং পরিভাষায় ব্যাংক ডিপোজিট চার প্রকার:

১. কারেন্ট একাউন্ট (Current Account) বা চলতি হিসাব।

২. সেভিংস একাউন্ট (Savings Account) বা সঞ্চয়ী হিসাব।

৩. ফিক্সড একাউন্ট (Fixed Deposit) বা নির্ধারিত মেয়াদি সঞ্চয়।

৪.লকার (Locker) তথা ব্যাংক থেকে লোহার বক্স ভাড়া নিয়ে তাতে টাকা পয়সা বা মূল্যবান সামগ্রী রেখে তা ব্যাংকের নিকট আমানত রাখা। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৩-১৫)

ব্যাংক ডিপোজিটগুলোর শরয়ী অবস্থান:

প্রথম তিন প্রকার করজের হুকুমে দুটি শর্তের কারণে:

এক. এই তিন প্রকারের (কারেন্ট, সেভিংস ও ফিক্সড) ডিপোজিটারগণ ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে তাদের অর্থের যামিন বা জিম্মাদার বানায়।

দুই. ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে তাদের গচ্ছিত অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহারের সার্বিক ক্ষমতা প্রদান করে থাকে।

চতুর্থ প্রকার তথা লকার (Locker) এটা বর্তমান প্রচলন ও শরয়ী দৃষ্টিকোণ উভয় বিবেচনায় আমানত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। (ফিকহী মাকালাত ৩/১৮)

সাধারণ ব্যাংগুলোতে অর্থ রাখার শরয়ী হুকুম:

১. জান ও মালের নিরাপত্তার খাতিরে কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখা জায়িয আছে। যেহেতু কারেন্ট একাউন্ট হোল্ডারদেরকে ব্যাংক কর্তৃক কোন মুনাফা প্রদান করা হয় না। বরং তাদের থেকে উল্টা সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য চার্জ কাটা হয়। অতএব, কারেন্ট একাউন্টে টাকা রাখলে সুদি লেন-দেনে অংশগ্রহণ গণ্য হবে না। সুতরাং তা জায়িয আছে।

২.ফিক্সড ডিপোজিট ও সেভিংস একাউন্টে টাকা রাখা জায়িয নেই। কারণ এই উভয় প্রকার একাউন্ট হোল্ডারদেরকে ব্যাংক কর্তৃক মুনাফা প্রদান করা হয় এবং এই উভয় একাউন্টে গচ্ছিত টাকা উম্মতের ঐক্যমতে করজের হুকুমে। আর করজের বিনিময়ে লাভ হাসিল করা শরীয়তে সূদ। অতএব ব্যাংক একাউন্ট হোল্ডারদেরকে মূল টাকার অতিরিক্ত যে টাকাই প্রদান করবে তা স্পষ্ট সূদ হবে। আর সূদ বৈধ হওয়ার কোন সুরত নেই।

সুতরাং যে ব্যক্তি উল্লেখিত একাউন্টে টাকা রাখবে সে ব্যাংকের সাথে হারাম লেন-দেনে শরীক হয়ে যাবে। এ কারণে কোন মুসলমানের জন্য এই দুই প্রকার (সেভিংস এবং ফিক্সড ডিপোজিট) একাউন্টে টাকা রাখা জায়িয নেই । কেউ রেখে থাকলে সুযোগ থাকলে সে একাউন্ট পরিবর্তন করে চলতি হিসাব খুলে সেখানে টাকা রাখবে। আর যদি কোন কারণে চলতি হিসাব খুলতে অপারগ হয় এবং জান ও মালের নিরাপত্তার জন্য সেভিংস একাউন্ট খুলতে বা জারী রাখতে বাধ্য হয়, তাহলে সে ইস্তিগফার করতে থাকবে এবং ঐ একাউন্টে যে সূদ আসবে তা সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া মিসকিনদেরকে বা মসজিদ মাদরাসার বাথরুম নির্মাণের জন্য (কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে) দিয়ে দিবে।

ইসলামী ব্যাংকগুলোর হুকুম:

ইসলামী ব্যাংক একটি মহত উদ্যোগ। উদ্যোক্তাদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। যদি এটিকে তারা পূর্ণ ইসলাম অনুযায়ী পরিচালনা করেন। যার জন্য জরুরী হলো;

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এই মর্মে অনুমতি না নিয়ে থাকলে অনুমতি নিবে যে, ব্যাংক সরাসরি নিজে বাণিজ্যিক মাল আমদানি ও রপ্তানি করবে।

(খ) প্রত্যেক শাখার কারবার প্রত্যক্ষ করার জন্য একজন বিজ্ঞ আলেমে দ্বীন থাকবে এবং সর্বময় কর্তৃত্ব ম্যানেজারের নয়, মজলিসে শূরার হাতে থাকবে। (ইসলাম আওড় জাদীদ মায়ীশাত পৃ. ১২৬)

১. ইসলামী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট সাধারণ ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের মত জায়িয আছে।

২. ইসলামী ব্যাংকগুলো সেভিংস এবং ফিক্সড ডিপোজিটারদের সাথে টাকা বিনিয়োগের বিভিন্ন ব্যবসায়িক খাত দেখিয়ে যে চুক্তি করে থাকে তাকে শরিয়তের পরিভাষায় আকদে মুযারাবাহ বলে। আর ডিপোজিটারদের পরস্পরের মাঝে হয় আকদে মুশারাকাহ বা অংশীদারিত্বের চুক্তি। যারা সকলে মিলে তাদের অর্থ ও শ্রম ব্যাংকের নিকট সোপর্দ করেছে লাভ-লোকসানের মধ্যে শরীক হওয়ার ভিত্তিতে। ব্যাংক তাদেরকে নির্দিষ্ট পার্সেন্টিস হিসেবে লাভ দিবে। আর ক্ষতি হলে মুনাফা দ্বারা তা পূরণ করা সম্ভব না হলে ডিপোজিটারকেও তার অংশ অনুপাতে লোকসানের বোঝা নিতে হবে। বাস্তবে এমনটি হলে তা জায়িয হবে। কিন্তু সরেজমিনে অনুসন্ধান

করে দেখা গেছে, ইসলামী ব্যাংকগুলো সূদী ব্যাংকগুলোর সাথে পাল্লা দিয়ে সূদী লেন-দেনের সাথেই বেশী জড়িত। তারা মুখে মুখে হালাল মুনাফা প্রদানের কথা বললেও সহীহ তরীকায় ইনভেস্ট করে না তথা বেচা-কেনার মধ্যে শরীয়ত যে-সব শর্ত আরোপ করেছে তা সঠিকভাবে রক্ষা করে না। খাতা কলমে ঠিক দেখালেও বাস্তবে করে খামখেয়ালী এবং জনবল না থাকার দোহাই দিয়ে থাকে যা অগ্রহণযোগ্য।

তাই প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকগুলোতেও সেভিংস এবং ফিক্সড ডিপোজিট একাউন্ট খোলা জায়িয হবে না। যতক্ষণ না তারা তাদের কার্যক্রম বাস্তব ক্ষেত্রেও শরয়ী পন্থায় নিয়ে আসে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতায় তাদের কার্যক্রম সম্পূর্ণ শরীয়ত ভিত্তিক প্রমাণ করতে না পারে। (আল মাবসূত লিস্ সারাখসী ২২/১৩৩)

অমুসলিম দেশের ব্যাংকের হুকুম:
অমুসলিম দেশের অমুসলিম মালিকদের ব্যাংক কর্তৃক প্রদেয় সূদ গ্রহণের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কিরামের সমর্থন রয়েছে। যেহেতু তারা এই টাকা মুসলমানদের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করে এবং এর মাধ্যমে তারা মুসলমানদেরকে দুর্বল করার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে। কাজেই সূদের টাকা ব্যাংকে না ছেড়ে উঠিয়ে নিবে। তার পর সাওয়াবের নিয়ত না করে মিসকিনদেরকে দিয়ে দিবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/২২)

সূদী টাকার হুকুম:
যারা শরয়ী বিধান না জানার কারণে শরীয়ত বিরোধী পন্থায় লেন-দেন করার কারণে কিছু সূদী টাকা তার মালিকানায় চলে এসেছে কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধি-বিধানের পাবন্দি ছিলনা। কিন্তু এখন সে তাওবা করে সূদ থেকে মুক্তি পেতে চাচ্ছে, তারা সাওয়াবের নিয়ত ছাড়া ঐ টাকা ফকীর-মিসকিন অথবা কোন কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে দিবে। (ফিকহী মাকালাত ৩/২২)

শরী'আতের দৃষ্টিতে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং ব্যবসা

এম.এল.এম.তথা মাল্টিলেভেল মার্কেটিং এর পরিচয়:
বর্তমানে মাল্টিলেভেল মার্কেটিং সম্পর্কে কম-বেশি অনেকেই জানে। তথাপি এ সম্পর্কে জরুরী কিছু ব্যাখ্যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

"মাল্টি" অর্থ বহু, নানা। "লেভেল" অর্থ স্থর। "মার্কেটিং" অর্থ ক্রয়-বিক্রয়, বাজারে বিক্রয়ের জন্য পণ্য ছাড়া। একক শব্দগুলি একত্রিত করলে অর্থ দাড়ায়, অনেক স্থর বিশিষ্ট বিপণন। এই অর্থ থেকেই এই ব্যবসার হাকীকত বুঝে আসে। যেমন:

[ক] অনেক স্থর বিশিষ্ট বিপণন মানে প্রথম ক্রয়-বিক্রয়ের পরই কারবার শেষ হয় না; বরং সামনে অনেক স্থরে এটি চলমান থাকবে।

[খ] এখানে দুটি পদবী একত্রে অর্জিত হয়। ১. ক্রেতা ২. পরিবেশক। দুনিয়ার অন্যান্য কারবারে কেনা শেষ হওয়ার পর একটি পদবী অর্জিত হয়, তা হল ক্রেতা, আর জিনিস ও একটিই অর্জিত হয়, তা হল পণ্য বা নির্ধারিত সেবা, কিন্তু এখানে পদবী দুটি জিনিসও দুটি। একটি হলো পণ্য, অপরটি ডিষ্ট্রিবিউটরশীপ বা পরিবেশক হওয়ার যোগ্যতা। যেমন:আপনি ওদের থেকে একটি পানি বিশুদ্ধিকরণ মেশিন কিনলেন। এই ক্রয় দ্বারা আপনি দুটি জিনিস অর্জন করলেন। একটি হলো মেশিন, আরেকটি হলো কোম্পানি থেকে কমিশন লাভের যোগ্যতা। অর্থাৎ আপনি আরো ক্রেতা জোগাড় করে দিতে পারলে কোম্পানি থেকে কমিশন পাবেন। এতে বুঝা গেল, বিক্রয়টা এক স্থরে শেষ হয় না; বরং আপনার মাধ্যমে এবং আপনার পরবর্তী লোকদের মাধ্যমে তা অনেক স্থরে বিস্তৃত হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে।

ধরুন: “গাছপালা লিমিটেড” নামক একটি কোম্পানি পাঁচ বছর পর লাভসহ মূলধন ফেরত দেয়ার শর্তে পাঁচ হাজার টাকার বিনিময়ে ‘ক’ নামক ব্যক্তিকে ক্রেতা পরিবেশক বানাল। এরপর ‘ক’ নামক লোকটি উক্ত শর্তে ‘খ’ ও ‘গ’ নামক আরো দুজনকে ক্রেতা- পরিবেশক বানাল। অতঃপর ‘খ’ ও ‘গ’ প্রত্যেকে যথা ক্রমে কোম্পানিতে ‘ঘ’ ‘ঙ’ এবং ‘চ’ ‘ছ’ কে ভেড়াল। এভাবে প্রত্যেক নতুন ব্যক্তি দুজন করে ক্রেতা- পরিবেশক বানাবে।

উপরোক্ত উদাহরণে ‘ক’ নামক ব্যক্তি যেমনিভাবে ‘খ’ ও ‘গ’ নামক ব্যক্তিকে জোগাড় করার জন্য কোম্পানি থেকে কমিশন পাবে তেমনিভাবে নিম্ন স্থরের প্রত্যেক ব্যক্তি ঘ,ঙ,চ,ছ, সহ আরো যতজন এই লাইন দুটিতে নিচের দিকে যোগ হবে তাদের প্রত্যেকের অন্তর্ভুক্তির জন্য কোম্পানি তাকে কমিশন দিবে। এভাবে আপ লেভেল তথা উপরের স্থরের ক্রেতাগণ ডাউন লেভেল তথা নিম্ন স্থরের ক্রেতা- পরিবেশকদের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করতে থাকবে।

এম.এল.এম কোম্পানিগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য এক হলেও কোম্পানি ভেদে এর নিয়মাবলী ও কমিশন বণ্টনের পদ্ধতি ও পরিমাণ ভিন্ন হয়ে থাকে। সাধারণত এ পদ্ধতির প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের নিয়ম হলো, ডান ও বাম উভয় পাশের নেট না চললে এ স্থরের কোন ব্যক্তি কমিশন পায় না। অর্থাৎ কেউ যদি শুধু একজনকে ক্রেতা পরিবেশক বানায় তাহলে সেও কমিশন পাবে না এবং তার উপরের স্থরের ব্যক্তিগণও কমিশন পাবে না।

এম.এল.এম এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উল্লেখ কারার পর এখন দলীলসহ এর শরয়ী হুকুম বর্ণনা করা হলো:

এম.এল.এম এর শরয়ী হুকুম:

মাল্টিলেভেল মার্কেটিং সিস্টেম শরী'আতের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়িয ও হারাম। নাজায়িয হওয়ার কয়েকটি কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

১. শরী'আতের একটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি হলো, বেচা-কেনা হবে সরাসরি । বিনা প্রয়োজনে মধ্যসত্ত্বভোগী সৃষ্টি হবে না। ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে অযাচিতভাবে বিভিন্ন স্থর ও মাধ্যম সৃষ্টি করা শরী'আতের পছন্দ নয়। এজন্যই 'তালাক্কিয়ে জালাব' ও 'বাইয়ুল হাযির লিল বাদীর' উপর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। (সহীহ মুসলিম হা. নং ৩৭৯২, ৩৭৯৭)

২. শরীআতে ক্রেতা তথা ভোক্তার স্বার্থ বিক্রেতা তথা ব্যবসায়ীর স্বার্থের উপর প্রাধান্য পায়। এ জন্য শরীআত দালালীকে অপছন্দ করে। (সহীহ মুসলিম হা নং ৩৭৯১) কারণ, এর দ্বারা বিক্রেতা ও দালাল উপকৃত হলেও ভোক্তা ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

শরী'আতের এ দুটি দৃষ্টিভঙ্গিই এম.এল.এম এর সাথে সাংঘর্ষিক। প্রথম উসূলটি ছিল, বেচাকেনায় অযাচিত মধ্যসত্ত্বভোগী সৃষ্টি না হওয়া। অথচ এম.এল.এম এর মধ্যে এক পণ্য বা সেবার উপকারভোগী হয় অনেক স্থরের লোক। কারণ, পরিবেশককে যে কমিশন দেওয়া হয় তা মূলত ক্রেতার অর্থ থেকেই দেওয়া হয়। এতে ক্রেতা চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। কারণ, ক্রেতা এই একই মানের পণ্য সাধারণ বাজার থেকে কিনলে অনেক কমে কিনতে পারতো। অথচ এম.এল.এম কোম্পানি নিজ ডিষ্ট্রিবিউটরদের কমিশন দেওয়ার স্বার্থে ঐ একই মানের পণ্য প্রায় দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রি করছে। আর এতে যেহেতু ভোক্তার স্বার্থ ক্ষুণ্য হচ্ছে তাই এই পদ্ধতি শরীয়ত সমর্থন করে না।

৩. আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন 'তোমরা বাতিল পন্থায় অন্যের মাল খেওনা' এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, বিনিময়হীন উপার্জনই হলো বাতিল পন্থার উপার্জন। (আহকামুল কুরআন, জাস্সাস ২/১৭২) এম.এল.এম এর মধ্যে বাতিল পন্থায় অন্যের মাল ভক্ষণ করাও পাওয়া যায়। কারণ, এম.এল.এম কারবারে ডাউন লেভেল থেকে আপ লেভেলে যে কমিশন আসে তা বিনিময়হীন হাসিল হয়। অতএব, এই কমিশন অন্যের সম্পদ বাতিল পন্থায় আহরণের অন্তর্ভুক্ত।

৪. লেন-দেনের ক্ষেত্রে শরী'আতের একটি উসূল হলো চুক্তির সময় পণ্য বা সেবা সুনির্ধারিত হতে হবে। যেন এ নিয়ে পরবর্তীতে ঝগড়া-বিবাদ না হয়। কিন্তু,এম.এল.এম এই উসূলেরও পরিপন্থী। কারণ, এম.এল.এম এর একজন ক্রেতা-পরিবেশক কোম্পানিকে তার নির্ধারিত টাকাগুলি দিচ্ছে দুটি জিনিসের বিনিময়ে ১. নির্ধারিত পণ্য বা সেবা । ২. পরিবেশক হিসেবে কমিশন প্রাপ্তি। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিনিময়ের প্রথমটি জানা থাকলেও দ্বিতীয়টি অজানা। কারণ, ক্রেতা নিজের ডানে-বামে সদস্য বানাতে পারবে কিনা , পারলেও দুজন বানাতে পারবে কিনা,

কমিশন সে কোন সময় থেকে পেতে শুরু করবে, কত স্থর পর্যন্ত চলবে, এসব কিছুই অনির্ধারিত, অজানা। তাই এই উসূল অনুযায়ীও এম.এল.এম শরীয়ত বিরোধী।

৫. বেচা-কেনার মধ্যে আর একটি শর্ত হলো বেচা-কেনা "গরারু তথা প্রতারণা মুক্ত হতে হবে। আল মাবসূত এর ভাষ্যানুযায়ী "গরারু হলো, এমন চুক্তি যার পরিণাম অজানা। (কিতাবুল মাবসূত ১২/১৯৪) এম.এল.এম এর মধ্যেও "গরারু এর উপস্থিতি রয়েছে। পরিবেশক কোম্পানির সাথে চুক্তি অনুযায়ী নিজ ডাউন লেভেল থেকে কমিশন লাভ করতে থাকবে। অথচ তার ক্ষেত্রে আদৌ ডাউন লেভেল সৃষ্টি হবে কিনা, হলে তা কতদিন এবং কয়টি স্থর পর্যন্ত চলবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। যা শরী'আতের নিষিদ্ধ "আল গরারু এর বাস্তব দৃষ্টান্ত।

৬. হাদীস শরীফে একই কারবারের মধ্যে আরেকটি কারবারকে শর্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। (মুসনাদে আহমাদ ১/৩৯৮) অথচ এম.এল.এম এর মধ্যে এক কারবারকে আরেক কারবারের শর্ত করা পাওয়া যায়। তা এভাবে যে, এম.এল.এম কোম্পানিগুলোতে পণ্য ক্রয়ের শর্তেই শুধু পরিবেশক হওয়া যায়। অর্থাৎ কোম্পানি থেকে পণ্য ক্রয় ছাড়া পরিবেশক হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এখানে পণ্য ক্রয়কে পরিবেশক হওয়ার জন্য শর্ত করা হয়েছে। যা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

কোনও কোনও এম.এল.এম কোম্পানি উপরিউক্ত শরয়ী সমস্যা এড়ানোর জন্য দুটি পৃথক ফরমে ব্যবস্থা করেছে। একটি পণ্য খরিদের অর্ডার ফরম, অন্যটি পরিবেশক হওয়ার আবেদন ফরম। এভাবে হয়তো তারা বুঝাতে চাচ্ছে যে, এখানে পৃথক দুটি চুক্তি হচ্ছে। অথচ এসব কোম্পানির সাথে জড়িত সবাই জানে যে, কার্যক্ষেত্রে একটি চুক্তির জন্য অন্যটি এখনো জরুরী শর্ত। অর্থাৎ পণ্য ক্রয় ছাড়া (দুটি ফরম করা সত্ত্বেও) পরিবেশক হওয়ার কোন উপায় নেই। সুতরাং দুটি ফরম করার দ্বারা এক কারবারের মধ্যে আরেকটি কারবার শর্ত করার নিষেধাজ্ঞা থেকে বের হওয়া যায়নি; বরং তা আগের অবস্থাতেই বহাল আছে।

৭. বিনিময় বিহীন শ্রম এবং শ্রমবিহীন বিনিময় শরীয়তে নিষিদ্ধ। অথচ এম.এল.এম এর মধ্যে এই উভয় সমস্যা বিদ্যমান। বিনিময় বিহীন শ্রম এভাবে পাওয়া যায় যে, এম.এল.এম কোম্পানিগুলোর নিয়ম হলো একজন পরিবেশক যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ডানে-বামে দুজন সদস্য বানাতে না পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে কমিশন পাবে না। অথচ এমটি হওয়া খুব স্বাভাবিক যে, এই পরিবেশক প্রাণান্ত চেষ্টা করার পরও ডানে-বামে দুজন ক্রেতা জোগাড় করতে পারেনি কিংবা পারলেও নির্ধারিত পয়েন্টের ক্রেতা আনতে পারেনি। অথবা একজন জোগাড় করতে পেরেছে আরেকজন জোগাড় করতে পারেনি। এসব ক্ষেত্রে এই পরিবেশক শ্রম দেয়া সত্ত্বেও কোম্পানি থেকে এক পয়সাও কমিশন পাবে না। আর এই বিনিময় বিহীন শ্রমকেই শরীয়ত নিষেধ করেছে।

বর্তমানে কিছু কিছু কোম্পানি একজন ক্রেতা জোগাড় করতে পারলেও কমিশন দিচ্ছে। কিন্তু এভাবেও বিনিময় বিহীন শ্রম এর নিষেধাজ্ঞা থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। কেননা কেউ চেষ্টা করলো, কিন্তু কাউকে ক্রেতা বানাতে পারলো না তখন তো কোম্পানি তাকে শ্রমের বিনিময়স্বরূপ কিছু দিচ্ছে না।

আর শ্রমহীন বিনিময় এভাবে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তি নির্ধারিত পরিমাণ পণ্য খরিদান্তে পরিবেশক হওয়ার পর যদি সে দুজন ক্রেতা কোম্পানির জন্য নিয়ে আসে এবং তারা প্রত্যেকে আরো দুজন করে চারজনকে এবং এ চারজন দুজন করে আরো আটজনকে কোম্পানির সাথে যুক্ত করে, তবে প্রথম ব্যক্তি ২য় লেভেলের দু' ব্যক্তি নিজের ডাউন লেভেলে আট ব্যক্তি ক্রেতা-পরিবেশক হওয়ার সুবাদে কোম্পানি থেকে কমিশন পেয়ে থাকে। অথচ এ আটজনের কাউকেই প্রথম ব্যক্তি ও দ্বিতীয় স্থরের দুজন কোম্পানির সাথে যুক্ত করেনি; বরং এরা কোম্পানির সাথে যুক্ত হয়েছে সরাসরি তাদের উপরের ব্যক্তিদের রেফারেন্সে। তা সত্ত্বেও উপরের লেভেলের ব্যক্তিরা তাদের অন্তর্ভুক্তির কারণে নিজের কোন শ্রম ছাড়াই পারিশ্রমিক পাচ্ছে। আর এটাই শরী'আতের নিষিদ্ধ "শ্রমবিহীন বিনিময়ে"র বাস্তব দৃষ্টান্ত।

শরী'আতের দৃষ্টিতে এম.এল.এম নিষিদ্ধ হওয়ার কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা হলো। এ কারণগুলো ছাড়া আরো এমন কিছু সমস্যা রয়েছে যেসব সমস্যার কারণেও এম.এল.এম অবৈধ প্রমাণিত হয়। সংক্ষিপ্ত এ পরিসরে সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্ভব নয়।

আজকাল আলেম নামধারী কিছু লোক এম.এল.এম এর পথে বই ও লিফলেট বিতরণ করছে। এই স্বার্থান্বেষী মহলের বই পড়ে ধোঁকা খাবেন না। তারা তাদের বই এর মধ্যে যেসব অবান্তর প্রমাণ পেশ করেছে তার উত্তর ফেব্রুয়ারী ২০১২ এর আল কাউসারে দেখে নিবেন।

বি.দ্র. এই লেখায় বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়ার মুফতী বোর্ডের ফাতওয়া ও "মাসিক আল কাউসারু থেকে সাহায্য নেয়া হয়েছে।

পুরুষদের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস

১. পুরুষরা অলসতা বশত: বা কর্ম ব্যস্ততার অজুহাতে বা গাফলতির কারণে ঈমান শিক্ষা করে না এবং ফরযে আইন পরিমাণ ইলম অর্জন করে না। অথচ শরী'আত এটা ফরয ঘোষণা করেছে এবং এ ব্যাপারে কোন হিলা বাহানা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য পাঁচটি বিষয় শিক্ষা করা ফরযে আইন যথা: ঈমান, ইবাদাত, হালাল রিযিক, বান্দার হক ও আত্মশুদ্ধি; বিস্তারিত জানার জন্য "ইসলামী যিন্দেগী" নামক কিতাব দেখুন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৪)

২. নিজের বিবি বাচ্চাদের দ্বীনী জরুরী তা'লীম দেয়া থেকে উদাসীন থাকে অথচ এটাও তার উপর ফরয দায়িত্ব। (তারগীব তারহীব, পৃ.৩০৪৮)

৩. আত্মসমালোচনা না করে অপরের কাজ-কর্মের সমালোচনায় আনন্দ বোধ করে। আর এর দ্বারা যে গীবতের গুনাহ হচ্ছে সে কথা ভাবতেও চায় না। তেমনিভাবে অন্যের ব্যাপারে কু-ধারণা করে গুনাহগার হয়। (হুজরাত ;১২,জামে তিরমিযী, হা.১৯৮৮)

৪. সালামের অভ্যাস উম্মত থেকে বিদায় নিচ্ছে, যা ছিল গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত । অপর দিকে অনেকে তো সালামের উত্তরই দেয় না, আর কেউ দিলেও ঘাড় নেড়ে বা মনে মনে দেয় । অথচ উত্তর শুনিয়ে দেয়া ওয়াজিব। (শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৮৭৮৭)

৫. স্ত্রী থেকে নিজের হক পাওনা থেকে বেশি আদায় করে কিন্তু তার উপর স্ত্রীর যে অধিকার আছে তা আদায় করতে রাজি না। বরং অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের উপর জুলুম করে থাকে। এটা অন্যায়। (সূরা বাকারা:২২৮)

৬. সাংসারিক কোন কাজে পরিবারের অন্য কোন সদস্যের সাথে পরামর্শ করে না। যার কারণে পারস্পরিক অন্তঃকলহ বেড়ে যায়। স্ত্রী ও বুঝমান সন্তানদের সাথে পরামর্শ করবে, তার পর যেটা ভালো বুঝে আসে, যেটার মধ্যে কল্যাণ মনে হয় সেটার ফায়সালা দিবে। (সূরা আল ইমরান ; ১৫৯)

৭. নিজের বাবা মায়ের খেদমত স্ত্রীর উপর ফরয মনে করে , অথচ বাবা- মার খেদমত ছেলের দায়িত্ব , স্ত্রীর দায়িত্ব নয়। স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর খেদমত করা এবং সুযোগ মত নিজ পিতা মাতার খোঁজ-খবর রাখা। (সূরা বাকারা:৮৩)

৮. অনেক বোকা পুরুষ বিবাহের পর নিজ বাবা-মা, ভাই-বোনকে পর ভাবতে শুরু করে। আর শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দেরকে আপন মনে করে। এমনটা করা মোটেও ঠিক নয়। কারণ বাবা-মা, ভাই-বোনের ভালবাসা স্বার্থহীন হয়ে থাকে, কিন্তু শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের ভালবাসা অনেক সময় এমন হয় না। তাই উভয়কুলের আত্মীয়দের তাদের প্রাপ্য হক যথাযথভাবে দেয়া কর্তব্য। (সহীহ বুখারী ,হাদীস নং ৫৯৮৬)

৯. সন্তান ছেলে হওয়ার ব্যাপারে বেশি আগ্রহ থাকে, পক্ষান্তরে মেয়ে হলে স্ত্রীকে দোষারোপ করতে থাকে। অথচ ছেলে বা মেয়ে হওয়া আল্লাহর ইচ্ছা, এতে স্ত্রীর কোন দখল নেই। অপর দিকে মেয়ে সন্তানের ফযীলত অনেক বেশি, মেয়ে সন্তান লালন পালন ও দ্বীনী তা'লীমকে বেহেশতের সনদ বলা হয়েছে। (সূরা শূরা:৪৯, সহীহ বুখারী, হা. নং ১৪১৮)

১০. যৌবনের তাড়নায় ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে। ইসলামের হুকুম আহকাম মেনে চলে না । ইসলামী জীবন যাপন বার্ধক্যের জন্য গচ্ছিত রাখে। যেমন যুবক অবস্থায় হজ্জ ফরয হলেও তা আদায় করা বার্ধক্যের সময়ের দায়িত্ব মনে করে, অথচ এটা গুনাহের কাজ। তাছাড়া লম্বা হায়াতের গ্যারান্টি কী ? উল্লেখ্য যে, যে বছর হজ্জ ফরয

হয় সে বছর হজ্জে যাওয়া ওয়াজিব, দেরি করা গুনাহ। (সূরা ইনফিতার:৬ ,ফাতাওয়ায়ে শামী, খ.৩ পৃ.৫২০)

১১. অনেক পুরুষ স্ত্রীদের অন্ধভক্ত হয়ে থাকে। কোন প্রকার যাচাই বাছাই ছাড়া সবক্ষেত্রে স্ত্রীর কথাকে প্রাধান্য দিয়ে পিতা-মাতা, ভাই -বোনদের সাথে মহা ঝগড়া বাধিয়ে দেয়। এমনটা হওয়া মোটেও কাম্য নয়। বরং সব সময় স্ত্রীর অভিযোগ যাচাই করে তার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত । নচেৎ লোকদের সামনে বেকুব সাব্যস্ত হতে হয়। (সূরায়ে হুজরাতঃ ৬ , সহীহ বুখারী ,হাদীস নং ৩০৪)

১২. বিয়ের মজলিসে বেশি পরিমাণ মহরানা নির্ধারণ করা সামাজিক মর্যাদার বিষয় হিসেবে দেখা হয়। অথচ এটা মর্যাদার কোন বিষয় নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী ও কন্যাদের সর্বোচ্চ মহর ছিল দেড়শত তোলা রুপা বা তার সমমূল্য। তাছাড়া মোটা অংকের মহর ধার্যকালে অধিকাংশ লোকের তা পরিশোধ করার নিয়ত থাকে না যা অনেক বড় গুনাহ । বিয়ের মজলিসে নগদ আদায়কৃত মহরকেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অবশিষ্ট মহর আদায় করা সাধারনত পুরুষরা জরুরী মনে করে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামী প্রথম রাত্রেই কিংবা পরে কোন অন্তরঙ্গ মুহূর্তে স্ত্রী থেকে মহর মাফ করিয়ে নেয়। অথচ পুরুষ হয়ে মেয়েলোকের কাছে পাওনা মুক্তির ভিক্ষা চাওয়া কেমন আত্মমর্যাদাবোধের পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। (মাজমাউয্যাওয়ায়েদ, হা. নং ৭৫০৭)

১৩. উপার্জনের ক্ষেত্রে হালাল- হারামের তোয়াক্কা করে না। ন্যায়- অন্যায় যে পথেই পয়সা আসে সেটাই গ্রহণ করে থাকে এবং নিজের উপার্জনের মাধ্যমকেই রিযিকদাতা ভাবে। যে কারণে তা নষ্ট হলে পেরেশানির সীমা থাকে না অথচ এগুলো মাধ্যম বা রিযিক পৌঁছানোর পিয়ন মাত্র। আসল রিযিকদাতা হলেন মহান রাব্বুল আলামীন। কারো রিযিকের একটা পথ বন্ধ হলে তিনি আরো পথ খুলে দেন। (সূরা মুমিন:৫১, হুদ: ৬)

১৪. পুরুষেরা যখন কিছুটা বয়স্ক হয়ে যায়, এবং কারো উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তখন সর্বক্ষেত্রে তার কথাকেই সত্য বলে মনে করে। বাস্তবতা যাচাই না করে তার কথামত অন্যের উপর চড়াও হয়, যা জুলুমের শামিল। এই দুর্বলতা থেকে জ্ঞানীলোকেরাও মুক্ত নয়। (সূরায়ে হুজরাতঃ ৬)

১৫. অনেকে পিতা- মাতাকে সম্মান করে না। তাদের খোঁজ-খবর রাখে না। অথচ পিতা-মাতার সন্তুষ্টি ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না। এ জন্য পিতা-মাতার হক সমূহ সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া জরুরী। পিতা-মাতার হায়াতে সাতটি হক এবং মৃত্যুর পরে আরো সাতটি হক রয়েছে। বিস্তারিত জানতে আ'মালুস সুন্নাহ নামক কিতাব দ্রষ্টব্য। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৬৬২)

১৬. অনেক বদ মেজাযী পুরুষ সামান্য কারণে স্ত্রীকে মার-পিট করে থাকে। এমনকি রাগের মাথায় তিন তালাক দিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এজাতীয় পুরুষরা

আল্লাহর স্পষ্ট হুকুম “আর স্ত্রীর সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর (সূরা নিসা, আয়াত ১৯) এর উপর আমল করছে না এবং আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

১৭. অনেক ভবঘুরে স্বামীরা নিয়মিত সংসারের খোঁজ খবর রাখে না। তাদের হক আদায়ের কোন তোয়াক্কা করে না। অনেক মূর্খ মানুষ এটাকে বলে আল্লাহর উপর ভরসা করি। যা শরীআত বিরোধী কথা। এটাকে শরীআতে তাওয়াক্কুল বলা হয় না। অপর দিকে কিছু পুরুষ বিবিকে চাকুরীতে পাঠান। তাদের বিবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেপর্দাভাবে পয়সা রোজগার করেন। এটা খুবই গর্হিত কাজ । কারণ বাড়ির বাইরে গিয়ে এভাবে চাকুরী করা তাদের দায়িত্বও নয় এবং তা জায়িযও নেই। (সূরা নিসা: ৩৪)

১৮. অনেক ভাই, বোনদের পাওনা মীরাস আদায় করতে চায় না। অথচ বোনদের পাওনা আদায় করা ভাইদের উপর ফরয দায়িত্ব। এটা না করলে তাদের রিযিক হারাম মিশ্রিত হয়ে যায় এবং জান ও মালের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। আরো দুঃখজনক কথা হলো, অনেক জালিম পিতাও নিজের মেয়েকে মাহরূম করতে বা কম দিতে চেষ্টা করে থাকে অথচ হাদীস অনুযায়ী এটা সরাসরি জাহান্নামে যাওয়ার রাস্তা । (সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৮, মুসনাদে আহমদ, হা. নং ২১১৩৯)

১৯. পিতামাতার উপর সন্তানের অন্যতম হক হলো, তাদেরকে জরুরত পরিমাণ দ্বীনী ইলম শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং শরী‘আতের আদব কায়দা শিক্ষা দেয়া। কিন্তু অধিকাংশ পিতা-মাতা এ সম্পর্কে উদাসীন। এমনকি সন্তানরা বে-নামাযী হলে পিতামাতার কোন পেরেশানি দেখা যায় না। (সূরা তাহরীমঃ ৬, তারগীব তারহীব, হা.নং ৩০৪৮)

২০. অনেক পুরুষ স্ত্রী, সন্তানের নাজায়িয দাবী পুরা করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। অথচ স্রষ্টার অবাধ্য হয়ে সৃষ্টির বাধ্য হওয়ার মধ্যে কোন ফায়দা নেই। বরং এতে পরকালের আযাব বৃদ্ধি করা হয়, যার মধ্যে বিবি বাচ্চারা শরীক হবে না। তবে তাদের আযাব তারা ভিন্নভাবে পাবে। (সূরা ইসরা: ২৬, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৫৭)

২১. স্বামীরা স্ত্রীদের দায়িত্ব তথা সংসার সামলানোকে ছোট নজরে দেখে এবং এটা স্ত্রীর দায়িত্ব মনে করে তাই এটার কোন মূল্যায়নও করে না। এবং কখনোই স্ত্রীর রান্নাবান্নার এবং অন্যান্য ভালো কাজের শুকরিয়া আদায় ও প্রশংসা করতে চায় না। এতে স্ত্রীরা সাংসারিক কাজে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। অথচ স্বামীর সামান্য প্রশংসায় স্ত্রী হাজারো কষ্টের কাজ হাসি মুখে আঞ্জাম দিতে পারে। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৫৫)

২২. অনেকে বিয়ের পর স্ত্রী পক্ষ থেকে যৌতুক গ্রহণ করে। কেউ কেউ যৌতুকটাই ভিন্ন নামে ভিন্নভাবে গ্রহণ করে। অথচ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে বা কৌশল করে কারো থেকে ধন-সম্পদ হাসিল করা হারাম। (সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৮, মুসনাদে আহমাদ, হা. নং ২১১৩৯)

২৩. পুরুষরা সাধারণত বিবাহের জন্য পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈহিক সৌন্দর্য ও বিত্তবৈভবকে দ্বীনদারীর উপরে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ হাদীসে দ্বীনদারীকে সৌন্দর্য ও সম্পদের উপর অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে এবং এরই মধ্যে কামিয়াবী নিহিত আছে বলা হয়েছে। এর ব্যতিক্রম করলে সুখ শান্তি তো হয়ই না বরং দুনিয়া ও আখিরাত ধ্বংস হয়। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ৫০৯০)

২৪. অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকেরা দ্বীনের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে, দ্বীনী কোন সমস্যায় আলেমদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না। নিজের আত্মার ব্যাধির চিকিৎসার জন্য (যা ফরযে আইন) কোন বুজুর্গ লোকের সান্নিধ্যে যাওয়া প্রয়োজনীয় বা জরুরী কিছু মনে করে না। অথচ আত্মশুদ্ধি অর্জন না করার দরুন "রিয়া" বা লোক দেখান অন্তঃব্যধির কারণে, সারা জীবনের সকল ইবাদত-বন্দেগী নষ্ট হয়ে যায় । যেমন, হাদীসে পাকে যে তিন ব্যাক্তিকে সর্ব প্রথম জাহান্নামী বলা হয়েছে তারা আত্মশুদ্ধি না করানোর অপরাধে এ শাস্তির উপযুক্ত বিবেচিত হবে। (সূরা আশশামসঃ ৯, সূরা নাহলঃ ৪৩,সহীহ মুসলিম, হা. নং ৪৯২৩)

২৫. যারা কোন আল্লাহওয়ালা বুযুর্গ এর সাথে সম্পর্ক রাখে কিংবা তাবলীগে কয়েক চিল্লা সময় লাগায়, তাদের অনেকের হালাত এই যে, তারা নিজেদেরকে দ্বীনী ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানী মনে করে এবং নিজেকে অনেক কিছু মনে করে যা তাকাব্বুর এর শামিল। এমনকি কেউ কেউ অন্য আলেমদের সহীহ কথা-বার্তাও মানতে চায়না। তাদের কথা সুকৌশলে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাদের ভুল অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। এটা মারাত্মক অপরাধ। সঠিক কথা যেই বলুক না কেন তা গ্রহণ করা জরুরী। (সূরা নিসাঃ ৫৯, শুআবুল ঈমান, হাদীস নং ৮১৪০)

২৬. সুশীল সমাজের অনেকে গৃহ পরিচারিকাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করে থাকে, আর বাইরে মানবাধিকার কর্মী হিসাবে পুরষ্কার গ্রহণ করে। তাদের কথায় ও কাজে মিল না থাকায় তারা মুনাফিক সাব্যস্ত হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৪৭)

২৭. অনেক নব্য শিক্ষিত লোকেরা কুরআন হাদীসের বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যা পড়ে নিজেকে ইসলামী চিন্তাবিদ মনে করে। এমনকি হাদীস ও ফিকহের অনেক বিষয়ে দ্বীনের বিশেষজ্ঞ তথা হক্কানী আলেমদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয় । এদের ব্যাপারে হাদীসে কঠোর ধমকি এসেছে । এদের উচিত হক্কানী উলামাদের সমালোচনা ছেড়ে দিয়ে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করা। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হা. নং ২৬০)

২৮. অনেকে দ্বীন শেখার জন্য আলেমদের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করে না। বরং বিভিন্ন ইসলামী (?) টিভি চ্যানেল বা ইন্টারনেট প্রোগ্রামকে দ্বীন শেখার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে। এবং এসব চ্যানেলের কতিপয় লেকচারারকে এবং কিছু উলামায়ে "ছু" কে নিজেদের ধর্মগুরু মনে করে। অথচ এই সবগুলোই গোমরাহির মাধ্যম। কিয়ামত পর্যন্ত ঈমান ও আমল হাসিলের একমাত্র পথ হক্কানী উলামায়ে কিরামের সাহচর্য। (সূরা তাওবা:১১৯, সুনানে দারেমী, হাদীস নং ৪২৭)

২৯. সাধারণ মানুষ ব্যবসা, লেন- দেন, বিবাহ, তালাক ইত্যাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে এর হুকুম আহকাম সম্পর্কে উলামাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে না। যখন কঠিন কোন সমস্যায় নিপতিত হয়, তখন আলেমদের কাছে ছুটে আসে অথচ পূর্বেই যদি সে আলেমদের সাথে পরামর্শ করে নিত, তাহলে হয়তো এই সমস্যার সম্মুখীন হতো না। অথবা সমাধান দেয়া সহজ হতো। (সূরা নাহলঃ ৪৩)

৩০. ছেলেরা মনে করে পর্দা করা মেয়েদের দায়িত্ব। আর তাদের দায়িত্ব হলো রাস্তায় বের হয়ে মেয়েদের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকা। অথচ কুরআনে পর্দার আলোচনায় মহান রাব্বুল আলামীন আগে পুরুষদের সম্বোধন করে বলেছেন, "তোমরা তোমাদের দৃষ্টিকে নত করো। এবং কু-দৃষ্টিকে হারাম ও লানতের কাজ ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া বিবাহপূর্ব দেখা-সাক্ষাত, কথা-বার্তা, সম্পর্ক করা কুরআনে হারাম করা হয়েছে। (সূরা নূর: ৩০)

৩১. অনেকে মনে করে তার মধ্যে কোন দোষ নেই । অথচ তাকাব্বুর, রিয়া ইত্যাদি আত্মার ব্যাধিতে সে ভয়ংকরভাবে আক্রান্ত । কিন্তু হক্কানী শাইখদের সুহবতে না যাওয়ায় সে নিজেকে ফেরেশতা ভেবে বসে আছে। (সূরা হুজুরাতঃ ১২)

৩২. যুবকদের মধ্যে মিথ্যার আশ্রয়ে বয়স কমানো, আর বৃদ্ধদের মধ্যে বয়স বাড়ানোর বেশ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। উভয়টা ধোকা হওয়ার কারণে হারাম। (সহীহ বুখারী, হা. নং ২১৬২)

৩৩. স্ত্রী সম্ভোগ সাধারণভাবে জায়েয হলেও এ ব্যাপারে উত্তম হলো এ কাজটা 'নিজেকে গুনাহ থেকে বাঁচানো, স্ত্রীর হক আদায় এবং নেক সন্তান লাভের নিয়তে করা '। সেক্ষেত্রে এটা অনেক বড় ইবাদাত হিসাবে গণ্য হবে এবং আল্লাহ এধরণের লোকের সাহায্যের দায়িত্ব নেন। (জামে তিরমিযী, হা. নং ১৬৫৫)

৩৪. অনেকে শেষ জীবনে নিজের ওয়ারিশদের জন্য কোন বিশেষ সম্পদের ওসিয়্যত করে থাকে। অথচ ওয়ারিশদের জন্য ওসিয়্যত করা জায়িয নেই। আবার অনেকে হায়াতে সম্পদ বণ্টন করতে গিয়ে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া সন্তানদের মাঝে কম বেশি করে বণ্টন করে থাকে যা অনুচিত। এতে বান্দার হক নষ্ট করা হয়। হায়াতে সম্পদ বণ্টন করতে চাইলে ছেলে মেয়ে সকলকে সমান দেয়া উত্তম। (সুনানে দারা কুতনী, ৪/৩৭, ইমদাদুল আহকাম, ৪/৫৫,৫৮৬)

মহিলাদের কিছু বর্জনীয় অভ্যাস

১. জরুরী আকায়িদ, ইবাদত, সহীহ কুরআন তিলাওয়াত, পিতা-মাতা, স্বামীর হক ও সন্তানের হক সম্পর্কে ইলম হাসিল করে না অথচ জরুরত পরিমাণ ইলম অর্জন করা ফরয। অনেক পিতা-মাতাও এ ব্যাপারে উদাসীন। কিছু দুনিয়াবী ইলম শিক্ষা দেওয়াকে যথেষ্ট মনে করে। (সুনানে ইবনে মাজাহ ,হাদীস নং ২২৪)

২. সময়ের পাবন্দি করে না। নামায-ইবাদত, খানা, গোসল ইত্যাদি সকল কাজে তারা দেরি করে; এতে সংশ্লিষ্ট লোকেরা পেরেশান হয়ে যায় এবং অনেক জরুরী কাজ নষ্ট হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১২)

৩. দুই তিন জন একত্রিত হলে অন্যের দোষ চর্চায় লিপ্ত হয়। অথচ অন্যের দোষ চর্চা করা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, "(হে মুমিনগণ!) তোমরা কারো দোষ অনুসন্ধান, করো না। আর একে অন্যের গীবত (অগোচরে দুর্নাম) করো না; তোমাদের কেউ কী স্বীয় মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটা তো তোমরা অবশ্যই ঘৃণা করে থাকো! আর আল্লাহ কে ভয় করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড় তাওবা কবূলকারী, দয়ালু"। (সূরায়ে হুজুরাতঃ ১২)

৪. আপোষে সালাম দেয়ার অভ্যাস খুবই কম। নিজ বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী-সন্তানকেও তারা সালাম করতে অভ্যস্ত নয়, এমনকি কেউ তাদেরকে সালাম দিলে উত্তর দেয় না বা শুনিয়ে দেয় না। অথচ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরস্পরে সালাম আদান প্রদান করতে বলেছেন। (সহীহ বুখারী, হা. নং ২৮)

৫. চোগলখুরি তথা একের কথা অন্যের কাছে লাগানো অনেক মেয়েদের একটা বদ অভ্যাস। এ ধরণের অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকা খুবই জরুরী । হাদীসে এসেছে যে, এ গুনাহ কবরে আযাব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। (সহীহ বুখারী হাদীস, নং ১৩৭৮)

৬. সাধারণত মেয়েদের মধ্যে নিজেকে প্রদর্শনের মানসিকতা অধিক লক্ষ্য করা যায়। যদি তারা সাজ-সজ্জা করে তাহলে তা একান্তই পরপুরুষ বা অন্য কোন নারীকে দেখানোর জন্য করে যা একেবারেই অনুচিত। মেয়েদের উচিত হলো যথাসম্ভব ঘরে বসে স্বামীকে খুশি করার জন্য বেশি বেশি সাজ-সজ্জা করা , স্বামীর মনকে খুশী করা, এবং তার দৃষ্টি হিফাযতের ব্যাপারে সহায়তা করা , এর জন্য মহিলারা আল্লাহর দরবারে অনেক সাওয়াব পাবে। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬১)

৭. বর্তমান মেয়েরা সাজ-সজ্জার নামে অনেক নাজায়িয ও হারাম কাজ করে থাকে। যেমন, বিধর্মী ও অসভ্য মেয়েদের মত স্টাইল করে চুল কাটা , ভ্রূ'প্লাক করা, বিউটি পার্লারে গিয়ে গোপন স্থানের লোম পরিষ্কার করানো ইত্যাদি। (সুনানে আবু দাউদ হা. নং ৪০৩১)

৮. মেয়েদের জন্য সমস্ত শরীর আবৃতকারী মোটা কাপড়ের এমন ঢিলেঢালা পোশাক পরা জরুরী যাতে করে শরীরের রং, ভাজ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার আকৃতি বোঝা না যায় । কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে আজকের মেয়েরা অনেকে বোরকা তো চেনেই না আর ঢিলেঢালা পোশাক পরতেও ভুলে গেছে, যার কারণে সমাজে নারী নির্যাতনের মত জঘন্য অপরাধ অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলছে। (সূরা নূর: ৩১)

৯. অনেক মেয়েরা বাইরে পর্দা করে বের হলেও পারিবারিক জীবনে পর্দার ধার ধারে না। দেবর, ভাশুরদের সাথে পর্দার কথা চিন্তাও করে না। অথচ এদের সাথে পর্দা

করার কথা হাদীসে খুবই গুরুত্বের সাথে এসেছে। দেবরকে মৃত্যু সমতুল্য বলা হয়েছে। (জামে তিরমিযী হা. নং ১১৭১)

১০. অনেকে বোরকা পরিধান করে কিন্তু চেহারা খোলা রাখে অথচ চেহারা সকল সৌন্দর্যের সমষ্টি; চেহারা আবৃত করা জরুরী। চেহারা, মাথা, চুল বা উভয় চোখ খোলা থাকলে বোরকা অর্থহীন হয়ে পড়ে, এমন পর্দা শরীআতে গ্রহণযোগ্য নয় । এতে তারা ফরয তরক করার গুনাহে লিপ্ত হচ্ছে। আর অনেকে এমন নকশী বোরকা পরে যে তাতে পুরুষদের আকর্ষণ আরো বেড়ে যায় এবং বোরকার মূল উদ্দেশ্য ভূলুণ্ঠিত হয়। বোরকা মূল উদ্দেশ্য হলো, যাতে তার দিকে কারো আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। (সূরায়ে নূর: ৩১)

১১. কোথাও কোন প্রয়োজনে যেতে হলে, অযথা ঘোরাঘুরি করে যাত্রা বিলম্ব করে । শেষে গন্তব্যস্থানে অসময়ে এবং দুর্যোগ পোহায়ে পৌঁছতে হয়। অথচ অযথা বিলম্ব না করে একটু আগে বের হলেই পথের অনেক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। (জামে তিরমিযী হাদীস নং ২৩২৩)

১২. কোন স্থানে সফরে যাওয়ার সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামানপত্র নিয়ে বিরাট বোঝার সৃষ্টি করে, যা বহন করতে সঙ্গী পুরুষদের অনেক কষ্ট স্বীকার করতে হয়। বোঝা বহনের দায়-দায়িত্ব পুরুষদের মাথায় চাপিয়ে নিজেরা দিব্যি আরামে সফর করে থাকে। এমনটা করা একেবারেই অনুচিত। (সুনানে নাসাঈ হাদীস নং ৪৯৯৬)

১৩. হাতে টাকা থাকুক বা না থাকুক, কোন কিছু পছন্দ হলে তা অপ্রয়োজনীয় হলেও কিনতে হবে। এর জন্য ঋণ করতেও কোন দ্বিধা করে না। যদি ঋণ নাও করতে হয় তবু নিজ টাকা অপ্রয়োজনে খরচ করা বোকামি ও গুনাহের কাজ। যথা সম্ভব ঋণ করা থেকে বেঁচে থাকা উচিত । এতে যদি কষ্ট হয় হোক। হ্যাঁ, নিজের পছন্দের কোন জিনিস যদি স্বামীর নিকটও পছন্দনীয় হয় তাহলে ভবিষ্যতে যখন ঐ জিনিষের প্রয়োজন পড়বে তখন কিনবে। (সূরা আনআম আয়াত: ১৪১, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪০৮)

১৪. কেউ কোন উপকার করলে তার শুকরিয়া আদায় করে না। বিশেষত: ঘরের বউ-ঝিরা প্রশংসার যোগ্য কোন কাজ করলেও শাশুড়ি কিংবা ননদরা তার শুকরিয়া আদায় করে না। এটা বড়ই সংকীর্ণমনা হওয়ার পরিচায়ক । হাদীসে এসেছে, যে ব্যাক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহর শুকরিয়াও আদায় করে না অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার শুকরিয়া কবুল করেন না। তাই কেউ কোন প্রশংসাযোগ্য কাজ করলে তার শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আর এর জন্য জাযাকাল্লাহ খাইরান বলবে। এতে যার প্রশংসা করা হয় তার মধ্যে কাজের উৎসাহ উদ্দীপনা বহুগুণে বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তা'আলাও খুশি হন। (সহীহ বুখারী ,হাদীস নং ২৯,জামে তিরমিযী ,হাদীস নং ১৯৫৫)

১৫. শাশুড়িরা অনেক সময় পুত্রবধূদের কাজের মেয়ের মত মনে করে, কখনোই নিজের মেয়ের মত মনে করতে পারে না। যার কারণে অধিকাংশ যৌথ পরিবারে পুত্রবধূরা শাশুড়ি কর্তৃক নির্যাতিতা হয় এবং সংসারে কলহের আগুন লেগেই থাকে। সুতরাং পুত্রবধূকে নিজের মেয়ের সমান মর্যাদা দিতে না পারলে যত দ্রুত সম্ভব তাদেরকে পৃথক করে স্বাধীনভাবে চলার সুযোগ করে দেয়া জরুরী। (সহীহ বুখারী ,হাদীস নং ২৪৪৭, ফাতাওয়ায়ে শামী ৫/৩৬০)

১৬. পুত্রবধূরাও শাশুড়িদেরকে নিজ মায়ের মত ভাবতে পারে না। শাশুড়িকে তার প্রাপ্য অধিকার ও সম্মান থেকে বঞ্চিত করে। স্বামীকে নিজের একক সম্পদ মনে করতে চায় । যার কারণে সংসারে অনেক কলহের সৃষ্টি হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯৬৮)

১৭. স্ত্রীরা স্বামীর ইহসান তথা দয়া ও অনুগ্রহ স্বীকার করতে চায় না। কেউ জীবনভর স্ত্রীর সব চাহিদা পূরণ করে এসেছে হঠাৎ একদিন তার কোন চাহিদা পূরণ করা হলো না তখন সে বলে ফেলে তোমার সংসারে এসে জীবনে সুখের মুখ দেখলাম না। এমনটা করা বড়ই অন্যায় ও না শোকরী এতে স্বামীর মন ভেঙ্গে যায়। এটা মহিলাদের দোযখে যাওয়ার অন্যতম কারণ। আরেকটি বড় কারণ হলো, কথায় কথায় লানত ও বদ দু'আ করা। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৯)

১৮. স্বামী স্ত্রীর জন্য পছন্দ করে কোন জিনিস আনলো, কিন্তু ঘটনাক্রমে স্ত্রীর তা পছন্দ হলো না, তখন স্ত্রী স্বামীর মুখের উপর বলে দেয় আমার এটা পছন্দ হয়নি; আমি এটা পরবও না ছুইবও না। এটা অমানবিক। স্বামী কিছু আনলে পছন্দ না হলেও খুশি মনে গ্রহণ করা উচিত কারণ স্বামীকে খুশি করাই স্ত্রীর জন্য ইবাদত। (সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৯)

১৯. অনেক সময় টাকা, গহনা ইত্যাদি মূল্যবান জিনিস বালিশের নিচে বা খোলা যায়গায় রেখে দেয়, পরে হারিয়ে গেলে পরিবারের নিরপরাধ লোকদের দোষারোপ করতে থাকে। যা মারাত্মক গুনাহ। এগুলো সব সময় হেফাজতের সাথে নিরাপদ স্থানে রাখবে। (সূরায়ে হুজুরাত ১২, সহীহ বুখারী হাদীস নং ২৪০৮)

২০. মহিলাদের মধ্যে কর্মতৎপরতা ও দূরদর্শিতার বেশ অভাব রয়েছে ; ব্যস্ততার সময়ে কোন কাজ তারা ঝটপট করতে পারে না; গতিমন্থরতা যেন তাদের একটা অংশ। এতে অনেক সময় সুযোগ নষ্ট হওয়ার কারণে আসল কাজ পণ্ড হয়ে যায়। অথচ একটু খেয়াল করলেই সমস্যার সমাধান হতে পারে। সুতরাং অতি দ্রুত বা অতি ধীরে কাজ করবে না বরং মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। (জামে তিরমিযী,হাদীস নং ২০১২)

২১. দুই ব্যক্তি কোন বিষয়ে আলাপ করতে থাকলে অনেক মহিলা অযাচিতভাবে সেই কথায় অংশগ্রহণ করে এবং পরামর্শ দিতে থাকে। এটা বড়ই অভদ্রোচিত আচরণ। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ কোন পরামর্শ না চায় ততক্ষণ পর্যন্ত একেবারে বোবা ও বধির হয়ে থাকা চাই। তেমনি ভাবে কোথাও দু'জন কথা বার্তা বলতে থাকলে আড়াল থেকে

তা শ্রবণ করার চেষ্টা করবে না। কারণ এটা নাজায়িয। (সূরায়ে হুজরাত:১২,সহীহ বুখারী ,হাদীস নং ৭০৪২,৬৩৩৭)

২২. কোন কোন মহিলা মেয়েমহল থেকে এসে অন্য মহিলাদের অলংকার, শারীরিক গঠন, রূপ, পোশাক ইত্যাদির বর্ণনা নিজ স্বামীর কাছে করে থাকে। এর দ্বারা স্বামীর মন অন্য মহিলার দিকে আকৃষ্ট হলে যে নিজের কত বড় ক্ষতি হবে সে দিকে বিলকুল খেয়াল করে না। অতএব অন্য মেয়েলোকের রূপের প্রশংসা স্বামীর কাছে কক্ষনো করবে না; এটা নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারার ন্যায় অপরাধ। (মুসনাদে আহমদ ,হাদীস নং ৩৬০৮)

২৩. কারো সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে সে যত জরুরী কথা বা কাজেই লিপ্ত থাকুক না কেন সে দিকে খেয়াল না করে সে নিজের কথা বলবেই, ঐ ব্যক্তির কাজ বা কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে না। কিংবা অনুমতি নেওয়ার ও প্রয়োজন মনে করে না। এটা নিতান্তই বোকামি। (সহীহ বুখারী ,হাদীস নং ৬৩৩৭)

২৪. কেউ কিছু বললে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শোনে না; এর মাঝে অন্য কাজ করতে থাকে বা ফাঁকে ফাঁকে কারো কথার উত্তর দিতে থাকে। ফলে বক্তা মনে কষ্ট পায় এবং সে যে জরুরী কথাগুলো বলতে এসেছে তার অনেকটাই শুনাতে ব্যর্থ হয়। এমনকি পরে কৈফিয়ত চাইলে বলে যে, এ কথা তো আপনি আমাকে বলেননি। অথচ বলা হয়েছে সে মনোযোগ দিয়ে শোনেনি। (সুনানে নাসাঈ, হাদীস নং ৪৯৯৬)

২৫. নিজের ভুল-ত্রুটি স্বীকার করতে চায় না। বরং যথাসম্ভব কথার ফুলঝুরি দিয়ে দোষ চাপা দিতে চায়; চাই তার কথার মধ্যে যুক্তি থাক বা না থাক। এটা খুবই গর্হিত কাজ; ভুল হলে তা সাথে সাথে স্বীকার করে নিবে এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আশ্বাস দিবে। কারো হক নষ্ট করে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার থেকে মাফ চেয়ে নিতে দ্বিধা করবে না, কারণ অহংকার মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪৫৮)

২৬. কোন কথা বা সংবাদ বলতে গেলে অসম্পূর্ণ বলে থাকে, যদ্দরুন ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয় এবং আসল কাজ ব্যাহত হয়। সুতরাং কথা বলার সময় বুঝিয়ে সম্পূর্ণ কথা বা ঘটনা খুলে বলবে যেন কোন সন্দেহের অবকাশ না থাকে। (সুনানে নাসাঈ হাদীস নং৪৯৯৬)

২৭. এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়ার বা আসার সময় অনেক মহিলা অবশ্যই একটু কাঁদবে। কান্না না আসলেও কান্নার ভান করবে, অন্যথায় লোকেরা বলতে পারে যে মেয়েটার মনে একটুও মায়া নেই, কত পাষাণ। এই খোটা থেকে বাঁচার জন্য কৃত্রিম কান্না হলেও তাদের কাঁদা চাই। অথচ এটা ভুল প্রথা। (সূরা সদঃ ৮৬)

২৮. অলসতাবশতঃ ফরয গোসল করতে দেরি করা মেয়েদের একটা চিরাচরিত অভ্যাস। আজকে বিকালে কারো মাসিক বন্ধ হলো, তা সত্ত্বেও সে অবশ্যই পরদিন

দুপুরে গোসল করবে। আর এদিকে তিন চার ওয়াক্ত নামায স্বেচ্ছায় কাযা করে ফেলবে। অবশ্য অধিকাংশ মেয়েরা একথা জানে না যে, মাসিক যখনই বন্ধ হয়, তখনই গোসল করে নামায পড়া শুরু করতে হয়। চাই মাসিক সন্ধ্যার আগে বন্ধ হোক বা ফজরের আগে বন্ধ হোক। কোন ওয়াক্তের শেষের দিকে মাসিক বন্ধ হলেও ঐ ওয়াক্তের নামায তার জিম্মায় ফরয হয়ে যায়। ওয়াক্তের মধ্যে সময় না পেলে কাযা পড়া জরুরী। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬২৩, ফাতাওয়ায়ে শামী, খ.১ পৃ. ৩৩৪ রশীদিয়্যাহ)

২৯. বর্তমান আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা মেয়েরা উযূ গোসল সম্পর্কীয় মাসআলা মাসায়েল ও জানে না। গোসল কখন ফরয হয়, ফরয গোসল কিভাবে করতে হয়, এধরনের অতীব জরুরী কিন্তু সহজ মাসআলা সর্ম্পকেও তারা অজ্ঞ। মুসলমানের সন্তান হয়েও যারা এতটুকু জানে না তাদের জন্য বড় বিস্ময় !! তবে এর জন্য শুধু তারা নয় তাদের বাবা মা ও দায়ী হবে। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৪)

৩০. অনেক বোকা মহিলা স্বামী কর্মস্থান থেকে ফেরার সাথে সাথে তাকে শান্তি পৌঁছানোর পরিবর্তে, তার কানে সংসারের কলহ বিবাদের কথা পৌঁছায়। যদ্দরুন অল্পতেই স্বামীর মেজাজ বিগড়ে সামান্য বিষয়ে অনেক বড় দুর্ঘটনা ঘটে। তাই তেমন কিছু হয়ে থাকলে স্বামীর শরীর ও মন স্বাভাবিক ও শান্ত হওয়ার পর বলা এবং সঠিক সংবাদ বলা যাতে স্বামী বিষয়টা তদন্ত করলে মিথ্যুক সাব্যস্ত হতে না হয়। (সহীহ বুখারী,হাদীস নং ৩০৪)

৩১. অনেক ননদ ভাই বৌদের সহ্য করতে পারে না, এমনিভাবে অনেক ভাই বৌ ননদদের সহ্য করতে পারে না। এই মনোভাব সংসারকে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে না। সবার সাথে সুসম্পর্ক-সদ্ভাব বজায় রাখা এবং মিল মুহাব্বতের সাথে থাকা শরীআতে কাম্য। (সহীহ বুখারী ,হাদীস নং ৫৯৮৬, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২২৯০৬)

৩২. অনেক মেয়েলোক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন থাকে। অথচ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। সুতরাং নিজের শরীর, পোশাক, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার ও পরিপাটি রাখবে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩)

৩৩. কোন সন্তানকে হয়ত বেশী মুহাব্বত করে তার জন্য অনেক কিছু করে, এমনকি তার দোষ স্বীকার করতে চায় না। এটা ঠিক নয়। যোগ্যতার কারণে কারো প্রতি মুহাব্বত বেশী থাকতে পারে কিন্তু দেয়া নেয়ার ব্যাপারে সব সন্তানকে একই নজরে দেখা ইনসাফের দাবী। এর ব্যতিক্রম করলে অন্যদের উপর জুলুম করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৮৭)

৩৪. অনেক মহিলা রোগ শোক চাপা দিয়ে রাখে, কাউকে বলে না। অনেক জিজ্ঞাসার পরে বললেও ডাক্তার এর কাছে যেতে চায় না। ঔষধ এনে দিলে তাও ঠিকমত খায় না। এতে অনেক পেরেশানি হয়। রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে চিকিৎসার অযোগ্য হয়ে যায়। এটা বড়ই বোকামি। শরীর স্বাস্থ্য আল্লাহর তা'আলার অনেক বড়

নিয়ামত। এটাকে সুস্থ রাখা জরুরী যাতে করে এ শরীর দিয়ে দ্বীন দুনিয়ার ভালো কাজ আনজাম দেয়া যায়। (সুনানে আবু দাউদ হাদীস নং ৩৮৫৫)

৩৫. অনেক শিক্ষিতা মহিলা স্বামীর ঘরে আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করার চেয়ে বাইরে গিয়ে চাকুরী করাকে বেশি পছন্দ করে। অথচ সংসারের ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর দায়িত্ব। তার দায়িত্ব হলো সন্তান ও সংসার সামলানো। (সূরা নিসা:৩৪)

ইসলামে ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণের বিধান

আল্লাহ তা'আলার নিকট মনোনীত ধর্ম ও একমাত্র শান্তিময় ধর্ম হলো ইসলাম ধর্ম, যাতে নেই কোন ধরণের সঙ্কীর্ণতা ও লাগামহীন স্বাধীনতা এবং নেই এমন কোন আদেশ যা পালন করা দুষ্কর এবং নেই এমন কোন নিষেধ, যা বর্জন করা অসম্ভব। বরং তাতে রয়েছে সহজতা ও পূর্ণতা এবং ব্যাপকতা ও কোমলতা।

কিন্তু এই ধর্মের প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতার দরুন মুসলিমদের মাঝে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান, মুশরিক ও বিভিন্ন অমুসলিমদের সীমাহীন অপসংস্কৃতি ও অসভ্যতা অনুপ্রবেশ করেছে, যার অন্যতম হলো প্রাণীর ছবি আঁকা ও তোলা এবং ভাস্কর্য ও মূর্তি প্রস্তুত করা। তাই এই বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে সংক্ষেপে কিছু বিধি নিষেধ উল্লেখ করা হলো।

প্রাণীর ছবি আঁকা বিনা ঠেকায় ছবি তোলা সংরক্ষণ করা ও প্রদর্শন করার বিধান

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন প্রাণীর ছবি অংকনকারীরা সবচেয়ে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হবে (সহীহ বুখারী হাদীস নং৫৯৫০,সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২১০৯) তেমনি হযরত আবু তালহা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ঘরে কুকুর কিংবা প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। (সহীহ বুখারী শরীফ হা. নং ৫৯৪৯,সহীহ মুসলীম শরীফ হা. নং ২১০৬) অন্য হাদীসে আছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, আমি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে কেউ দুনিয়াতে কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করবে তাকে কিয়ামতের দিন বাধ্য করা হবে যেন সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে, অথচ সে তা করতে সক্ষম হবেনা। (সহীহ বুখারী হা. নং ৫৯৬৩,সহীহ মুসলিম হা. নং২১১০) ঠিক তেমনি হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ঘরে অঙ্কিত কিছু দেখলে তা বিনষ্ট করে দিতেন। (বুখারী হা. নং৫৯৬২)

এছাড়া আরো অনেক হাদীস, সাহাবায়ে কেরামের আছার, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন ও ফুকাহা কেরামের কথা দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রাণীর ছবি আঁকা বিনা ঠেকায় ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা বা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। ঠিক তেমনি কোন ব্যক্তির ছবি চাই সেটা কোন আলিম বা বুযুর্গের ছবি হোক না কেন নিজের সাথে বা ঘরে বরকত বা সৌন্দর্য কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা

বা ঝুলিয়ে রাখা শরী'আতের দৃষ্টিতে নাজায়িয তথা হারাম বরং শাস্তি ও অভিশাপযোগ্য কাজ। (সহীহ বুখারী হা. নং ৫৯৫১, ৫৯৫৩, ৫৯৫৪, ৫৯৫৫, ৫৯৬০, ৫৯৬২, ৫৯৬৪, ২২২৫, ১৩৪১ সহীহ মুসলিম হা.নং ৯৬৯, ৫২৮, ২১১১, ২১১২, ২১০৭, নাসাঈ হা.নং ৫৩৬৫, সহীহ ইবনে হিব্বান হা.নং ৫৮৫৩ মুসান্নাফে আবদুররাজ্জাক্ব হা.নং ১৯৪৯২, ১৯৪৮৬, মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা হা.নং ২৫৭০৬, ৩৪৫৩৮ শরহুননববী খ.২,পৃঃ ১৯৯ ফাতহুল বারী খ. ১০ পৃঃ৪৭০ উমদাতুল ক্বারী খ. ১৫ পৃ. ১২৪ ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী-৫/৩৫৯ ইমদাদুল মুফতীন পৃঃ ৮২৯)

ক্যামেরায় ছবি বা ফটোগ্রাফির হুকুম

পূর্বোক্ত আলোচনার দ্বারা বুঝা গেল যে, ছবি তোলা ও সংরক্ষণ করা বা প্রদর্শন করা সম্পূর্ণ হারাম, আর ক্যামেরায় ছবি যাকে আজকাল ফটোগ্রাফিও বলা হয়। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ফাতাওয়া এই যে, যন্ত্রের পরিবর্তনের কারণে ফটোগ্রাফি এবং হাতে অংকিত ছবির হুকুমে কোন পার্থক্য ধরা হবেনা। বরং ক্যামেরার ছবি, ফটোগ্রাফিও প্রকৃত ছবির প্রকারসমূহের মধ্যে এক প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং হাতের দ্বারা ছবি অংকনের ন্যায় সম্পূর্ণ হারাম হবে। (তাসবীর কী শরয়ী আহকাম পৃ.৬০, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম খ.৪ পৃ.১৬৩)

ফটোগ্রাফির ছবি এবং ডিজিটাল ক্যামেরায় বা মোবাইলের ছবির মধ্যে কোন পার্থক্য নাই

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের উন্নতির কারণে ছবি উঠানোর যে এক অত্যাধুনিক পদ্ধতি তথা ডিজিটাল ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে যে ছবি তোলা হয় যদি তা স্ক্রিনে ধারণ করে সংরক্ষণ করা হয় চাই কাগজে বা অন্য কিছুর উপর তার প্রিন্ট দেয়া হোক বা না হোক সেটা মূলত ছবিই এবং এতে ছবির সকল উদ্দেশ্য পূর্ণমাত্রায় পুরা হয় সুতরাং আধুনিকতার ছোঁয়া পেয়ে ডিজিটাল ক্যামেরা বা মোবাইলের ছবির পদ্ধতি যেমনই হোক না কেন তা প্রকৃত ছবি বলেই গণ্য হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বর্ণনা অনুযায়ী হারাম হবে । কোনো কোনো আলেম এটাকে জায়িয বলতে চেয়েছেন কারণ বাহ্যিকভাবে এটা ছবি মনে হয় না । কিন্তু লক্ষ্য উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে এটা ছবিই, কাজেই একে জায়িয বলার কোন অবকাশ নেই। (বুখারী হা.নং ৫৯৫০, উমদাতুল ক্বারী ১৫/১২৪, জাদীদ ফিকহী মাসাইল ১/৩৫০, আহাম মাসাইল জিনমে ইবতেলায়ে আম খ.১পৃ. ২০৩,২০১,২/২৬২)

হাফছবি বানানোর বিধান

শুধু চেহারা বা মাথা সহকারে উপরের অর্ধাংশের ছবি বিনা প্রয়োজনে আঁকা কিংবা তোলা নাজায়িয ও হারাম। হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বলেন, মাথার প্রতিকৃতির নাম হলো ছবি, আর যাতে মাথা নেই তা ছবি নয়। (শরহু মাআনিল আছার, খ.২পৃ.৩৩৯ নাসায়ী হা.৫৩৬৫ সহীহ ইবনে হিব্বান হা.৫৮৫৩ শরহুস সিয়ারিল কাবীর,সারাখছী খ.৪ পৃ.২১৯ ফাতহুল বারী খ.১০ পৃ.৪৭০)

প্রয়োজনের সময় ছবি তোলার বিধান

পূর্বোল্লিখিত আলোচনার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, বিনা প্রয়োজনে কোনো প্রাণীর ছবি উঠানো সম্পূর্ণ হারাম চাই সেটা সম্পূর্ণ ছবি হোক কিংবা হাফ ছবি হোক, তবে বিশেষ কোন প্রয়োজনের কথা ভিন্ন, যেমন: শরয়ী কোন জরুরত বা জীবনোপকরণের নিহায়াত প্রয়োজনে বহির বিশ্বে ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বা হজ্ব উমরার উদ্দেশ্যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে বাধ্য হয়ে পাসপোর্টের জন্য কিংবা ভিসার জন্য কিংবা ন্যাশনাল পরিচয়পত্র সংগ্রহের জন্য ছবি তোলা বা এমন বিশেষ কোন মুহূর্তে ছবি উঠানো যেখানে মানুষের মুখমণ্ডল সনাক্ত করা আবশ্যকীয় হয় এ ধরনের একান্ত কোন প্রয়োজনে ছবি তোলার অবকাশ আছে। কেননা ফুকাহায়ে কিরাম একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে হারাম হওয়ার বিধানটি শিথিলভাবে বিবেচনা করেছেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা হা.২৭১৭ শরহুস সিয়ারিল কাবীর খ. ৪পৃ.২১৮ তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম, তাকি উসমানী ৪/১৬৪)

যে সমস্ত ছবির ব্যবহার বৈধ

এক্ষেত্রে কয়েক ধরণের বস্তু রয়েছেঃ

১. জড়বস্তু, বৃক্ষলতা, নদী, সাগর, প্রাকৃতিক দৃশ্য ইত্যাদি প্রাণহীন বস্তু, তার প্রতিকৃতি প্রস্তুত করা বা তার ব্যবহার কিংবা ঘরে বা অন্য কোথাও লটকায়ে রাখা বৈধ। যদি তাতে শরী'আতের অন্য কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকে। (বুখারী হা.২২২৫ শরহুস সিয়ারিল কাবীর ৪/২১৯ ফাতাওয়ায়ে শামী ১/৬৫০)

২. বিচ্ছিন্ন কোন অঙ্গ যেমন: হাত, পা, চোখ ইত্যাদি (তাসবীর কী শরয়ী আহকাম মুফতীয়ে আজম শফী রহ. কর্তৃক ৭৮)

৩. কোন জানদারের ছবি যদি এত ছোট হয় যে, তার অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলো পরিপূর্ণ বুঝা যায় না এবং তা যদি মাটিতে রাখা হয় আর একজন মধ্যম জ্যোতিশীল ব্যক্তি সোজা দাঁড়িয়ে উক্ত ছবির অঙ্গগুলো পরিপূর্ণভাবে দেখতে না পায় (যেমন বিভিন্ন ক্যালেন্ডারে কাবা শরীফের যে ছবি থাকে) তাহলে এমন ছবি ব্যবহার করা বা ঘরে রাখা জায়িয। যদিও তা বানানো নাজায়িয। (ফাতাওয়ায়ে শামী খ.১ পৃ.৬৪৯, তাছবীর কী শরয়ী আহকাম পৃ. ৮৩)

৪. ফটো যদি কোন থলি, গিলাফ কিংবা কোন ডিব্বা ইত্যাদির ভিতরে বন্ধ অবস্থায় থাকে তাহলে উক্ত পাত্রসমূহ ঘরে রেখে ব্যবহার করা জায়িয, যদিও তা বানানো ও তার ক্রয় নাজায়েয। (শামী ১/৬৪৯,তাসবীর কী শরয়ী আহকাম পৃ.৮৭)

ছবি বানিয়ে বা ফটো তোলে তার মূল্য গ্রহণ করার বিধান

বিনা প্রয়োজনে কোন প্রাণীর ছবি প্রস্তুত করার পর প্রস্তুতকারীর জন্য যেমন তার মূল্য নেয়া নাজায়িয তেমনি ক্রয়কারীর জন্য তার মূল্য দেয়াও নাজায়িয, এজন্য স্টুডিও ইত্যাদিতে ছবি বানানোর কাজে চাকুরী করাও নাজায়িয। তবে চিত্রকর ছবি বানাতে যে রং ইত্যাদি ব্যয় করেছে তার মূল্য দিয়ে দিবে। (শামী ১/৬৫১)

মূর্তি ও ভাস্কর্যের হুকুম

ইসলামী শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রাণীর মূর্তি ও ভাস্কর্য সম্পর্ণূরূপে হারাম ও নিষিদ্ধ, জায়িয হওয়ার কোন সুরত নেই। হ্যাঁ রয়েছে শুধু ঈমান চলে যাওয়ার আশংকা। এজন্যই ফুকাহায়ে কেরাম বলেছেন, পূজার মূর্তি দুই কারণে হারাম, এক প্রাণীর প্রতিকৃতি হওয়ায়, দুই পূজা করায়। আর সাধারণ ভাস্কর্য হারাম হওয়ার কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল:

ক. সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে কোন প্রাণীর ভাস্কর্য তৈরি করা হারাম, এটা প্রাণীর প্রতিকৃতির কারণে নয়; বরং কোনো কোনো ভাস্কর্য নির্মাতা তার নির্মিত ভাস্কর্যের ব্যাপারে এতই মুগ্ধতার শিকার হয়ে যায় যে, যেন ঐ পাথরেরমূর্তি এখনই জীবন্ত হয়ে উঠবে! এখনই তার মুখে বাক্যের স্ফূরণ ঘটবে! বলাবাহুল্য এই মুগ্ধতা ও আচ্ছন্নতা এই অলীক বোধের শিকার করে দেয়, যেন সে মাটি দিয়ে একটি জীবন্ত প্রাণী সৃষ্টি করেছে। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যারা এসব প্রতিকৃতি তথা ছবি প্রস্তুত করবে তাদেরকে কিয়ামতের দিন বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছ তাতে জীবন দাও। (সহীহ বুখারীঃ ৫৯৫৯)

খ. আর যদি স্মরণ ও সম্মানের উদ্দেশ্যে বানানো হয়, তাহলে এটা যেমন প্রাণীর ছবি হওয়ার কারণে হারাম, তেমনি এ কারণেও যে, এভাবে কোন ছবির সম্মান দেখানো এক ধরণের ইবাদত বলেই গণ্য হবে। আর শয়তান এভাবেই ধীরে ধীরে মুসলমানদেরকে শিরকে লিপ্ত করায় যেমনিভাবে শয়তান অতীত জাতিসমূহকে স্মারক ভাস্কর্য প্রস্তুত করার মাধ্যমে শিরকে লিপ্ত করিয়ে ছিল। কেননা পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মাঝে এধরণের স্মারক ভাস্কর্য থেকেই পূজার মূর্তির সূচনা হয়ে শিরকের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। (মাআরিফুল কুরআন ৮/৫৬৬)

গ. আর যেসব প্রাণহীন বস্তুর পূজা করা হয় সেগুলোর ভাস্কর্য তৈরি করাও হারাম এটা পূজার কারণে , যদিও তা প্রাণীর ছবি নয়।

ঘ. আরো দেখা যায় এই শিল্পের সঙ্গে জড়িতরা ও প্রস্তুতকারীরা সীমা রেখার পরোয়া করে না এবং নগ্ন ও অর্ধনগ্ন, নারী মূর্তি, মূর্তি পূজার বিভিন্ন চিত্র ও নিদর্শন ইত্যাদি বানিয়ে নিজেরা যেমন গুনাহগার হয় তেমনি রাস্তার মোড়ে বা অলিতে গলিতে স্থাপন করে অন্যদেরকেও গুনাহগার বানায়।

ঙ. তদুপরি এগুলি হচ্ছে অপচয় ও বিলাসিতার পরিচায়ক। বিলাসী লোকেরা বিভিন্ন উপাদানে নির্মিত ছবিসমূহের মাধ্যমে তাদের কক্ষ অট্টালিকা ইত্যাদির সৌন্দর্য বর্ধন করে থাকে। ইসলামের সাথে এই অপচয় ও বিলাসিতার কোন সম্পর্ক নেই।

এজন্যই তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের সময় বাইতুল্লাহ ও তার চারপাশ থেকে সব ধরণের মূর্তি অপসারণ করে ছিলেন এবং সকল মূর্তি ও ভাস্কর্য বিলুপ্ত করে ছিলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রা.কে সব ধরণের

প্রতিকৃতি মিটিয়ে ফেলার আদেশ করে ছিলেন, তারপর বিভিন্ন স্থানে খোদিত ছবিগুলি সাহাবায়ে কেরাম রা.পানিতে কাপড় ভিজিয়ে ডলে ডলে সমান করার চেষ্টা করে ছিলেন, এরপর অবশিষ্ট খোদিত চিত্র মাটির লেপ দিয়ে জাফরানের রং লাগানো হয়ে ছিল। (বুখারী হা.২৪৭৮,৪২৮৭,৪৭২০,৪২৮৮, মুসলিম হা.১৭৮১, আবু দাউদ হা.২০২০, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা.হা.৩৮০৭৪, ইবনে হিব্বান হ.৫৮৬১,৫৮৫৭, সিরাতে ইবনে হিশাম ৪/৬৫,তারীখুল ইসলাম যাহাবী ১/৩৯৭-৩৯৮,শরহুননববী ২/১৯৯, উমদাতুলকারী ১৫/১২৪)

টিভি ও ভিডিওর শরয়ী হুকুম

টিভি ও ভিডিও রাখা, দেখা, দেখানো ও তাতে কোন কিছু শোনা ও শোনানো না জায়িয। কারণ, বর্তমানে নব উদ্ভাবিত এই জিনিস দু'টির মাধ্যমে হারাম কার্যকলাপ সয়লাবের মত ছড়িয়ে পড়ছে। যেমন: বেহায়াপনা,অশ্লিলতা, নোংরামী, প্রাণীর ছবি, বাজনা, খেল-তামাশা, নাচ-গান, বেগানা বেপর্দা মহিলাদের সাজগোজ করিয়ে অর্ধনগ্ন অবস্থা ও ছতরহীন খেলোয়ারদেরকে দর্শন করা প্রভৃতি। (তকমিলাহ ৪/১৬৪,মুন্তাখাবে নিজামুল ফাতাওয়া ২/৩৬৩, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/২৮৯)

ধর্মীয় অনুষ্ঠান ভিডিও করা ও তা টিভির পর্দায় দেখা ও দেখানোর হুকুম

পূর্বোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, প্রাণীর ছবি তোলা শরিয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। আর ভিডিও করার সময় ছবি তুলতে হয় এবং তা পরবর্তীতে টিভির পর্দায় দেখার জন্য ফিল্মে সংরক্ষণ করে রাখতে হয় যা প্রকৃতপক্ষে ছবিই, ছবির সকল উদ্দেশ্য এতে পূর্ণমাত্রায় পুরা হয়, তাই আধুনিক বিজ্ঞানের ছোঁয়া পেয়ে এটার পদ্ধতি যেমনই হোকনা কেন তা ছবি হিসাবেই বিবেচিত হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাণী অনুযায়ী হারাম তথা নাজায়িয হবে, আর যে জিনিস হারাম কাজ ছাড়া সম্ভব নয় বরং হারামের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয় তাও হারাম, চাই সেটা দুনিয়ার কাজের জন্য ব্যবহৃত হোক বা দ্বীনের কাজের জন্য ব্যবহৃত হোক, এ জন্যই তো আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথাও হারাম কাজের মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য-সহযোগিতা নিতে বলেন নি। কারণ, হারাম কাজের মাধ্যমে দ্বীনের সাহায্য কখনও হতে পারে না, বরং তাতে দ্বীনের ক্ষতিই হয় । এ জন্যই শরীয়তে যে জিনিস করতে হলে হারাম কাজের সাহায্য নিতে হয় সেই জিনিসকে স্পষ্টভাবে হারাম হিসাবে আখ্যা দিয়েছে।

সুতরাং কোন বড় আলেমের ওয়াজ-মাহফিল কিংবা হামদ-নাত, ইসলামী গজল কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোকনা কেন জানদার প্রাণীর ছবি সহকারে তা ভিডিও করা যেমন নাজায়িয তেমনি তার ভিডিও টিভিতে বা অন্য কোথাও দেখা বা দেখানোও নাজায়িয। (বুখারী হা.৫৯৫০, উমদাতুল কারী ১৫/১২৪, শামী ৯/১৯, জাদীদ ফিকহী মাসায়েল ১/৩৫০, হিদায়া ৪/৪৬৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৮/৩০২.আহাম মাসায়েল... ২/২৬২)

ভাল কাজ ভিডিও করা ও তা টিভি ইত্যাদিতে দেখানো হারাম হওয়ার কিছু কারণ

১. প্রধান কারণ হলো তাতে ছবি তুলতে হয়, যা সম্পূর্ণ হারাম।

২. ছবি দেখাও হারাম।

৩. আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অভিশপ্ত ব্যক্তি হওয়া।

৪. গুনাহের সবচেয়ে নিকৃষ্ট যন্ত্রসমূহের ব্যবহার করা।

৫. ভালো কাজের নামে দ্বীনের বে-হুরমতী করা।

৬. রহমতের ফেরেশতা থেকে দূরবর্তী হওয়া।

৭. এ ধরণের যন্ত্র কিনে অনর্থক মাল নষ্ট করা।

৮. আল্লাহ তা'আলার মহামূল্যবান নেয়ামত তথা সময়কে অহেতুক কাজে ব্যয় করা যা মূল্যবান নেয়ামতের নাশুকরী ছাড়া অন্য কিছু নয়।

৯. হামদ-নাত ইত্যাদি ভাল কাজ ভিডিও দেখার দ্বারা ধীরে ধীরে খারাপ কাজের ভিডিও দেখার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া।

১০. কাফেরদের সাথে সাদৃশ্য হওয়া ।

১১. ভাল কাজ ভিডিও করা ও তা টিভিতে দেখার দ্বারা গুনাহের কাজসমূহ ভিডিও করা ও তা টিভিতে দেখার উপর দলীল হওয়া।

নববী চিকিৎসার অন্যতম চিকিৎসা হিজামাহ (শিঙ্গা লাগানো)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমি মেরাজের রাত্রে ফেরেশতাদের যে দলেরই নিকট দিয়ে অতিক্রম করেছি সকলেই বলেছেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার উম্মতকে শিঙ্গা লাগানোর হুকুম করুন। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৪৭৯)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও এ হাদীসটি বর্ণিত আছে, তাতে আছে, হে মুহাম্মাদ! আপনার জন্য শিঙ্গা লাগানোকে আবশ্যক করে নিন। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ৩৪৭৭)

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যেসব জিনিস দ্বারা চিকিৎসা করো তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো শিঙ্গা লাগানো এবং কুস্তে বাহরী। (সহীহ বুখারীঃ ৫৬৯৬, মুসলিমঃ ১৫৭৭)

কুস্তে বাহরী এক জাতীয় সাদা কাঠ বিশেষ। বিভিন্ন রোগে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অনেকের মতে এটা সাদা চন্দন।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন. রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তিন জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে, শিঙ্গা লাগানো, মধু পান করা, তপ্তলোহা দ্বারা দাগ দেয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে তপ্তলোহা দ্বারা দাগ লাগানো থেকে নিষেধ করছি। (সহীহ বুখারীঃ ৫৬৮০,৫৬৮১)

উল্লেখিত হাদীসসমূহে শিঙ্গা লাগানোর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং রোগ নিরাময়ে শিঙ্গা লাগানোর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।

শিঙ্গা লাগানোর উপকারিতা এবং শিঙ্গা লাগানোর স্থান

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শিঙ্গা লাগানেওয়ালা কতোইনা উত্তম বান্দা! সে দূষিত রক্ত বের করে, মেরুদন্ডকে আরাম পৌঁছায় এবং চোখের জ্যোতি বাড়ায়। (জামে তিরমিযীঃ ২০৫৩, সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৪৭৮)

হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, খালি পেটে শিঙ্গা লাগানো শরীরের জন্য খুবই ফলপ্রসূ, তা জ্ঞান ও স্মরণশক্তি বৃদ্ধি করে। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ৩৪৮৮)

হযরত আবূ কাবশা আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মাথায় এবং উভয় কাঁধের মাঝখানে শিঙ্গা লাগাতেন এবং বলতেন, যে ব্যক্তি এসব (স্থান থেকে) দূষিত রক্ত বের করে দেয়, তার জন্য অন্য কিছু দ্বারা কোন রোগের চিকিৎসা না করলেও কোন ক্ষতি হবেনা। (সুনানে আবু দাউদঃ৩৮৫৯)

হযরত নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খাদেমা সালমা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ মাথা ব্যথার অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি তাকে শিঙ্গা লাগাতে বলতেন। (সুনানে আবূ দাউদঃ৩৮৫৮)

হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘাড়ের দুপাশের উভয় রগে এবং উভয় কাঁধের মাঝখানে শিঙ্গা লাগাতেন। (জামে তিরমিযীঃ ২০৫১)

হযরত আবূ কাবশা আনসারী রাযি. থেকে বর্ণিত আছে যে,রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষমিশ্রিত বকরির গোস্ত খাওয়ার কারণে তিনি নিজের মাথার তালুতে শিঙ্গা লাগান। (হাদীসের বর্ণনাকারী) মা'মার রহ.বলেন, বিষের কোন প্রতিক্রিয়া না থাকা সত্ত্বেও আমি আমার মাথার তালুতে শিঙ্গা লাগালাম। ফলে আমার স্মরণশক্তি লোপ পায়। এমনকি নামাযের মধ্যে আমাকে সূরা ফাতেহা বলে দিতে হতো। (আবূ দাউদঃ৩৮৬০)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুহাইনা রাযি. বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহরিম অবস্থায় মাথা ব্যথার কারণে মাথার মাঝখানে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (সহীহ বুখারীঃ৫৬৯৮,৫৭০০,৫৭০১)

(হাদীসে আছে) মুহরিম অবস্থায় পায়ের ব্যথার কারণে পায়ের পিঠে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (সুনানে কুবরা,নাসাঈঃ৭৫৫৪)

হযরত যাবির রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিতম্বে ব্যথা হওয়ার কারণে নিতম্বে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। (সুনানে আবূ দাউদঃ ৩৮৬৩)

উল্লেখ্য, ঘাড়ের দুপাশের উভয় রগে শিঙ্গা লাগানো মাথা ও তার সাথের অঙ্গসমূহ চেহারা, দাঁত, নাক, চোখ ও কানের রোগসমূহ আরোগ্য লাভ করার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। (যাদুল মাআদ ৪/৫১)

মাথায় বা মাথার পিছনের অংশে শিঙ্গা লাগানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করবে, তাই রক্তের চাপ বেশি হলে বা মাথা ব্যথা হলেই কেবল মাথায় শিঙ্গা লাগাবে । বিনা প্রয়োজনে মাথায় শিঙ্গা লাগাবে না, এতে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়ার আশংকা আছে। (যাদূল মাআদ ৪/৫৩)

মাসের কোন্ সপ্তাহে শিঙ্গা লাগাবে আর কোন্ সপ্তাহে লাগাবে না

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা যেদিনগুলিতে শিঙ্গা লাগাও তার মধ্যে সর্বোত্তম দিন হলো (চাঁদের) সতের, উনিশ ও একুশ তারিখ। (জামে তিরমিযীঃ ২০৫১)

হযরত আনাস রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি শিঙ্গা লাগাতে চায় সে যেন চাঁদের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখকে তালাশ করে। তোমাদের কারো রক্তের চাপ বেড়ে গেলে সে যেন (শিঙ্গা লাগিয়ে) রক্তের চাপ কমিয়ে নেয়। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ ৩৪৮৬)

হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি (চাঁদের) সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগাবে,এ শিঙ্গা তার সকল রোগের (তথা রক্তের চাপের কারণে যেসব রোগ হয়) নিরাময়কারী হবে। (সুনানে আবূ দাউদঃ ৩৮৬১)

এসব হাদীস হাকীম বা চিকিৎসকদের কথাকে সমর্থন করে। তারা বলেন, চান্দ্রমাসের শুরু বা শেষে শিঙ্গা লাগানো থেকে দ্বিতীয় ভাগের শুরুতে তথা তৃতীয় সপ্তাহে শিঙ্গা লাগানো বেশি উপকার। কেননা মাসের শুরুতে রক্তের চাপ থাকে না। মাসের মাঝামাঝি সময়ে চাঁদের আলো বাড়ার সাথে সাথে রক্তের চাপও বেড়ে যায় এবং মাসের শেষের দিকে চাপ কমতে থাকে। তবে প্রয়োজনের সময় মাসের শুরু এবং শেষেও শিঙ্গা লাগানো যায়। (যাদুল মাআদঃ ৫০-৫৪)

উল্লেখ্য, চাঁদের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখে শিঙ্গা লাগানো ভালো, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তারিখগুলোতে শিঙ্গা লাগাতেন এবং সাহাবা রাযি. কে হুকুম করতেন। কিন্তু এই তারিখগুলো জরুরী নয়, এটা স্পষ্ট কথা। কাজেই প্রয়োজনে জোড় তারিখগুলিতেও লাগানো যাবে। এটাই হাদীসের ইশারা এবং

চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা। কারণ, হাদীসে এই তারিখগুলিকে ভালো বলা হয়েছে; জরুরী বলা হয়নি। (ফাতহুল বারীঃ ১০/১৮৪)

চান্দ্রমাসের তৃতীয় সপ্তাহের শিঙ্গা লাগানোর পদ্ধতিঃ

হযরত ইবনে উমর রাযি. বলেন, হে নাফে! আমার শরীরে রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে , তাই একজন শিঙ্গাওয়ালা যুবক ডেকে আনো; বালক কিংবা বৃদ্ধকে আনিও না। সুতরাং যেকেউ শিঙ্গা লাগাতে চায়, সে যেন আল্লাহর উপর ভরসা করে বৃহস্পতিবার শিঙ্গা লাগায়। শুক্র, শনি ও রবিবার যেন না লাগায়। আবার সোম ও মঙ্গলবার শিঙ্গা লাগাবে, কিন্তু বুধবার শিঙ্গা লাগাবে না, কেননা হযরত আউয়ূব আ. বুধবারেই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, আর) শ্বেতকুষ্ঠ রোগ বুধবার দিনে অথবা রাতে জন্ম লাভ করে। (সুনানে ইবনে মাজাহঃ৩৪৮৮, ফাতহুল বারী ১০/১৮৪)

হযরত কাবশা বিনতে আবূ বাকরাহ রহ. থেকে বর্ণিত, তার পিতা নিজের পরিবারের লোকদেরকে মঙ্গলবার শিঙ্গা লাগাতে নিষেধ করতেন এবং তিনি বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মঙ্গলবার রক্ত চলাচলের দিন এবং সেই দিনে এমন একটি মূহুর্ত আছে যাতে রক্ত (প্রবাহিত হলে তা) বন্ধ হয় না। (সুনানে আবূ দাঊদঃ ৩৮৬২)

তবে মঙ্গলবার যদি আরবী মাসের সতের তারিখের সাথে মিলে যায় তাহলে ঐ মঙ্গলবারে শিঙ্গা লাগানো সারা বছরের রোগের চিকিৎসা। (মাজমাউয যাওয়ায়িদঃ হাঃ৮৩৩৩)

সুতরাং এই মঙ্গলবার ছাড়া অন্যান্য মঙ্গলবারে শিঙ্গা না লাগানো উত্তম, তবে প্রয়োজনে লাগানো যায়। তাই ইবনে উমরের রাযি. বর্ণনার সাথে কাবশা রহ. এর হাদীসের কোন সংঘর্ষ নেই।

তাবেঈ ইমাম যুহরী রহ. থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি বুধ অথবা শনিবার শিঙ্গা লাগানোর দরুন শ্বেতকুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হবে সে যেন নিজেকেই ধিক্কার দেয়। (এই বর্ণনাটির প্রতি লক্ষ্য করেই ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রহ.শনি ও বুধবার শিঙ্গা লাগানোকে অপছন্দ করেছেন।) (সুনানে কুবরা বায়হাক্বীঃ ১৯৫৪০,তানযীহুশ শরীআহ ২/৩৫৮, মিরকাত ৯/৩৭০)

উল্লেখ যে, হাদীসে শিঙ্গা লাগানোর জন্য যে দিনগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা উত্তম পর্যায়ের। ঐ দিনগুলোতে লাগানো জরুরী নয়, তাই বিশেষ জরুরত পড়লে নিষিদ্ধ দিনগুলোতেও লাগানো যাবে। তবে বুধবার ও শনিবারে শিঙ্গা না লাগানোর ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করবে।

বি: দ্রঃ সহজ পদ্ধতিতে শিঙ্গা লাগানোর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ডাঃ এম,আর,আযাদ মোবাঃ ০১৬৮২৭৭১১৩৬

দুরূদ, সালাম ও প্রচলিত মীলাদের শর‘ঈ বিধান

দুরূদ ও সালামের গুরুত্ব

১। আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ ও সালাম পাঠ করার জন্য সকল ঈমানদারকে আহবান জানিয়েছেন।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ “তোমরা আমার উপর দুরূদ পাঠ করো, তোমরা যেখানেই থাকোনা কেনো তোমাদের দুরূদ আমার নিকট পৌঁছানো হয়।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আমার উপর দুরূদ পড়া থেকে ভুলে থাকলো, সে বেহেশতের রাস্তা থেকে হটে গেল। (ইবনে মাজাহ হাদীস নং ৯০৮, বাইহাকী শুআবুল ঈমান হাদীস নং ১৪৭২)

দুরূদ ও সালামের ফযীলত

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি আমার সবচেয়ে নিকটে থাকবে, যে আমার উপর বেশী বেশী দুরূদ পাঠ করবে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেনঃ আল্লাহ তা‘আলা বহু সংখ্যক ফেরেশতা এ কাজের জন্য নিয়োগ দিয়েছেন যে, তারা পৃথিবীর যমীনে বিচরণ করতে থাকবে এবং আমার উম্মতের যে ব্যক্তি আমার জন্য দুরূদ ও সালাম পাঠাবে তারা তা আমার নিকট পৌঁছে দিবে। (শুআবুল ঈমান, বাইহাকী হাদীস নং ১৪৮২, নাসাঈ হাদীস নং ১২৮০)
- হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, ফেরেশতাগণ নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট প্রেরণকারীর নাম উল্লেখ করে তার দুরূদ ও সালাম পেশ করে থাকেন।
- নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি সকালে আমার উপর দশবার দুরূদ পাঠ করবে এবং সন্ধ্যায় দশবার দুরূদ পাঠ করবে কিয়ামাতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো। (ত্বাবারানী, মাজমাউয যাওয়ায়েদঃ১/১২০)

দুরূদ ও সালাম সম্পর্কীয় মাসাইল

- কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশের কারণে সারা জীবনে কমপক্ষে একবার দুরূদ পাঠ করা ফরযে আইন। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৪)
- যদি একই মজলিসে কয়েকবার নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম আলোচিত হয়, তাহলে প্রথমবার সকলের জন্য দুরূদ পাঠ করা ওয়াজিব, পরবর্তী প্রত্যেকবার নির্ভরযোগ্য মতানুসারে সকলের জন্য মুস্তাহাব। অবশ্য ইমাম ত্বহাবী রাহ. পরবর্তী প্রত্যেকবারও সকলের জন্য দরুদ পাঠ করা ওয়াজিব বলেছেন। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬)

- কেউ যদি নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম মুবারাক একই মজলিসে বারবার লিখেন, তাহলে তার হুকুমও অনুরূপ, অর্থাৎ প্রথমবার দুরূদ লিখা ওয়াজিব পরবর্তীবার লিখা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬)
- বিনা উযূতে, শুয়ে-বসে, হাঁটা-চলা সর্বাবস্থায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর দুরূদ পড়া যায়।
- জুমু‘আ বা ঈদের খুতবায় নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম আসলে অন্তরে অন্তরে দুরূদ পড়বে, মুখে উচ্চারণ করবে না।
- দুররে মুখতার কিতাবে উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ পড়ার নিয়ম হলো, দিলে অত্যন্ত মুহাব্বাতের সাথে ধীরস্থিরভাবে হালকা আওয়াজে চুপে চুপে পড়বে। দুরূদ শরীফ পড়ার সময় ঢুলতে থাকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হেলাতে থাকা এবং উঁচু আওয়াজ করা উচিত নয়। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৯)

নতুন ঘর-বাড়ী, দোকান, অফিস ইত্যাদি উদ্বোধনের ক্ষেত্রে করণীয়ঃ

দুররে মুখতার কিতাবে আরো উল্লেখ আছে, দুরূদ শরীফ যথাস্থানে পড়বে। যেটা দুরূদ পড়ার কোনো স্থান নয় বরং দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্য সামনে আছে, এমন স্থানে দুরূদ পড়ার রসম বানানো বা দুরূদ পড়ার জন্য লোকদেরকে দাওয়াত দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। যেমন: নতুন ঘর-বাড়ি, দোকান ইত্যাদি উদ্বোধন করার সময়। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, দুই রাকা‘আত শুকরিয়ার নামায পড়া বা হক্কানী আলেম দ্বারা বয়ানের ব্যবস্থা করা। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৮)

দুরূদ শরীফ পড়ার স্থান হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর রওযা শরীফ যিয়ারাতের সময়, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নাম বলা বা শোনার সময়, মসজিদের প্রবেশের সময় ও বের হওয়ার সময়, কোনো মজলিস থেকে উঠার সময়, দু‘আ বা মুনাজাতের আগে এবং পরে। আযানের পর দু‘আর আগে, উযূর শেষে, কিতাব বা চিঠিপত্র বা অন্য কিছু লিখার পূর্বে। বিপদ-আপদ, বালা-মুসীবত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। কোনো প্রথা পালন না করে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত পাওয়ার আশায় বেশি বেশি দুরূদ পড়া। (দুররে মুখতারঃ১/৫১৬, আল কাউলুল বাদী পৃ.৩১৮)

সহীহ মীলাদের পদ্ধতি

আমরা মুসলমান, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মাত, পৃথিবীর সবকিছু থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মুহাব্বাত এবং ভালবাসা সবচেয়ে বেশী। এটা প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে সহীহ তরীকায় মীলাদ পড়া আমাদের কর্তব্য। হাকীমূল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ. “ইসলাহুর রুসূম” গ্রন্থে মীলাদের সহীহ পদ্ধতি লিখেছেন, প্রচলিত মীলাদের সাথে সামঞ্জস্যতা না রেখে; দিন, তারিখ, সময়, পূর্ব থেকে নির্ধারিত না করে, ডাকাডাকি ছাড়া ঘটনাচক্রে কিছু

লোক একত্রিত হয়ে গেল বা কোন প্রয়োজনীয় কাজে বা বয়ানের জন্য লোকদেরকে একত্রিত করা হয়েছিল, তখন উপস্থিত লোকদের সামনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাত তরীকা এবং জীবনাদর্শ নিয়ে আলোচনা করা, এরপর কুরআন থেকে কিছু সুরা পড়ে অত্যন্ত মুহাব্বতের সাথে হালকা আওয়াজে একাকী দুরূদ শরীফ পড়বে। অন্যের সাথে তাল মিলিয়ে সমষ্টিগতভাবে এক আওয়াজে পড়বে না। মীলাদে ইয়া নবী, ইয়া রাসূল, ইয়া হাবীব ইত্যাদি কিছুই পড়বে না, তাওয়ালুদ করবে না, কিয়াম করবে না, কেননা এসবের কোন ভিত্তি শরী‘আতে নেই।

উল্লেখ্য, নির্ভরযোগ্য কোন কোন কিতাবে মীলাদের কথা পাওয়া যায়, তার দ্বারা উদ্দেশ্য এই সহীহ তরীকার মীলাদ যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নাতের আলোচনা হয় এবং সহীহ দুরূদ পড়া হয়। প্রচলিত গলদ মীলাদ কোন অবস্থায় তাদের উদ্দেশ্য নয় এবং তারা কেউ এ গলদ মীলাদ পড়তেন না।

সমাজে যেভাবে মীলাদ-কিয়ামের প্রচলন রয়েছে

যেখানে একজন আলেম সাহেব তাওয়ালুদ পড়েন এবং কবিতা পাঠ করতে থাকেন, ফাঁকে ফাঁকে সকলে একসাথে দুরূদ পড়েন, এর মধ্যে হঠাৎ দাঁড়িয়ে বা বসে ‘ইয়া নবী সালামালাইকা’, ‘ইয়া রাসূল সালামালাইকা’, ‘ইয়া হাবীব সালামালাইকা’ এরূপ দুরূদ পড়েন, এর কোনো দলীল কুরআন-হাদীসে নেই। এগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং মনগড়া, তাই এর থেকে মুসলমানদের বিরত থাকা কর্তব্য। (সূরা আনআম-৫৯, সুরা নামল-৬৫, তাফসীরে কুরতুবী-১২/৩২২, নাসাঈ শরীফ-১২৮২, ফাতাওয়া কাযিখান-১/৩৩৪, আহসানুল ফাতাওয়া-১/৩৪৮)

উল্লেখ্যঃ তাওয়ালুদ নামে যা পড়া হয় এটা কুরআন-হাদীসে নেই। তারপর আরবী-ফার্সী-বাংলা কবিতা পড়া হয়, তাও শরী‘আতে নেই, তার অর্থও ভুল। “ইয়া নবী” ওয়ালা যে দুরূদ পড়া হয় তাও হাদীসের কোন কিতাবে নেই এবং আরবী গ্রামার এর দিক দিয়ে তা ভুল, তার অর্থও ভুল। তারপর নামাযের দিকে খেয়াল করলে দেখা যায় বসে দুরূদ শরীফ পড়া উত্তম আর এখানে সেটা বাদ দিয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া হয় যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ জীবদ্দশায় পছন্দ করেননি বরং নিষেধ করেছেন। (আবু দাউদ)

যেহেতু আমাদের সমাজে এ মীলাদ-কিয়াম নিয়ে বহু দিন থেকে বাক-বিতণ্ডা, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে, দেশের হক্কানী উলামায়ে কেরাম এটাকে নাজায়েয বললেও সাধারণ মানুষ এটাকে বিদ‘আত বলতে রাজি নয়, এর মূল কারণ হলঃ মীলাদ-কিয়ামের সমর্থক এর সম্পর্কে প্রকৃত ইতিহাস জানেন না।

তাই মীলাদের প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হল, যাতে সকলে এর প্রকৃত ইতিহাস জেনে এর থেকে বিরত থাকতে পারে।

মীলাদের ইতিহাস

প্রচলিত মীলাদের সূচনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে, তাবেঈন এবং তাবে-তাবেঈনের সময়ে প্রচলিত পন্থায় মীলাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ইসলামের সূচনাকাল থেকে সুদীর্ঘ ছয়শ বছর পর্যন্ত এই মিলাদের কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে মিলাদ সমর্থক এবং মিলাদ বিরোধী সকলেই একমত। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী থেকে আজকের প্রচলিত মিলাদের যাত্রা শুরু হয়। এই মীলাদের এক জন বড় পৃষ্ঠপোষক মৌলভী আব্দুস সামী ‘আনওয়ার সাতিহাতে’ একথা স্বীকার করেছেন। চিত্তবিনোদনের জন্য এই মীলাদের আয়োজন করা বিশেষভাবে রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখকে নির্দিষ্ট করে মীলাদ করার প্রচলন আগে ছিল না। এই প্রথা এসেছে হিজরী ৬০৪ এর শেষের দিকে। (বারাহীনে কাতেআহ, পৃ.১০৩, তারিখে মিলাদ পৃ.১৩)

মূলকথা হলো প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার হিজরী ছয় শতকের পরে হয়েছে। (ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়াঃ পৃ.১১৪)

মোট কথা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ২৩ বছর নবুওয়াতের যুগে, এরপর ১১ হিজরী থেকে চল্লিশ হিজরীর ১৭ রমযান আনুমানিক ত্রিশ বছর খুলাফায়ে রাশিদীনের যুগ। এরপর কমবেশি ১২০ হিজরী সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগ। এরপর কমবেশি ২২০ হিজরী পর্যন্ত তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের যুগ। এরপর ৪০০ হিজরী পর্যন্ত ফুকাহা ও মুহাদ্দিসীনের যুগ, অতঃপর আরো ৬০৩ হিজরী পর্যন্ত তৎকালীন উলামায়ে কেরামের যুগেও এই প্রচলিত মীলাদের অস্তিত্ব ছিল না। সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরী মোতাবেক ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রচলিত মীলাদের প্রচলন শুরু হয়। সুতরাং প্রচলিত মীলাদ নিঃসন্দেহে বিদ‘আত এবং নাজায়েয। যার কোনো ভিত্তি শরী‘আতে নেই।

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারকঃ

মীলাদ যারা সমর্থন করেন এবং যারা এর বিরোধিতা করেন, তাদের সকলেই এ বিষয়ে একমত যে হিজরী ছয় শতকে ইরাকের মসূল এলাকায় উমর বিন মুহাম্মাদ মসূলী এই প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কার করেন। (তারীখে মীলাদঃ পৃ.১৫)

মৌলভী আব্দুল হক মুহাজেরে মক্কী রাহ. এর লেখা কিতাব ‘আদ দুররুল মুনাযযাম ফী হুকমি আমালি মাওলিদিন নাবিয়্যিল আযাম’ পৃ.১৬০ এ মুফতী সা‘দুল্লাহ সাহেব বলেন, প্রচলিত মীলাদ রবিউল আউয়াল মাসে দিন তারিখ নির্দিষ্ট করে সম্পাদন করার নিয়ম সর্বপ্রথম ইরাকের মসূল শহরে হয়েছে। এখানে উমর বিন মুহাম্মাদ সর্বপ্রথম এই মীলাদের আবিষ্কার করেন। (তারিখে মীলাদ পৃ.১৬)

মৌলভী মুহাম্মাদ আযম সাহেব লিখেন, জানা দরকার যে, এই পবিত্র মীলাদের আবিষ্কারক হযরত শায়খ উমর বিন মুহাম্মাদ মসূলী। (ফাতহুল ওয়দূদ পৃ.৮ এর সূত্রে তারিখে মীলাদ পৃ.১৬)

প্রচলিত মীলাদ সর্মথক জনাব মৌলভী আব্দুস সামী সাহেব লিখেন, সর্বপ্রথম এই প্রচলিত মীলাদ ইরাকের মসূল শহরে শায়খ উমর আবিষ্কার করেন। (আনওয়ারে সাতিহা সূত্রে বারহীনে কাতেআহ পৃ.১৬৪)

সারকথা হলো, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের ছয়শত বছর পর্যন্ত এই মীলাদের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। হিজরী ৬০৪ সালে সর্বপ্রথম শায়খ উমর ইরাকের মসূল শহরে এই মীলাদের আবিষ্কার করেন। আর তার অনুসরণ করেছিলেন বাদশাহ আরবীল আবূ সাঈদ কাওকারী, তিনিই মূলত এই মীলাদের প্রসার করে ছিলেন। (বারাহীনে কাতেআহ পৃ.১৬৩-৬৪)

আবিষ্কারক কেমন ছিলেন?

প্রচলিত মীলাদের আবিষ্কারক উমর বিন মুহাম্মাদ মুজতাহিদ, মুহাদ্দিস বা ফকীহ কিছুই ছিলেন না। ইলম ও সম্মানের দিক দিয়ে তিনি একজন অখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তার পরিচিতি মূলত বাদশাহ আরবীল এর মাধ্যমেই হয়েছে। অনেক বিজ্ঞ আলেম ও মহামানুষীগণ তীব্র ও কঠিন ভাষায় তার সমালোচনা করেছেন। যেমন: আল্লামা তাজুদ্দীন ফাকেহানী বলেন, প্রচলিত মীলাদ আবিষ্কার করেছে ভ্রষ্ট ও চিত্তপুজারী লোকেরা এবং পেটপুজারী লোকেরা এর উপর গুরুত্বারোপ করেছে। (তারীখে মীলাদ পৃ.১৮)

প্রচলিত মীলাদ সর্বপ্রথম শায়খ উমর এবং বাদশাহ আরবীল আবিষ্কার করেছেন। তারা দুজনেই বিজ্ঞ আলেমদের কাছে অবিশ্বাসযোগ্য এবং অগ্রহণীয় ছিলেন। কারণ তারা উভয়েই গান-বাদ্য বাজাতেন। (তাওযীহুল মারাম ফী বায়ানিল মাওলিদি ওয়াল কিয়াম সূত্রে তারিখে মীলাদ পৃ.১৮)

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে জানা গেলো যে, মীলাদের আবিষ্কারক উমর বিন মুহাম্মাদ ছিল বিদ'আতী। বিজ্ঞ আলিমদের চোখে সে ছিল অবিশ্বাসযোগ্য। কোনো বিজ্ঞ আলমের চোখে তার কোনো গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। আচ্ছা বলুন তো যে ব্যক্তি নিজেই তৎকালীন উলামায়ে কেরামের নিকট অগ্রহণযোগ্য ছিল। এমন একজন মানুষের আবিষ্কৃত আজকের প্রচলিত মীলাদ কীভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আল্লাহ আমাদের বিবেকের দুয়ার খুলেদিন।

বিদ'আতের ভয়াবহ পরিণাম

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচলিত মীলাদ ও কিয়াম বিদ'আত। আর বিদ'আত ভয়াবহ গুনাহের কাজ। এক দিকে এই বিদ'আত কুফুর, শিরিক এর পরেই সর্বাধিক ভয়াবহ ধ্বংসাত্মক গুনাহ। অপর দিকে এ থেকে তাওবাও নসীব হয় না। কেউ সূদ, ঘুষ, মদ, জুয়াতে লিপ্ত হলে এগুলো গুনাহ মনে

করে এক সময় তা থেকে তাওবা করে নেয় বা তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে। কিন্তু বিদ'আত নাজায়েয ও কবীরা গুনাহ হওয়া সত্ত্বেও বাহ্যত তা নেক আমলের মত হওয়ার কারণে সকলেই তা সাওয়াবের নিয়তে করে থাকে। এ কারণে কখনোই তা থেকে তাওবা করার প্রয়োজন মনে করে না। ভাবে সাওয়াবের কাজই তো করছি এর জন্য আবার তাওবা কিসের। পরিশেষে তাওবা করা ছাড়াই মারা যায়। এজন্য বিদ'আত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখা এবং এ থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকা সকলের জন্য জরুরী। কেননা হাদীসে বিদ'আত থেকে বেঁচে থাকতে কঠোরভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তোমরা বিদ'আত বা নতুন আবিষ্কৃত আমল থেকে কঠোরভাবে বিরত থাক। কেননা প্রত্যেক নতুন আবিষ্কৃত আমলই বিদ'আতের মধ্যে গণ্য এবং প্রত্যেক বিদ'আঁতই গোমরাহী। (তিরমিযী পৃ.২৯২, আবূদাঊদঃ২/২৭৯, মুসনাদে আহমাদঃ৪/২৭)

অপর এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তা'আলা বিদ'আতী ব্যক্তির নামায-রোযা, দান-সদকা, হজ্জ-উমরাহ, জিহাদ, ফরয ইবাদাত ও নফল ইবাদতসহ কোনো আমই কবুল করবেন না। আটার খামির থেকে চুল যেমন খুব সহজেই বের হয়ে আসে, ঠিক তেমনই বিদ'আতী ব্যক্তিও ইসলাম থেকে নিজের অজান্তেই বের হয়ে যায়। (ইবনে মাজাহ পৃ.৬)

অপর এক হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিদ'আতী ব্যক্তির জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন।' (কানযুল উম্মাল ১/২২০)

সর্বোপরি বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই "দূর হও, দূর হও, যারা আমার পর বিদ'আতে লিপ্ত হয়েছে" বলে হাউজে কাওসারের পানি থেকে চিরবঞ্চিত করে দিবেন। (বুখারী/মুসলিম)

বর্তমান সমাজে মীলাদ-কিয়ামের ব্যাপক প্রচারণা পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেক মসজিদে মীলাদও হয়, সাধারণ মুসল্লিরা ব্যবসায় উন্নতি, ছেলে-মেয়ের পরীক্ষায় পাস আর পড়া-লেখার উন্নতি, কামাই-রোজগারের উন্নতি, বালা-মুসীবত এবং বিভিন্ন পেরেশানি থেকে মুক্তিসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মীলাদ পড়িয়ে থাকেন, নতুন ঘর-বাড়ি বা দোকান হলে সেখানে বরকতের জন্য এবং সওয়াবের নিয়তে মীলাদ দিয়ে থাকেন। অথচ ইসলামে এর কোনো ভিত্তি-প্রমাণ নেই।

ইতিহাস খুঁজলে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে, সাহাবা কেরামের যুগে এমনকি তাবেঈন এর যুগেও মীলাদ-কিয়ামের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই এ প্রচলিত মীলাদ-কিয়াম সম্পূর্ণ বিদ'আত এবং নাজায়েয। সকলের কর্তব্যঃ এর থেকে বিরত থাকা এবং অন্যকে বিরত রাখা। নকল জিনিস দেখতে প্রায় আসলের মত হলেও দামে আসল জিনিসের মত হবে না। শুধু

তাই নয়, আসলের মত বানাতে পেরেছে বলে নকলকারীকে পুরষ্কার দেওয়া হবে না, বরং নকল করার অপরাধে কঠিন শাস্তিযোগ্য বিবেচিত হবে।

যেহেতু সকল বিদ'আত ইসলামে নকল আমল হিসেবে গণ্য, তাই বিদ'আতকারী পুরষ্কারযোগ্য তো নয়ই বরং বিদ'আত করার অপরাধে জাহান্নামের কঠিন শাস্তিযোগ্য। যদিও সাধারণ লোকদের নিকট বিদ'আত দেখে তো বাহ্যত নেক আমলের মতোই মনে হয়, কিন্তু এটা যে বিদ'আত এবং নকল আমল তা বুঝতে আমল বিশেষজ্ঞ তথা হক্কানী উলামায়ে কেরামের কোনো কষ্টই হয় না। তাই সকলের জন্য কর্তব্যঃ এ সকল বিদ'আত কাজ থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

ফাতাওয়ার আলোকে প্রচলিত মীলাদ বিদ'আত এবং নাজায়িয

অসংখ্য ফাতাওয়ার কিতাবে প্রচলিত মীলাদ ও কিয়ামকে বিদ'আত ও নাজায়েয বলে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে কঠোরভাবে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি ফাতাওয়ার কিতাবের প্রমাণ পেশ করা হলোঃ

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচনা করা ও যিকির-আযকার করার মাঝে সওয়াব রয়েছে, কিন্তু বর্তমানে জীবনবৃত্তান্ত আলোচনার জন্যে যে সুন্নাত পরিপন্থী গর্হিত নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, এই নিয়ম সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবেঈন এর কোনো যুগেই ছিল না। এর দ্বারা সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ হবে। এধরনের মজলিস থেকে দূরে থাকাই সওয়াবের কাজ। (সূত্র: খাইরুল ফাতাওয়া-১/৫৮৭)

২. প্রচলিত মীলাদ মজলিসের আয়োজন করা ভিত্তিহীন এবং বিদ'আত, সুতরাং এটা নাজায়িয। (সুত্রঃ ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া-১/১৯০)

৩. বর্তমানে যে প্রথা স্বরূপ মীলাদের মজলিস কায়েম করে তথায় দ্বীনী বিষয় অজ্ঞ কবিদের কবিতা এবং গর্হিত ও মনগড়া বর্ণনা সুর দিয়ে পড়া হয় এবং এই প্রচলিত পন্থায় মীলাদ পড়াকে জরুরী মনে করা হয়, এই মীলাদ-মাহফিল সুন্নাত পরিপন্থী এবং বিদ'আত। এই গর্হিত পদ্ধতি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈন, আইম্মায়ে কেরাম কারো থেকেই প্রমাণিত নেই।

৪. প্রচলিত পন্থায় যে মীলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়, তা কুরআন-হাদীস এবং ফিকহের কোথাও পাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে কখনো এমন করেননি, তাবেঈনগণ করেননি, তাবে তাবেঈনগণ করেননি; আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, ফুকাহায়ে কেরাম এবং মুহাদ্দিসগণের কেউ করেছেন বলেও জানা যায়নি। ছয়শত হিজরী পর্যন্ত এই মীলাদ কেউ করেননি, এরপর সুলতান আরবিল সর্বপ্রথম এর প্রচলন ঘটায়।

এ ছাড়াও দেখুন: (ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া-১১/৪৮, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া-২/২৮২, ইমদাদুল মুফতীন-১৭২, ইমদাদুল ফাতাওয়া-৫/২৪৯, আযীযুল ফাতাওয়া-পৃ. ৯৮, ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া

১/১৯৭, ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া-২২৮-২২৯, ইমদাদুল আহকাম-পৃ. ৯৫, জাওয়াহিরুল ফিকহ-১/২১১)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম ও মৃত্যুর বিশুদ্ধ তারিখ

আমরা শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মত। তাই আমাদেরকে তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা উচিত। নির্ভরযোগ্য ইতিহাসবেত্তাদের উদ্ধৃতির আলোকে আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্ণয়ের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম তারিখ

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের নিকট মতানৈক্য রয়েছে। তবে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের কোনো এক সোমবার হয়েছে, এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য সকল ইতিহাসবিদ উলামায়ে কেরাম একমত। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮২)

জন্ম তারিখ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে বর্ণনাগুলো উল্লেখ করা হলোঃ

১.রবিউল আউয়াল এর দুই তারিখ।
২.রবিউল আউয়াল এর আট তারিখ।
৩.রবিউল আউয়াল এর দশ তারিখ।
৪.রবিউল আউয়াল এর বার তারিখ।
৫.রবিউল আউয়াল এর সতের তারিখ।
৬.রবিউল আউয়াল এর আট দিন বাকী থাকতে।
৭.রমযান মাসের বার তারিখ। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮২)

এসব বর্ণনার মধ্য থেকে হাফেজ ইবনে কাছির রহ. ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ এর মধ্যে ‘দুই’ ‘আট’ ও ‘বার’ তারিখের কথা গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করেছেন। তাই আমরা শুধু এই তিনটি তারিখ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

আর মুহাম্মাদ বিন সাআদ রহ. ‘তবাকাতুল কুবরা’ নামক গ্রন্থে দুই ও দশ তারিখের মতকে গ্রহণ করেছেন। বার তারিখের মতটি প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এ মতটির আলোচনা তাঁর কিতাবে স্থান পায়নি। দুই ও দশ তারিখের পক্ষে পেশ কৃত তার দলীলসমূহ সনদসহ উল্লেখ করা হলোঃ

দুই তারিখের দলীলঃ

قال محمد بن سعد اخبرنا محمد بن عمربن واقد الاسلمى الواقدى قال: كان ابومعشر نجيح بن عبد الرحمن المدنى يقول: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لليلتين خلتامن شهر ربيع الاول.

‘ইবনে সাআদ তার উস্তাদ ওয়াকেদী এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবূ মা‘শার আল-মাদানী বলতেন, রবিউল আউয়াল মাসের দুই তারিখ সোমবার নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন।’ (তবাকাতে ইবনে সাআদ ১/৪৭)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, এ বর্ণনার রাবী ওয়াকেদী ও তার উস্তাদ আবূ মা‘শার উভয়েই ‘যয়ীফ’। রিজাল শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকলানী রহ. ওয়াকেদী সম্পর্কে বলেনঃ متروك مع سعة علمه ‘প্রশস্ত জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি পরিত্যাজ্য।’ তাকরীবুত তাহযীব পৃ.৪৯৮) আর আবূ মা‘শার সম্পর্কে বলেছেনঃ ضعيف ‘সে যয়ীফ’ (তাকরীব পৃ. ৫৫৯) অতএব দুই তারিখের বর্ণনাটির বর্ণনাকারীরা মাতরুক ও যয়ীফ হওয়ায় এমতটি গ্রহণ করা গেল না।

দশ তারিখের দলীলঃ

দশ তারিখের দলীলের সূত্রেও ওয়াকেদী রয়েছেন। তাই দশ তারিখের দলীলটিও মাতরুক বিবেচিত হবে। (তবাকাতুল কুবরা ১/৪৭)

আট তারিখের দলীলঃ

জেনে রাখা উচিত যে, হস্তি বাহিনী যে বছর মক্কায় হামলা করেছিল সেবছরই রবিউল আউয়াল মাসে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হয়। এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সকল ইতিহাসবিদ উলামায়ে কেরাম একমত।

ইবনে কাছীর রহ. বলেনঃ

قال ابن اسحاق: وكان مولده عليه السلام عام الفيل وهذا هو المشهور عند الجمهور. قال ابراهيم بن المنذر الحزامى: هو الذى لايشك فيه احدمن علمائنا انه عليه السلام ولد عام الفيل.

‘ইমামুল মাগাযী ইবনে ইসহাক বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হস্তি বাহিনীর বছর হয়েছিল। এটিই জমহুরের নিকট প্রসিদ্ধ অভিমত। আর ইবরাহীম বিন মুনযির রহ. বলেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হস্তি বাহিনীর বছর হওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের উলামাদের নিকট কোনো সন্দেহ নেই।’ (আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮৩)

অতএব, এতটুকু নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হলো যে, হস্তি বাহিনীর মক্কায় আক্রমণের বছর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হয়েছিল। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, হস্তি বাহিনীর হামলার কয়দিন পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হয়ে ছিল? হাফেজে হাদীস ইমাম সুহায়লী, ইমাম ইবনে কাছীর, ইমাম মাসঊদী রহ. এর নিকট বিশুদ্ধতম মত হল, হস্তি বাহিনী মক্কায় হামলার পঞ্চাশ দিন পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন। আবূ বকর মুহাম্মাদ বিন মূসা আল খাওয়ারেযেমী রহ. বলেন, হস্তি বাহিনী মক্কায় হামলা করে মুহাররম মাসের তের দিন বাকী থাকতে। তখন থেকে পঞ্চাশ দিন পর নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করলে জন্ম দিবস আটই রবিউল আউয়াল হয়। অতএব, সাব্যস্ত

হলো যে, উল্লেখিত বড় বড় ইমামদের মতে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম হয়েছিল আটই রবিউল আউয়াল। আরো বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ (সুবুলুল হুদা ওয়ার রশাদ ফী সীরাতি খাইরিল ইবাদ ১/৩৩৫)

আল্লামা আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল কসতালানী আট তারিখের মতকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বলেনঃ

وقيل لثمان خلت منه, قال الشيخ قطب الدين: هو اختيار اكثر اهل الحديث, ونقل عن ابن عباس و جبير بن مطعم وهو اختيار من له معرفة بهذا الشان, واختاره الحميدى و شيخه ابن حزم , وحكى القضاعى فى عيون المعارف اجماع اهل الزيج(اى الميقات) عليه, ورواه الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم وكان عارفا بالنسب وايام العرب اخذ ذالك عن ابيه.

‘কারো কারো মতে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ জন্ম গ্রহণ করেন। শায়েখ কুতুবউদ্দিন (আবূ বকর মুহাম্মদ বিন আহমাদ) বলেছেন, এ মতটিই অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ গ্রহণ করেছেন এবং এ মতটিই হযরত ইবনে আব্বাস এবং জুবাইর বিন মুতইম রা. থেকে বর্ণিত আছে। তাছাড়া ইতিহাস সম্পর্কে যার নূন্যতম ধারণা আছে সেও এমতটিই গ্রহণ করবে। হুমাইদি ও তার উস্তাদ ইবনে হাযম রহ.ও এ মতটি গ্রহণ করেছেন এবং কুযায়ী (আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন সালাম) ‘উয়ূনুল মাআরেফ’ নামক গ্রন্থে আট তারিখে নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম গ্রহণ সম্পর্কে মীকাতবাসীদের ঐক্যমতের কথা উল্লেখ করেছেন। এমতটিকেই হাফেজ যুহরী রহ. মুহাম্মাদ বিন জুবাইর বিন মুতইম থেকে বর্ণনা করেছেন। আর মুহাম্মাদ বিন জুবাইর নসবনামা ও আরবের ইতিহাস সম্পর্কে পণ্ডিত ছিলেন। মুহাম্মাদ তার পিতা জুবাইর বিন মুতইম থেকে এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য গ্রহণ করেছেন।’ (আল মাওয়াহেবুল লাদুনিয়্যাহ ১/৮৫)

আল্লামা যারকাশী রহ.ও ‘শরহে যারকাশী আলাল মাওয়াহেব’ এর মধ্যে আট তারিখের মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। (শরহে যারকাশী আলাল মাওয়াহেব ১/২৪৬)

সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসবেত্তা হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. ‘আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া’ এর মধ্যে আট তারিখের মতকে যেভাবে উল্লেখ করেছেন তার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, তিনিও আট তারিখের প্রবক্তা। তিনি বলেনঃ

وقيل لثمان خلون منه, حكاه الحميدى عن ابن حزم ورواه مالك وعقيل ويونس بن يزيد عن الزهرى عن محمد بن جبيربن مطعم, ونقل ابن عبد البر عن اصحاب التاريخ انهم صححوه, وقطع به الحافظ الكبير محمد بن موسى الخوارزمى, ورجحه الحافظ ابو الخطاب بن دحية فى كتابه التنوير فى مولد البشير النذير.

‘কেউ কেউ বলেছেন নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন রবিউল আউলায় এর আট তারিখ। এ মতটি হুমাইদী রহ. ইবনে হাযাম রহ. থেকে বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মালেক রহ., উকাইল (ইবনে খালেদ) ও ইউনুস বিন ইয়াযীদ ইমাম যুহরী এর সূত্রে, আর ইমাম যুহরী মুহাম্মদ বিন জুবাইর বিন মুতইম

এর সূত্রে আট তারিখের কথা বর্ণনা করেছেন। সুপ্রসিদ্ধ স্প্যানিশ আলেম ইবনে আব্দুল বার বলেছেন, ইতিহাসবেত্তাগণ আট তারিখের অভিমতকেই বিশুদ্ধ বলেছেন। তাছাড়া হাফেজে হাদীস মুহাম্মদ বিন মূসা আল খাওয়ারেযেমী নিশ্চিতভাবে আট তারিখকে সঠিক বলেছেন। আরেক হাফেজে হাদীস আবুল খাত্তাব উমর ইবনে হাসান ইবনে দিহইয়া স্বীয় গ্রন্থ 'আত তানবীর ফী মাওলিদিল বাশীর ওয়ান নাযীর' এর মধ্যে আট তারিখের অভিমতকেই প্রধান্য দিয়েছেন। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮২)

বার তারিখের দলীলঃ

হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. বার তারিখের দলীল সম্পর্কে বলেনঃ

وقيل لثنتي عشرة خلت منه, نص عليه ابن اسحاق ورواه ابن ابى شيبة فى مصنفه عن عفان بن مسلم عن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس رضى الله عنهما انهما قالا: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين الثانى عشر من شهر ربيع الاول وفيه بعث وفيه عرج به الى السماء وفيه هاجر وفيه مات, وهذا هوالمشهور عند الجمهور و الله اعلم.

'ইবনে ইসহাক রহ. বার তারিখের মতটি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আর ইবনে আবী শাইবা তার 'মুসান্নাফ' গ্রন্থে আফফান ইবনে মুসলিম এর সূত্রে সাঈদ ইবনে মীনা থেকে বর্ণনা করেন যে, জাবের (রাযি.)ও ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হস্তি বাহিনীর মক্কায় আক্রমণের বছর রবিউল আউয়াল মাসের বার তারিখ সোমবার জন্ম গ্রহণ করেন। আর রবিউল আউয়াল মাসে তাকে নবুওয়াত দেয়া হয় এবং এ মাসে তাঁর মে'রাজ হয় এবং এ মাসেই তিনি হিজরত করেন আর এ মাসেই তিনি ইন্তিকাল করেন। (হাফেজ ইবনে কাছীর বলেন,) জমহুরের নিকট এ মতটিই প্রসিদ্ধ। (আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/২৮৩)

এখানে দুইটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ

১. বার তারিখের দলীল হিসেবে একটি হাদীস পেশ করা হল। এই হাদীসের রাবী আফফান বিন মুসলিম ও সাঈদ বিন মীনা উভয়ে নির্ভরযোগ্য। তবে আফফান বিন মুসলিম সাঈদ বিন মীনা থেকে সরাসরি হাদীস শুনতে পাননি। কারণ সাঈদ বিন মীনার ইন্তেকাল হয় ১১০ হিজরীর দিকে। আর আফফান বিন মুসলিমের জন্মই হয় ১৩৪ হিজরীর দিকে। (সূত্রঃ সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/২৫) এর দ্বারা বুঝা গেল যে, আফফান বিন মুসলিম এবং সাঈদ বিন মীনা উভয়ের মাঝে একজন রাবী আছে যার নাম এই সনদে উল্লেখ করা হয় নি। তাই এই হাদীসটি মুনকাতে হয়ে গেল। আর মুনকাতে হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়।

২. হাফেজ ইবনে কাছীর রহ. এই মতটি বর্ণনা করার পর বলেছেন, 'এই মতটি জমহুরের নিকট প্রসিদ্ধ' লক্ষণীয় বিষয় হলো, এই মতটিকে তিনি প্রসিদ্ধ বলেছেন বটে কিন্তু বিশুদ্ধ বলেননি; বরং আট তারিখের মতকেই তিনি প্রকারান্তরে বিশুদ্ধ বলেছেন। জেনে রাখা উচিত যে, সব প্রসিদ্ধ বিষয়ই বিশুদ্ধ হয় না; বরং সমাজে

অনেক এমন প্রসিদ্ধ বিষয় রয়েছে যা বিশুদ্ধ নয়। আমাদের মনে হয় এখানেও তেমনটিই ঘটেছে।

যাই হোক উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা একথা সাব্যস্ত হল যে, বড় বড় মুহাদ্দিস ইমাম ও ইতিহাসবিদগণের মতে নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের আট তারিখ সোমবার জন্ম গ্রহণ করেছেন। ঐতিহাসিক বিবেচনায় এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। বার তারিখের দলীল সম্পর্কীয় হাদীস 'মুনকাতে'। তাই বার তারিখের অভিমত প্রসিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বিশুদ্ধ নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞান ও নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম তারিখঃ

নিকট অতীতের ভারত উপ-মহাদেশের কয়েকজন বরণীয় আলমের মতামত হল, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৯ই রবিউল আউয়াল সোমবার জন্ম গ্রহণ করেছেন। আল্লামা শিবলী নু'মানী ও শায়খ সুলাইমান নদভী কর্তৃক যৌথভাবে উর্দূ ভাষায় রচিত 'সীরাতুন নবী' নামক গ্রন্থে এবং শায়খ সফীউর রহমান কর্তৃক আরবী ভাষায় রচিত 'আররাহীকুল মাখতূম' নামক গ্রন্থে এই মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। এই মতের পথে দলীল বর্ণনা করতে গিয়ে 'সীরাতুন নবীর' গ্রন্থকার বলেছেন, বিগত শতাব্দীর মিশরের প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী আলেম মাহমূদ পাশা ফালাকী রহ. তার রচিত 'নাতায়েজুল ইফহাম ফী তাকবীমিল আরব কাবলাল ইসলাম ওয়া ফী তাহকীকে মাউলিদিন নাবিয়্যি আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম' নামক গ্রন্থে গাণিতিক প্রমাণাদির মাধ্যমে সাব্যস্ত করেছেন যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম মূলত রবিউল আউয়াল এর নয় তারিখ হয়েছে। তিনি দলীল সম্পর্কে যে কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছেন তার সারাংশ এরূপঃ

১. সহীহ বুখারীতে আছে যে, দশম হিজরীতে যখন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সর্বকনিষ্ঠ ছেলে ইবরাহীম (রাযি.) ইন্তেকাল করেন তখন সূর্য গ্রহণ হয়েছিল। আর তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স ৬৩ বছর চলছিল।

২. গাণিতিক হিসেবে সাব্যস্ত হয় যে, দশম হিজরীর সেই সূর্য গ্রহণ খ্রিষ্টীয় ৬৩২ সালের জানুয়ারি মাসে সকাল আটটা ত্রিশ মিনিটে হয়েছিল।

৩. চান্দ্র মাস হিসেবে এ সময় থেকে ৬৩ বছর পিছনে ফিরে গেলে দেখা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম ৫৭১ সালে হয়ে ছিল। আর এ সময় রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম তারিখ মোতাবেক ১২ই এপ্রিল হয়।

৪. জন্ম তারিখ সম্পর্কে যদিও মতভেদ রয়েছে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সবাই একমত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম রবিউল আউয়াল মাসের কোনো এক সোমবার হয়েছে। আর নির্ভরযোগ্য মতগুলো ৮-১২ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৫. রবিউল আউয়াল এর ৮-১২ তারিখের মধ্যে সোমবার হয় নয় তারিখ। এসব কারণে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্ম খ্রিষ্টীয় ৫৭১ সালের ২০শে এপ্রিল হয়েছিল। (সীরাতুন নবী ১/১১৭)

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের তারিখ

ইন্তেকালের তারিখ সম্পর্কেও মতভেদ রয়েছে। কারো মতে রবিউল আউয়াল এর বার তারিখ সোমবার, কারো মতে রবিউল আউয়াল মাসের দুই তারিখ সোমবার আর কারো মতে রবিউল আউয়াল মাসের এক তারিখ সোমবার নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন। প্রত্যেকেই নিজের দাবির পথে প্রমাণ পেশ করেছেন, কিন্তু বার ও দুই তারিখের পথে যে-সব দলীল পেশ করা হয়েছে তা আমাদের তাহকীক অনুযায়ী বিশুদ্ধ নয় কিংবা যুক্তিযুক্ত নয়। তাই আমরা বার তারিখ এবং দুই তারিখের মতটি গ্রহণ করিনি। আমাদের তাহকীক অনুযায়ী নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের এক তারিখ সোমবার ইন্তেকাল করেছেন। এক তারিখ সম্পর্কীয় দলীল নিম্নে পেশ করা হলোঃ

নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকালের ব্যাপারে যেসব বিষয়ে ইমামগণ একমত তা নিম্নরূপঃ

১. নবীজী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু বরণ করেন ১১ হিজরীতে।

২. রবিউল আউয়াল মাসে।

৩. সোমবার।

৪. এক তারিখ থেকে বার তারিখের মধ্যে মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে হাদীসের মৌলিক গ্রন্থসমূহে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। সীরাতাজ্ঞ ও ইতিহাসবিদগণ এ সম্পর্কে তিনটি মত উল্লেখ করে থাকেনঃ এক, দুই ও বারই রবিউল আউয়াল। এই তিনটি মতকে সবরকম যাচাই বাছাইয়ের পর ১ম রবিউল আউয়াল এর মতটিই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কেননা সহীহ বুখারীর হাদীসের মাধ্যমে একথা সাব্যস্ত যে, اليوم اكملت لكم دينكم... শীর্ষক আয়াতটি দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ শুক্রবার আরাফার ময়দানে নাযিল হয়েছিল। (বুখারী, কিতাবুত তাফসীর) এই হিসাব ঠিক রেখে চান্দ্রমাসের সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করলে রবিউল আউয়াল এর এক তারিখ সোমবার সাব্যস্ত হয়।

নিম্নে বিস্তারিত একটি নকশার মাধ্যমে একথা আরো স্পষ্ট করে দেওয়া হলোঃ

নং	মাসের অবস্থা	রবিউল আউয়াল এর ১ম সোমবারের তারিখ	রবিউল আউয়াল এর ২য় সোমবারের তারিখ	রবিউল আউয়াল এর ৩য় সোমবারের তারিখ
১	যিলহজ্জ, মুহাররম, সফর সব ৩০শা	৬	১৩	২০
২	যিলহজ্জ, মুহাররম, সফর সব ২৯শা	২	৯	১৬
৩	যিলহজ্জ, মুহাররম ২৯শা, সফর ৩০শা	১	৮	১৫
৪	যিলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম ও সফর ২৯শা	১	৮	১৫
৫	যিলহজ্জ ২৯শা, মুহাররম ৩০শা, সফর ২৯শা	১	৮	১৫
৬	যিলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম ২৯শা, সফর ৩০শা	৭	১৪	২১
৭	যিলহজ্জ ৩০শা, মুহাররম ৩০শা, সফর ২৯শা	৭	১৪	২১
৮	যিলহজ্জ ২৯শা, মুহাররম ও সফর ৩০শা	৭	১৪	২১

এই তারিখগুলোর মধ্য থেকে ৬, ৭, ৮, ৯, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ২০, ও ২১ তারিখ আলোচনার বাহিরে। কেননা এসব তারিখের কোনো প্রবক্তা নেই। (বি.দ্র. নকশায় দেখা যাচ্ছে যে, বার তারিখ কোনো ভাবেই সোমবার হচ্ছে না। তাই বার তারিখ সোমবার না হওয়া আরো স্পষ্টভাবে সাব্যস্ত হল।) এখন রইল শুধু এক আর দুই তারিখ। আমরা নকশায় দেখতে পাচ্ছি যে, এক অবস্থায় দুই তারিখ সোমবার হতে পারে। অর্থাৎ উল্লেখিত তিনটি মাসকে একাধারে উনত্রিশা ধরলে। আর জেনে রাখা উচিত যে, চান্দ্রমাস একাধারে তিনবার উনত্রিশা হওয়া চান্দ্রমাসের সাধারণ নিয়ম এর পরিপন্থী। তাই দুই তারিখের মতটি যুক্তিযুক্ত নয়। পক্ষান্তরে উল্লেখিত তিনটি মাসের যেকোনো দুইটিকে উনত্রিশা ধরলে যিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ শুক্রবার হওয়া হিসেবে রবিউল আউয়াল মাসের এক তারিখ সোমবার হয়। আর স্বাভাবিকভাবেও চান্দ্রমাস পর পর দুই বার উনত্রিশা হয় কিংবা একটি উনত্রিশা এবং পরেরটি ত্রিশা হয়ে থাকে। অতএব যুক্তির সাথে সাথে হাফেজ মূসা ইবনে উকবা, লাইস বিন

সাআদ, মুহাম্মদ বিন মূসা আলখাওয়ারেযমী প্রমুখ ইমামগণের উক্তি এক তারিখের মতকে সমর্থন করায় আমরা এক তারিখের মতটি গ্রহণ করছি। (সীরাতুন নবী ২/৪৭৭)

তাছাড়া তাফসীরে তবারী ও তাফসীরে ইবনে কাছীরে ইমাম ইবনে জুরাইজ তবারী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হল' শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হওয়ার দিন থেকে নিয়ে ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত মোট একাশি দিন নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত ছিলেন।' (তাফসীরে তবারী ৬/৯৬)

ইমাম ইবনে জুরাইজ এর এই উক্তি অনুযায়ীও উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার দিন থেকে নিয়ে একাশিতম দিন রবিউল আউয়াল এর এক তারিখ সোমবার হয়, যদি জিলহজ্জ, মুহাররাম ও সফর এই তিন মাসের যেকোনো দুইটিকে উনত্রিশা ধরা হয়। অতএব, রবিউল আউয়াল মাসের এক তারিখ সোমবার নবীজী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইন্তেকাল হয়েছে। এটিই বিশুদ্ধ ও যুক্তিযুক্ত মত। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন। বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ ('সীরাতুন নবী' ২/৪৭৭)

শরী'আতের দৃষ্টিতে ওলীমা, আকীকা ও খতনা

ওলীমা প্রসঙ্গ

ওলীমার শাব্দিক অর্থ খানা খাওয়ানো। শরী'আতের পরিভাষায় বিবাহের পর ছেলে বা তার পরিবারের পক্ষ থেকে যে খানার দাওয়াত দেওয়া হয় তাকে ওলীমা বলে।

ওলীমার হুকুম

ওলীমা করা সুন্নাত । হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আনাস রাযি. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. এর শরীর বা কাপড়ে হলুদ রঙের চিন্হ দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী ? জবাবে তিনি বললেন, আমি একটি খেজুর দানার পরিমাণ সোনা দিয়ে একটি মেয়েকে বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, আল্লাহ তোমার বিবাহে বরকত দিন। আর তুমি ওলীমা করো যদিও একটি বকরি দ্বারা হোক না কেনো। বুখারী ১/৭৭৭, মুসলিম ১/৪৬১

ওলীমার সময়

বিবাহের তিন দিনের মধ্যে যেকোনো সময় ওলীমার আয়োজন করা যেতে পারে। তবে কনের রুখসতির পর তথা বর-কনের বাসর হওয়ার পর ওলীমা করা উত্তম। এতে বিবাহের পরিপূর্ণ এ'লান ও প্রচার প্রসার হয়ে যায়। ফাতহুল মুলহিম ৬/৪০৮

ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করার হুকুম

ওলীমার দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নাত। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন

তোমাদের কাউকে ওলীমার দাওয়াত দেওয়া হয় তখন সে যেন তাতে উপস্থিত হয়। বুখারী ১/৭৭৭, মুসলিম ১/৪৬১

যদি ওলীমার সভায় শরীয়ত বিরোধী কোনো কিছু হওয়ার আশংকা থাকে আর দাওয়াতি মেহমানের উক্ত কাজ বন্ধ করার ক্ষমতা থাকে, তাহলে মজলিসে অংশগ্রহণ করে তা বন্ধ করে দিবে। কিন্তু বন্ধ করার ক্ষমতা না থাকলে সেখানে অংশগ্রহণ করবে না। আর যদি উপস্থিত হওয়ার পর শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ দেখা যায়, তাহলে সমাজের দ্বীনদার ও ইমাম, মুয়াযিন এবং মুবাল্লিগ ভায়েরা তা বন্ধ করার ব্যবস্থা করবেন, আর বন্ধ না করতে পারলে আহার না করেই চলে আসবেন। ফাতাওয়ায়ে আলমগিরি খণ্ড-৫ কারাহিয়া অধ্যায়

কয়েকটি বর্জনীয় কাজ

১. ছেলে নিজের সামর্থ্যের বাহিরে ওলীমার ব্যবস্থা করবে না এবং এর জন্য ধার-কর্জ করারও প্রয়োজন নেই। যদি কোনো কিছুর সামর্থ্য না থাকে তবে শুধু মিষ্টিমুখ করিয়ে দিবে। ওলীমাতে পেট ভরে খাওয়ানো জরুরী নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক স্ত্রীর (উম্মে সালামা রাযি.) ওলীমা করেছিলেন মাত্র দুই মুদ যব দ্বারা। বুখারী ১/৭৭৭

২. ওলীমার দাওয়াতে শুধু ধনী ও সমাজের মান্য গণ্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করবে না। বরং গরীব শ্রেণীকেও দাওয়াত করবে। হাদীসে এসেছে, হযরত আবূ হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, সর্বাপেক্ষা মন্দ খানা হচ্ছে সেই খানা, যাতে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয়, আর গরীবদের বাদ দেওয়া হয়। বুখারী ১/৭৭৭, মুসলিম ১/৪৬১

৩. আমাদের সমাজে বরযাত্রার নামে যে ধূমধাম করা হয় এটা এবং বর পক্ষের এই শর্ত করা যে, আমাদের এই পরিমাণ লোককে খাওয়াতে হবে এসব শরীয়তে অনুমোদিত নয়। এ ধরণের দাওয়াতে শরীক হবেন না। মুহিউস সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক রহ. বলতেন, এটা হচ্ছে ডাকাতির খানা। হাদীসে এধরণের দাওয়াতে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে এসেছে যে, তারা চোর হয়ে প্রবেশ করলো আর ডাকাত হয়ে বের হলো। সুতরাং এধরণের খানা থেকে দূরে থাকা চাই। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন।

৪. শরী'আতের দৃষ্টিতে বিয়েতে মাত্র দুই ধরনের খরচ থাকে মহর ও ওলীমা। আর এই উভয় খরচ স্বামীর যিম্মায়। সুতরাং মেয়ের বাপের উপর দাওয়াত, যৌতুক ইত্যাদি কোনো কিছুর বোঝা চাপানো জায়িয নেই।

আকীকা প্রসঙ্গ

আকীকা করা মুস্তাহাব এবং এর দাওয়াত কবুল করা জায়িয। ফাতাওয়া রহীমিয়্যাহ ২/৯১

ছেলে বা মেয়ের জন্মের পর সপ্তম দিবসে আকীকা করা উত্তম। সপ্তম দিনে না করতে পারলে পরে যেকোনো দিন করতে পারবে। তবে সপ্তম দিন যে বার ছিল সেই বারে করা ভালো। হযরত ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে তার আকীকা করো এবং তার জন্য সুন্দর নাম রাখো। তাবারানী আউসাত হা.১৯৮১

ছোট বয়সে যদি আকীকা করা না হয়, তাহলে যেকোনো বয়সে নিজের আকীকা নিজে করতে পারবে। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবী হওয়ার পর নিজের জন্য আকীকা করেছেন। তাবারানী আউসাত হা. ৯৯৪

কয়েকটি জরুরী মাসআলা

১.আকীকার মধ্যে ছেলে সন্তানের জন্য দুইটি বকরি আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি বকরি জবাই করা উত্তম। ছেলের জন্য দুইটি বকরি সম্ভব না হলে একটিই যথেষ্ট । রদ্দুল মুহতার- ৫/২১৩

২. কেউ যদি কুরবানীর গরুর মধ্যে আকীকা করতে চায়, তাহলে সে ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ বরাদ্দ করবে। ছেলের জন্য দুই অংশ সম্ভব না হলে এক অংশ বরাদ্দ করতে পারে। রদ্দুল মুহতার ৫/২১৩

৩. গরু ও উট দ্বারা একাধিক বাচ্চার আকীকা করা জায়িয আছে । ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ২/৯১

৪. আকীকা করা মুস্তাহাব । কেউ যদি আকীকা না করে তাহলে সে গুনাহগার হবে না। ফাতাওয়া রহীমিয়া ২/৯১

৫. যে পশু দ্বারা কুরবানী করা বৈধ সেই পশু দ্বারা আকীকা করতে হয়। যেমনঃ ছাগল, ভেড়া এক বছরের হতে হবে। আর গরু ও মহিষ দুই বছরের হতে হবে। রদ্দুল মুহতার ৫/২১৩

৬. আকীকার গোস্ত কাঁচা বণ্টন করা বা রান্না করে বণ্টন করা অথবা দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো কিংবা কাউকে না খাওয়ানো সবই জায়িয আছে। আর আকীকার গোস্ত ধনী-গরীব সবাই খেতে পারবে। রদ্দুল মুহতার ৫/২১৩

৭. আকীকার চামড়ার মূল্য কুরবানীর চামড়ার ন্যায় সদকা করে দিতে হবে ।

আকীকার ফযীলতঃ আকীকার দ্বারা বিভিন্ন বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বুখারী ২/৮২২

জন্মের সপ্তম দিবসে কয়েকটি করণীয় কাজ

১. আকীকা করা। তাবারানী আউসাত হা.১৯৮১

২. শিশুর সুন্দর নাম রাখা। প্রাগুক্ত

৩. পশু জবাইয়ের আগে বা পরে বাচ্চার মাথার চুল মুন্ডানো। তুহফাতুল মাওদূদ বি আহকামিল মাওলূদ পৃ.৮৮

৪. সম্ভব হলে চুলের ওজন সমপরিমাণ সোনা বা রুপা দান করা। প্রাগুক্ত
৫. আকীকার গোস্ত দাওয়াত করে খাওয়ানো। প্রাগুক্ত পৃ. ৭৩

খতনা প্রসঙ্গ

খতনা করা সুন্নাত। এটা ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিয়ার বা নিদর্শন। জন্মের পর থেকে বালেগ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যেকোনো সময় খতনা করা যায়। তবে সাত বছরের আগে করানো উত্তম ও মুস্তাহাব। ফাতাওয়া আলেম গীরী ৫/৪৩৬

যদি বালেগ হওয়ার পূর্বে কারো খতনা না হয়ে থাকে বা কোনো অমুসলিম বালেগ হওয়ার পর মুসলমান হয়, তাহলে বালেগ হওয়ার পর খতনা করার হুকুম বাকী থাকবে এবং তাকে খতনা করানো হবে যদি তার মধ্যে খতনার কষ্ট সহ্য করার মতো ক্ষমতা থাকে। ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/২৩৮

খতনার পরিমাণ

পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগে যে চামড়া রয়েছে তার অর্ধেকের চেয়ে বেশি কাটা হলে তাকে খতনা বলা হবে। আর অর্ধেক বা তার চেয়ে কম কাটা হলে তাকে খতনা বলা হবে না। সুতরাং যদি কাউকে খতনা করানোর পর তার অগ্রভাগের চামড়া লম্বা হয়ে পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগকে প্রায় ঢেকে নেয়, তাহলে তাকে পুনরায় খতনা করাতে হবে। রদ্দুল মুহতার ১০/৫১৫

প্রচলিত একটি ভুল

অনেক জায়গায় খতনা উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর জন্য বিরাট আকারে খানা পিনার আয়োজন করা হয় এবং সেখানে ছেলেদের জন্য কাপড়-চোপড় ও হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসা হয়, এসব সুন্নাত পরিপন্থী ও পরিত্যাজ্য । বিখ্যাত তাবেয়ী হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, হযরত উসমান ইবনে আবিল আস রাযি. কে কোনো এক খতনার অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা হলো, তখন তিনি তা গ্রহণ করলেন না। পরে যখন তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে আমরা খাতনার দাওয়াতে যেতাম না এবং আমাদেরকে এর জন্য দাওয়াতও দেওয়া হত না। মুসনাদে আহমাদ হা.১৭৯০৮, তাবারানী কাবীর হা.৮৩৮১, মাজমাউজ জাওয়ায়েদ হা. ৬২০৮

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে করণীয় কাজগুলি করার এবং বর্জনীয় কাজগুলি বর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

কবর খনন ও দাফনের শরয়ী পদ্ধতি

কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে কবরে দাফন করা ইসলামের অন্যতম শিআর বা বিশেষ নিদর্শন এবং ফরযে কিফায়াহ তথা কিছু লোক এই ফরয হুকুম আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হবে। আর কিছু লোক আদায় করলে সকলেই দায়িত্ব মুক্ত

হয়ে যাবে। এই গুরুত্বপূর্ণ হুকুম সঠিকভাবে পালন করা যেহেতু জরুরী তাই আমরা এর সাথে সম্পর্কিত কবর খনন করার এবং কবরে মায়্যেতকে দাফন করার শরঈ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

জেনে নেয়া উচিত যে, কবরের সর্বমোট গভীরতার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম গঠনের কোন ব্যক্তির অর্ধদেহ থেকে বুক বা পূর্ণদেহ পর্যন্ত এবং উক্ত ব্যক্তির বুক পর্যন্ত কবর গভীর হওয়া উত্তম আর পূর্ণদেহ পর্যন্ত হওয়া অধিক উত্তম, তবে পূর্ণদেহ থেকে বেশি গভীর না হওয়া উচিত। আর কবরের সর্বাধিক প্রস্থ হচ্ছে মাইয়্যেতের অর্ধদেহ পর্যন্ত । আর দৈর্ঘ্য হচ্ছে মাইয়্যেতের পূর্ণদেহ পর্যন্ত। (ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬, রদ্দুল মুহতার ৩/১৪১)

শরী'আতের দৃষ্টিতে কবর দুই প্রকার (ক) বগলী কবর (খ) সিন্দূক কবর।

যে স্থানে মাইয়্যেতকে দাফন করা হবে সে স্থানের মাটি শক্ত ও মজবূত হলে সেখানে বগলী কবর খনন করা উত্তম, পক্ষান্তরে ঐ স্থানের মাটি নরম হওয়ার দরুন বগলী কবর ডেবে যাওয়ার আশংকা হলে সিন্দূক কবর খনন করা চাই। (আহকামে মাইয়্যেত পৃ.৮৩) আমাদের দেশের মাটি নরম হওয়ার দরুন বগলী কবর খনন করা ঝুঁকিপূর্ণ, তাই সাধারণত সিন্দূক কবর খনন করা হয়।

সিন্দূক কবর খনন ১ম পদ্ধতিঃ

সিন্দূক কবর খনন ও তাতে মাইয়্যেতকে দাফনের শরঈ পদ্ধতি এই যে, কবরের পূর্ণ গভীরতার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ খনন করার পর ঠিক মাঝামাঝি মাইয়্যেতকে ডান কাতে রাখা যায় এমন প্রস্থে কবরের শেষ গভীরতা পর্যন্ত মাইয়্যেতের দৈর্ঘানুপাতে একটি গর্ত খনন করা হবে, তবে উত্তর দিকে মাথা রাখার স্থানে একটু উঁচু রাখা হবে, যাতে মাইয়্যেতকে ডানকাতে শোয়ালে শরীরের সাথে মাথা সোজা থাকে। অতঃপর এই গর্তে মাইয়্যেতকে রাখার সময় এই দুআ পড়বে بسم الله وعلى ملة رسول الله এবং মাইয়্যেতকে সম্পূর্ণ ডানকাতে শোয়ানো হবে, যাতে তার চেহারা , সিনা ও পুরা শরীর কিবলামুখী হয়ে যায়, অতঃপর নীচের গর্তটি মাইয়্যেতের শরীর থেকে এক বিঘত উপরে মজবূত বাঁশ, কাঁচা ইট বা কাঠ দিয়ে ঢেকে দেয়া হবে। এক্ষেত্রে কাঁচা ইট বা সিমেন্ট দ্বারা তৈরিকৃত স্ল্যাব ব্যবহার করা যেতে পারে । অতঃপর মাটি দিয়ে বাকি অংশ ভরাট করে জমিনের উপর বুক ও মাথা বরাবর স্থানটুকু কুঁজ সদৃশ এক বিঘত বা এর চেয়ে সামান্য বেশি পরিমাণ উঁচু করা হবে। আমাদের দেশে সম্পূর্ণ কবর যেভাবে মাটি দিয়ে উঁচু করা হয় এর কোন প্রমাণ নেই।

সিন্দূক কবর খনন ২য় পদ্ধতিঃ

সিন্দূক কবর খননের দ্বিতীয় একটি পদ্বতি এই যে, মাইয়্যেতকে রাখার গর্তটি একেবারে মাঝে খনন না করে পশ্চিম পাশে পূর্বের নিয়মে খনন করা হবে এবং মাইয়্যেতকে সুন্নত তরিকায় রাখা হবে। অতঃপর বাঁশ বা কাঠের এক পাশ কবরের পূর্ব দেয়ালের গোঁড়ায় রাখা হবে এবং অপর পার্শ্ব কবরের পশ্চিম দেয়ালের সাথে

জমিন থেকে আনুমানিক একহাত নীচে মিলিয়ে রাখা হবে। অতঃপর মাটি দিয়ে বাকি অংশ পূর্বের নিয়মে ভরাট করা হবে। যাতে করে শিয়াল কুকুর অন্য কোন হিংস্র প্রাণী লাশের ক্ষতি করতে না পারে। (বজলুল মাজহূদ ৪/২০৫, মুসনাদে আহমাদ হা.নং- ৪৯৮৯, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬, আততাজরীদ ৩/১০৭২, বাদায়েউস সানায়ে ১/৩২০, এমদাদুল আহকাম ১/৮৩৯)

বগলী কবর খননঃ

যে স্থানে মাইয়্যেতকে দাফন করা হচ্ছে সে স্থানের মাটি শক্ত হলে সেখানে বগলী কবর খনন করা উত্তম। বগলী কবর খনন ও তাতে মাইয়্যেতকে দাফনের শরঈ পদ্ধতি এই যে, মধ্যম গঠনের কোন ব্যক্তির বুক বা পূর্ণদেহ পরিমাণ গভীর ও মাইয়্যেতের পূর্ণদেহ সমপরিমাণ দীর্ঘ ও বেশির থেকে অর্ধদেহ পরিমাণ প্রশস্ত একটি কবর খনন করা হবে। অতঃপর ঐ কবরের নীচের জমীন বরাবর পশ্চিম দেয়ালে নীচের অংশে মাইয়্যেতের দৈর্ঘানুপাতে ও মাইয়্যেতকে ডানকাতে রাখা যায় এই পরিমাণে একটি গর্ত খনন করা হবে এবং তার মাথা ও কোমর বরাবর মাটি,পাথর বা কাঁচা ইট ইত্যাদি রাখা হবে যাতে সে চিত হয়ে না পড়ে এবং কিবলার দিক থেকে তার পুরা শরীর সরে না যায়। অতঃপর মজবূত বাঁশ মাটিতে সোজাভাবে গেড়ে ঐ গর্ত ঢেকে দেয়া হবে এবং পুরা কবর মাটি দিয়ে পূর্বের নিয়মে ভরাট করা হবে। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৩, গুনইয়াতুল মুতামালি পৃ.৫৯৮, ইমদাদুল আহকাম ১/৮৩৯)

কিছু করণীয় কাজ

১. মাইয়্যেতের দাফনের কাজে উপস্থিত ব্যক্তিদের জন্য মুস্তাহার বা করণীয় এই যে, প্রত্যেকে দু'হাত দিয়ে কিছু মাটি মাইয়্যেতের মাথার দিক দিয়ে কবরে তিনবার ফেলবে এবং প্রথমবার منها خلقنا كم দ্বিতীয়বার وفيها نعيد كم ও তৃতীয়বার ومنها نخرج كم تارة اخرى পড়বে। (মিরকাতুল মাফাতীহ ৪/৭৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৬৬)

২. দাফনের কাজ শেষ হওয়ার পর মুস্তাহাব এই যে, একজন মাইয়্যেতের মাথার নিকট সূরা বাকারার শুরু থেকে مفلحون পর্যন্ত এবং পায়ের নিকট সূরা বাকারার শেষের দুই আয়াত তথা امن الرسول থেকে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করবে। (শু'আবুল ঈমান হা.নং ৮৮৫৪, রদ্দুল মুহতার ২/২৪৩)

কিছু বর্জনীয় কাজ

১. অনেক এলাকায় দাফনের কাজ শেষ হওয়ার পর কবরের চার কোনায় চারটি খুটি গাড়ার এবং চার কূল পড়ার প্রথা আছে । কোথাও কবরের মাঝ বরাবর খেজুরের ডাল গাড়া হয়, শরী'আতের দৃষ্টিতে এর কোন ভিত্তি নেই। সুতরাং এই প্রথার অনুসরণ সুন্নত বা সাওয়াবের কাজ মনে করা বিদআত বা মারাত্মক গুনাহ। (সহীহ বুখারী হা.নং ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম হা.নং ১৭১৮)

২. আবার কোন কোন জায়গায় কবরে ফুল দেয়া হয় । শরী'আতের দৃষ্টিতে এটাও নাজায়িয। (নযামুল ফাতাওয়া ২/১৭৬, ফাতাওয়া রহীমিয়্যাহ ১/১২৩)

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক সাহেব দা. বা.

দাওয়াত দেয়ার উসুলঃ

১. বয়ানের আয়োজন মাদ্‌রাসা বা মসজিদ কেন্দ্রিক করা। (দাওয়াতুল হকের মাহফিল খোলা মাঠে তেমন ফলপ্রসু হয় না।)

২. দাওয়াতের তারিখ ডায়রীতে লেখানো এবং পরে তা নিশ্চিত করা। চাই তা স্ব-শরীরে যেয়ে হোক বা মোবাইল দিয়ে।

৩. রাস্তা বা মানুষ যাতায়াতের বিঘ্ন সৃষ্টি করে এমন যায়গায় মাহফিলের আয়োজন না করা।

৪. মাইক এর আওয়াজ মাহফিলের আওতাভুক্ত করা। দূরে মাইক না দেয়া।

৫. বাদ মাগরিব অথবা যথা সময়ে ঈশার নামাজ আদায় করে সর্বোচ্চ ৩০ মিনিটের মধ্যে বয়ানের ব্যবস্থা করা।

৬. টিভির কোন বক্তাকে উক্ত মাহফিলে দাওয়াত না দেয়া।

৭. বয়ানের জন্য হাদিয়া পেশ না করা।

৮. মাহফিলের ২/৩ দিন আগে থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা চুড়ান্ত করা।

৯. মাহফিলে পেশাদার বক্তা দিয়ে কালেকশন না করান।

১০. অনুমতি ছাড়া খানার ইন্তিজাম না করা।

১১. মাহফিলের মজমা জমানোর জন্য কুরআন তিলাওয়াতে না করানো বরং হামদ, নাত দিয়ে মজমা জমানো।

১২. মাহফিলের জন্য রাস্থার মধ্যে কোন গেইট বা তোরণ না বানানো।

১৩. মাহফিলে বক্তার আগমনে না'রায়ে তাকবীর বা অন্য কোন শ্লোগান না দেওয়া।

১৪. মাহফিলে আলোক সজ্জা না করা।

১৫. মাহফিলে প্রধান বক্তা, বিশেষ বক্তা, প্রধান অতিথি লিখে উলামাদের মধ্যে বিভক্তি না করা।

উপোরক্ত শর্ত সমূহ মেনে স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে আমি মুহাম্মাদ .....

আপনাকে উক্ত মাহফিলে দাওয়াত দিলাম। আশা করি আপনি গ্রহন করবেন। আমরা উল্লেখিত শর্তের কোনটির বরখেলাপ করলে আপনি প্রোগ্রাম বাতিল করতে পারবেন। তাতে আমাদের আপত্তি করার কোন অধিকার থাকবে না।

স্বাক্ষর